খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) এর সাহিত্যে
ধর্ম ও মানবপ্রেম

আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
পিএইচ.ডি
প্রফেসর, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

গবেষক
এ.টি.এম. ফাখরুদ্দিন
এম.এ. (ডবল) ঢাকা
সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর সাহিত্যে ধর্ম ও মানবপ্রেম

GIFT

আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

403564

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ড.আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক
পিএইচ.ডি.
প্রফেসর, আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক
এ.টি.এম. ফাখরুদ্দিন
এম.এ. (ডবল) ঢাকা,
সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Library
403564

Dhaka University Institutional Repository

Khan Bahadur Ahsanullah(r.) er Shahitte Dharmo O Manabprem.

(Religion and humanism in the works of Khan Bahadur Ahsanulla(r.).)

A THESIS

Submitted for the award of the Degree of Doctor of Philosophy to the department of Arabic, University of Dhaka.

By

A.T.M. FAKHRUDDIN

Associate professor,
Department of Arabic,
University of Dhaka.

403564

Under the supervision of

Professor Dr. A.F.M. Abu Bakar Siddique

Department of Arabic,
University of Dhaka.

2006 A.D.

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব এ.টি.এম. ফাখরুদ্দিন কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত *'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর সাহিত্যে ধর্ম ও মানবপ্রেম'* শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতঃপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

403564

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

০৫.০৪.০৮

(ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক)
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষনা করছি যে, ***'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর সাহিত্যে ধর্ম ও মানবপ্রেম'*** শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

ফাখরুদ্দিন ১৫.৪.০৬

(এ.টি.এম. ফাখরুদ্দিন)
এম.এ (ডবল) ঢাকা,
পিএইচ.ডি. গবেষক ও
সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর সাহিত্যে ধর্ম ও মানবপ্রেম' শীর্ষক আমার পিএইচ.ডি. থিসিসটি রচনার জন্য সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও পিএইচ.ডি. তত্ত্বাবধায়ক ঢা.বি. এর আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান ড.আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক মহোদয়ের, তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ন, পরামর্শ, দোয়া ও স্নেহ আমাকে উক্ত কাজ সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই অকৃত্রিম বন্ধুপ্রতিম ঢা.বি. এর আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড.এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামীর। এক বাক্যে এভাবে বলতে চাই যে, তাঁর অনুপ্রেরণা ও সহায়তা না পেলে আমার গবেষণা হত কিনা সন্দেহ। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড.এ.বি.এম. ফারুক কে, যার অবদানে আমার পক্ষে থিসিস রচনার ক্ষেত্রে বিরাট সফলতা এসেছে।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, বিভাগীয় অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক,

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক আ.ন.ম. আব্দুল মান্নান খান, অধ্যাপক নাজির আহমদ, অধ্যাপক ড.সাহেরা খাতুন, অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড.মোহাম্মদ নূরুল হক, অধ্যাপক আ.স.ম. আবদুল্লাহ, ড.মোহাম্মদ ইউছুফ, জনাব মোঃ আব্দুল কাদির, জনাব যুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক, জনাব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ড.আবু জামাল মোহাম্মদ কুতুবুল ইসলাম নো'মানী, জনাব মুহাম্মদ রূহুল আমীন, জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান ও জনাব মাহমুদ বিন সাঈদ প্রমুখ শিক্ষকগণসহ সকল সহকর্মীদের।

কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী জনাব আলহাজ্ব রফিকুল আলম, ঢাকা মেট্রোপলিটন আহছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আলমগীর হোসেন সহ উক্ত মিশনের সকল কর্মকর্তাবৃন্দের। বিশেষ ভাবে জনাব এ.এফ.এম. এনামুল হক ভাইয়ের কাছে আমি ঋণী। তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করে আমার এ কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রম ও মেধা দান করেছেন।

আরো যাদের কাছে কৃতজ্ঞ তারা হলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর একমাত্র জীবিত পুত্র জনাব মাজহারুস সাফা, ঢা.বি. এর ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার জনাব বদরউদ্দীন আহমেদ, খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)এর পৌত্র জনাব মালেকুজ্জামান, ভারতের লক্ষ্ণৌ এর গুড্ডু ভাই, হলিফ্যামিলি হাসপাতালের ডাঃ নিলুফার বেগম, মিস শিখা প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সহধর্মিনী মিসেস রোকেয়া খাতুন, আদরের মেয়ে তামান্না ফেরদৌস, স্নেহাস্পদ ছেলেদ্বয় সিরাজুস সালিকীন ও শামসুল আরিফীন কে, যারা নানাভাবে উক্ত কাজে আমাকে সহায়তা দান করেছে।

আমি আরো ধন্যবাদ জানাই স্নেহাস্পদ ছাত্র তাজুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম, রইছ উজ্জামান খান, মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, কুব্বাদ, মনিরুল ইসলাম, মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন, কামরুজ্জামান (শামীম), হোসাইন মাহমুদ, জাহিদুজ্জামান, কম্পোজিটর আমিনুল ইসলাম এদের সকলের সহযোগিতার জন্য।

মহান আল্লাহর কাছে উপরোক্ত সকল ব্যক্তিগণ সহ অন্যান্য যারা সহায়তা দান করেছেন সকলের উত্তম প্রতিদানের জন্য প্রার্থনা জানাই।

এ.টি.এম. ফাখরুদ্দিন
এম.এ (ডবল) ঢাকা,
পিএইচ.ডি. গবেষক ও
সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী বর্ণমালা (الحروف الهجائية العربية) এর বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে অত্র অভিসন্দর্ভে অনুসৃত নিয়ম

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا=ء	ঊর্ধকমা'	ز	ঐ,ঝ	ق	ক,ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ	ل	ল
ث	ছ,স	ص	স,ছ	م	ম
ج	জ	ض	দ,দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত,ত্ব	و	ভ,ওয়া
خ	খ	ظ	য	ه = ة	হ,ঃ
د	দ	ع	উল্টো কমা'	ى	য়
ذ	য	غ	গ,ঘ		
ر	র	ف	ফ		

ধ্বনি-চিহ্ন
الحركات

হর্‌কত্‌	প্রতিবর্ণ/ধ্বনি চিহ্ন	হর্‌কত	প্রতিবর্ণ/ধ্বনি চিহ্ন
ـَـ	-আ	ـِـ	-ইন
ـِـ	-ই=ি	ـٌـ	-উন
ـُـ	-উ=ু	ـَـ	আ (যুগ্মধ্বনি)
ـْـ	্ (হস্‌চিহ্ন)	ـٍـ	ই (যুগ্মধ্বনি)
ـًـ	-আন	ـُـ	উ (যুগ্মধ্বনি)

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আ.মি.	: আহ্ছানিয়া মিশন
স./সা.	: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত করুন)
আ.	: আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)
রা.	: রাদিআল্লাহু আনহু (আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট আছেন)
র.	: রহমাতুল্লাহি আল্লাইহে (তাঁর উপর আল্লাহ্র রহমত হোক)
ঢা.আ.মি.	: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
খৃ / খ্রীঃ / খ্রিঃ	: খ্রিস্টাব্দ
তা.বি.	: তারিখ বিহীন
পৃঃ / পৃ	: পৃষ্ঠা
আ.মি.পা.ট্রাস্ট	: আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট
আল কোরআন;	
২৯:২৬(সংখ্যাদ্বয়)	: প্রথমটি সুরার সংখ্যা জ্ঞাপক, দ্বিতীয়টি আয়াতসংখ্যা জ্ঞাপক
ইন.	: ইনতিকাল

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

- পটভূমি.....১১
- প্রথম অধ্যায় - খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)এর জীবন ও দেশকাল.....৩৪
- দ্বিতীয় অধ্যায় - ধর্মচিন্তা ও সূফীবাদ ৭২
- তৃতীয় অধ্যায় - খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)এর সাহিত্য কর্মধারা....১০৫
- চতুর্থ অধ্যায় - খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)এর রচনাবলীতে ইসলামের মর্ম পরিচয়.....১৪১
- পঞ্চম অধ্যায় - বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান.....১৬৭
- ষষ্ঠ অধ্যায় - খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)এর সাহিত্যে মানবিক মুল্যবোধের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য.....১৯০
- সপ্তম অধ্যায় - আহছানিয়া মিশন.....২৩৫
- উপসংহার ২৫০
- গ্রন্থপঞ্জি ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

পটভূমি

বাংলায় মুসলিম শাসনামলে রাজস্ব বিভাগের চাকরি ও জমিদারি ছাড়া অন্য সবক্ষেত্রে মুসলমানদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বেসামরিক উচ্চ পদে, সামরিক ও বিচার বিভাগের চাকরিতে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসক শ্রেণীর পট পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের অবস্থার অবনতি ঘটে। সামরিক বাহিনীতে মুসলমানদের বিপর্যয় শুরু হয় পলাশী যুদ্ধের পর থেকে। মীর জাফর যে ৮০০০ সৈন্য বরখাস্ত করেছিলেন তাদের অধিকাংশই মুসলিম।[১] ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘদিন মুসলমানগণ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরেজদের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাবার ফলে তাদের উপর নেমে আসে চরম বিপর্যয়। কারণ তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি অনেকটা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল ছিল। বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক বৃটিশ শাসননীতিকে মুসলমানদের দুর্দশার জন্য অনেক ঐতিহাসিকগণ দায়ী করেছেন। যেমন তন্মধ্যে বাংলার মুসলিম রেনেসাঁর উল্লেখযোগ্য অগ্রদূত নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) বলেনঃ

> 'ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মুসলমানদের হাতে এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল। হিন্দু সমাজ ছিল তাদের প্রজা। কিছুদিন পূর্বেও সরকারী কাজে তাদের প্রাধান্য ছিল। বেতন-ভাতা, জায়গির-জিরাত ইত্যাদি বাবদে তারা যথেষ্ঠ উপার্জন করত। ইংরেজ আমলে মুসলমান আমলের নিয়ম কানুন পরিবর্তন ও নতুন নতুন বিধি-বিধান প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদের অনেক সুযোগ সুবিধা হ্রাস পায়। তারা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'[২]

---

[১] আবদুল লতিফ খান, মুসলিম বাংলা ঃ আমার যুগে, (আবু জাফর শামসুদ্দীন অনুদিত), ঢাকা, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৮।

[২] আজিজুর রহমান মল্লিক, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, (দেলোয়ার হোসেন অনুদিত), ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৭২৪ সালে মুর্শিদাবাদের কোর্টে সভাসদ ও আমলাদের ২৪ জনের মধ্যে ২১ জন মুসলমান। বৃটিশদের ক্ষমতা লাভের পরপরই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশী হতে থাকে। পুরো ভারতের মধ্যে বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পতনের ইতিহাস বড় করুণ। উনিশ শতকের শেষ পাদে 'National Muhammadan Association' কর্তৃক পেশকৃত স্মারক পত্রে এবং সৈয়দ আমীর আলীর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'A cry from Indian Musalmans Nineteenth Century' এ মুসলমানদের দুর্দশার চিত্র যথার্থ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। W.W. Hunter তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Indian Musalmans' এ বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের দুরবস্থার জন্য বৃটিশ শাসননীতিকে দায়ী করেছেন। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান। তার তত্ত্বাবধানেই 'Statistical Account of Bengal and Asam', 'Imperial Gazetteer', 'Annuls of rural Bengal' প্রভৃতি গ্রন্থ সংকলিত হয়। 'লর্ড মেয়ো'র নির্দেশে তিনি 'The Indian Musalmans' গ্রন্থটি রচনা করেন। উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ সরকারকে একথা বোঝানো যে, অবহেলিত মুসলমানদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সুনজর দেয়া না হলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে ধ্বংসাত্মক বিদ্রোহ দেখা দিবে। একথার সমর্থনে তিনি উল্লেখ করেন ঃ

> 'But indeed.....there is now firm conviction that we have failed in our duty to Muhammadan subject of the Queen. A great section of the Indian Population.....decaying under British rule.....for their degeneracy is but one of the results of our political ignorance and neglect.'[3]

সর্বশেষ মোঘল সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক ইংরেজদের হাতে বাংলার দেওয়ানি প্রদানের সময় শর্ত ছিল যে, মুসলিম পদ্ধতি অনুসারে দেশ পরিচালিত হবে। প্রথম কয়েক বছর তারা দেশ

---

[3] W. W. Hunter, The Indian Musalmans, Cal-1945, Lahore-1964. P. 143

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনায় মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখতে সচেষ্ট হন। কিন্তু পরিবর্তন শুরু হয় অল্প ক'বছর পরেই। সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায়ঃ

> 'Silently, secretly and un-scrupulously, as the Muhammadans allege, the thunderbolt was forged which was to overhelm with ruin their status and power and privileges..... It was in direct conflict with the spirit of the treaty between Shah Alam and Clive.'[4]

মুসলমান সম্প্রদায় ও ইংরেজদের সম্পর্ক (বিশেষত ভারতে) প্রতিষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর। অতীতে মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্পর্ক মধুর ছিল না। এই প্রসঙ্গে ক্রুসেড-এর বিষয়টি স্মর্তব্য। ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার কারণেও মুসলমানদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস করত। অনেক বৃটিশ কর্মকর্তা তা অকপটে স্বীকার করেছেন।

তন্মধ্যে স্যার জন ম্যাকম ও হান্টার স্পষ্টভাবে বলেন, 'ইংরেজরা নিজেদের নিরাপত্তার কারণে মুসলমানদের সামরিক বিভাগের চাকরি থেকে দূরে রেখেছেন।'[৫]

মুসলমানরা পুনরায় হারানো শাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাবে, এই ভয় ইংরেজদের সব সময়ই ছিল। ফরায়েজী-ওহাবী আন্দোলন ও সিপাহী বিপ্লবের ফলে তাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। উনিশ শতক পর্যন্ত তাদের এ নীতি অব্যাহত থাকে। বিশ শতকের সূচনা লগ্ন থেকে তাদের নীতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি খানিকটা নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। এই সময় থেকে মুসলমানদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির জন্য তারা কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেন, তবে এর পিছনে সরকারের আন্তরিকতার চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অধিকতর ক্রিয়াশীল ছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও হিন্দু-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব করার জন্য পাল্টা শক্তি হিসাবে মুসলমানদের দাঁড় করানো ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

---

[4] Syeed Amir Ali, A Cry from Indian Musalman's The Nineteenth century, Age. 1882, P.44.

[৫] ড.ইমরান হোসেন, 'বৃটিশ শাসন ও বাংলার মুসলিম সমাজ', Bangladesh political studies, Vol-9/13, P. 86-89।

Dhaka University Institutional Repository

এর ফলে মুসলিম শিক্ষার উপরও নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহ্যবাহী মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। নবাবী আমলে বাংলার মুসলিম সমাজে খুবই অল্প বয়সে সন্তানদের লেখা-পড়ায় হাতে-খড়ি দেয়ার চিরাচরিত প্রথা ছিল। এই প্রথা সম্পর্কে William Adam's ১৮৩৫ সালে উল্লেখ করেনঃ

> 'When a child whether a boy or a girl, is four years, four months and four days old, the friends of the family assemble, the child dressed in his best clothes, brought into the family company and seated on a cushion in the presence of all, The alphabet, the forms of letter used for computation, the introduction to the koran, some verses of chapter XX and the whole of Chapter XXX, are placed before him, and he is taught to pronounce them in succession.'[6]

সব মুসলমান পিতাই তাদের সন্তান-সন্ততিদের বিদ্যা-শিক্ষা দেওয়াকে ধর্মীয় অবশ্য কর্তব্য মনে করতেন। মুসলমান ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য মক্তব (আরবী বিদ্যালয়) ও ফার্সী স্কুল এই দুই ধরনের বিদ্যালয় ছিল। মক্তবে কোরআন পাঠ ও ধর্মীয় বিধিবিধান শিক্ষা দেওয়া হতো। অন্যদিকে ফার্সী স্কুলে কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি সামান্য বাংলা ও ব্যবহারিক অঙ্ক, জনপ্রিয় ফার্সী সাহিত্য পড়ানো হতো। এই বিদ্যালয়গুলো মসজিদের সঙ্গে শিক্ষকের বাসগৃহে অথবা ধনী পৃষ্ঠপোষকদের কাচারী বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হত। ছাত্রদের যৎসামান্য ফি, পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্য ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি থেকে এই সব বিদ্যালয়ের ব্যয় বহন করা হত। বৃটিশ শাসন আমলে মুসলমানদের সার্বিক আর্থিক দুর্গতি, অভিজাত শ্রেণীর অধঃপতন ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলিম শিক্ষার উপর দুর্যোগ নেমে আসে।

---

[6] Adam's report on vernacular education in Bangal and Behar, Cal, 1868, P. 102.

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসকগণ বিদ্যা শিক্ষার জন্য লাখেরাজ জমি প্রদান করতেন। সৈয়দ আমীর আলী ও ফজলে রাব্বি প্রমুখ মুসলিম আমলের ২১ প্রকারের নিষ্কর জমির বর্ণনা দিয়েছেন। এর মধ্যে ১৪ প্রকার ছিল শুধু মুসলমানদের। হিন্দুদের জন্য ছিল ৫ প্রকারের এবং ২ প্রকারের ছিল উভয় সম্প্রদায়ের জন্য। ১৮২৩ সালে বীরভূমে ৩০,৭৮৯ বিঘা নিষ্কর জমি ছিল। এর মধ্যে মুসলমানদের দখলে ছিল ২২,৪৩২ বিঘা। আমিনি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সারা বাংলায় ৪০,০০০০০ বিঘা লাখেরাজ জমি ছিল। ১৮২৮ সাল থেকে পরবর্তী বছরগুলোতে সরকার কর্তৃক লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশী।[৭]

ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারী ভাষা হিসাবে চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৮৩৭ সালে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আট হাজার মুসলমানের স্বাক্ষর যুক্ত একটি স্মারকপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হয়। তখন তাদের জন্য ইংরেজি গ্রহণের অর্থ ছিল নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি ও সভ্যতা বিসর্জন দেওয়া। ফার্সী ছিল সমৃদ্ধ ভাষা; সাহিত্য-সংস্কৃতির বাহন। সুদীর্ঘ পাঁচশত বছরকাল তারা এই ভাষার মাধ্যমে সরকারী কাজ-কর্ম পরিচালনা করেছে। হিন্দু সমাজের মত তাদের পক্ষে তড়িঘড়ি করে ইংরেজি গ্রহণ সহজ ছিল না। ফলে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে তারা দীর্ঘকাল দূরে সরে থাকে। মুসলিম সমাজে এর মারাত্মক পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম শিক্ষার অগ্রদূত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা দরদমাখা ভাষায় উল্লেখ করেনঃ

> 'বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, একদিন যে জাতি জ্ঞানরাজ্যে জগতের আদর্শ ছিল তাহারাই আজ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত .....এমনই একদিন ছিল যখন শিক্ষা কেবল মুসলমানদেরই করায়ত্ত ছিল; আর আজ এমন দিন উপস্থিত হইয়াছে যখন মূর্খতাই তাহাদের অলংকার স্বরূপ। কোরআন ও হাদিসের পবিত্র শিক্ষা বিস্মৃত হওয়াতেই মুসলমানদের এই নিদারুণ মানসিক অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। ..... যাবৎ প্রত্যেক পরিবারের বালক এবং বালিকা শিক্ষা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব না হয় ও প্রতি

[৭] ঐ, পৃঃ ৬৭; আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

> পরিবারের কর্ত্তা শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত না হয় এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশের প্রত্যেক জেলায় কেন্দ্রীয় তহবিল প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাবৎ বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে। হিন্দু এবং মুসলমান শিক্ষা বিষয়ে সমকক্ষ না হইলে বঙ্গবাসী জীবনের কোন ক্ষেত্রে সম্যক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।'[৮]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বাংলার মুসলিম সমাজের আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন ঃ

> 'অতীতে আমরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি যেরূপ অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছি, পুনরায় সেরূপ ভ্রম করিলে চলিবে না। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে; তবে তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন যেন এতদ্‌সঙ্গে ইসলামের আদর্শ, সভ্যতা এবং ধর্ম্ম-প্রাণতার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে। হিন্দু ছাত্রের সমকক্ষ হইতে হইলে মুসলমান ছাত্রের জন্যও যথোপযুক্ত উদার শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু সেই শিক্ষার প্রতি যাহাতে মোছলেম অভিভাবকমন্ডলীর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা বর্ত্তমান থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাও অতীব প্রয়োজন।'[৯]

১৮৫০ এর পরে কয়েকজন মুসলিম মনীষী বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তাঁরা জড়তাক্লিষ্ট ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম মানসকে যুগোপযোগী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৬-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮), নবাব আমীর হোসেন (১৮৪৩), নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), মওলানা ওবায়েদুল্লা

---

[৮] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ৭ম খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ২য় সংস্করণ-১৯৮৮, পৃঃ ৭।

[৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

ওবেদী (১৮৩২-১৮৮৫), নবাব ফয়জুন্নেসা (১৮৩৪-১৯০৩), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) প্রমুখ মনীষীগণের প্রচেষ্টার ফলে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়। 'আঞ্জুমানে ইসলামী', 'লিটেরারী সোসাইটি', 'কলিকাতা মুসলিম শিক্ষা সভা', 'ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মিলনী', 'মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি' চট্টগ্রাম প্রভৃতি সংগঠন মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এই সময়ে মুসলিম সমাজে শিক্ষার অগ্রগতিতে সরকারের কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপও লক্ষণীয় তবে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে মুসলিম সমাজে আগ্রহ পরিলক্ষিত হলেও কিছু বাস্তব সমস্যার কারণে মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তার ব্যাহত হয়। সমস্যাগুলো খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির দারিদ্র্য

(২) ধর্ম শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব

(৩) ভাষা বাহুল্য

(৪) স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে মোসলমানের স্বল্পতা

(৫) স্কুল ও কলেজের হোস্টেলের ব্যয়াধিক্য

(৬) শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে মোসলমানদের অপ্রাচুর্য্য

(৭) বিশ্ববিদ্যালয় ও তদসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানাদিতে মোসলেম প্রতিনিধির অভাব

(৮) ডিষ্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে উপযুক্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধির অভাব।[১০]

---

[১০] ঐ, পৃঃ ৭। জনৈক সৈয়দ আবদুল গাফফার ১৮৯৯ সালে ইংরেজি শিক্ষায় মুসলিম অনগ্রসরতার কারণ সম্পর্কে লিখেনঃ '১) রাজভাষা শিক্ষা করাকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কার্য্যরূপ কুসংস্কার মনে করা, ২) অভিভাবকদের অবহেলা ও অদূরদর্শীতা, ৩) অর্থের অনটন, ৪) রাজভাষায় শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্ম্মকার্য্যে অনিচ্ছা ও বীতশ্রদ্ধ করা, ৫) হিন্দুদিগের বিদ্বেষ, ৬) গভর্ণমেন্টের উৎসাহের অভাব, ৭) বিলাসিতা, ৮) শ্রমবিমুখতা, ৯) শিক্ষা বিভাগে মুসলমান কর্মচারীর অল্পতা, ১০) কর্মচারীর নিয়োগের ভার হিন্দুদিগের হাতে ন্যস্ত থাকা।' মিহির ও সুধাকর, কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সাময়িকী, ৮ই পৌষ, ১৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

একজন সাবেক জনশিক্ষা পরিচালক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ও অন্যান্য ক'জন মনীষী এই সমস্ত অন্তরায় দূর করে বাঙালি মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তবে বক্ষমান আলোচনা মূলত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর জীবন ও তাঁর সাহিত্যবোধ কেন্দ্রিক। তাঁর আলোকিত জীবন ও সাহিত্য চেতনার বহু বর্ণিল বিভা এখানে মূল প্রতিপাদ্য। তবুও প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে এখানে সমসাময়িক দু'একজন অগ্রণী বুদ্ধিজীবীর নাম উল্লেখ করা হলঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতকের প্রথমপাদে যে ক'জন মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও নেতা মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে সেসব দূরীকরণে এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে মৌলভী আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩), স্যার আজিজুল হক (১৮৯০-১৯৪৭), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) প্রমুখের নাম অগ্রভাগে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাধারা ও নীতির প্রতিফলন ঘটেছে তাঁদের রচিত গ্রন্থে। আলোচ্য সময়ে মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ হলঃ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর 'শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান', 'Teachers Manual', 'নীতি, ধর্মশিক্ষা ও চরিত্র গঠন'; স্যার আজিজুল হকের 'History and Problems of Moslem Education in Bengal'(1917), 'Muhammadan Education'(1912), আবদুল করিমের 'Muhammadan Education in Bengal'(1900) প্রভৃতি। এসব ছাড়াও ১৯০০ সালে প্রকাশিত নবাব আলী চৌধুরী 'Vernacular Education in Bengal' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

উপরোল্লিখিতদের মধ্যে মৌলভী আবদুল করিম ও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা খুব কাছে থেকে বাংলার মুসলিম শিক্ষার নানা সমস্যা প্রত্যক্ষ করেছেন। মৌলভী আবদুল করিমের 'Muhammadan Education in Bengal' এবং আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর 'শিক্ষা-ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান' গ্রন্থটি তাঁদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফসল। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক-শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নয়ন চিন্তায় আত্মনিবেদিত মনীষীদের মধ্যে ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম অগ্রপথিক। তিনি সুদীর্ঘ চার দশক যাবৎ স্বীয়সমাজের শিক্ষা সম্বন্ধীয়, নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শিক্ষানীতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় তাঁর 'শিক্ষা-ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান', ও 'Teachers Manual' গ্রন্থদ্বয় থেকে। প্রথমোক্তটি প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে, কোলকাতা থেকে। এই গ্রন্থে তিনি বাঙ্গালী মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, মুসলিম শিক্ষার সমস্যা ও অন্তরায় এবং সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। তাঁর দীর্ঘকালের শিক্ষা বিভাগের চাকরী ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর আলোচনায়। বাংলার মুসলিম সমাজের শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা সম্পর্কে তাঁর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য মন্তব্যঃ

> 'সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৪.৫ জন ছাত্র। বলাবাহুল্য, যাহাদের বর্ণজ্ঞান মাত্র আছে, তাহাদিগকেও শিক্ষিত পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রকার ঘোরতর মূর্খতা এক তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গদেশ ব্যতীত সমাজ জগতে অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ম্যালেরিয়া অতীব মারাত্মক ব্যাধি সন্দেহ নাই, মূর্খতা ব্যাধি ম্যালেরিয়া অপেক্ষাও ভীষণ। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ও সম্পদ জনসাধারণের জ্ঞান; অপিচ বঙ্গীয় সমাজের গরিষ্ঠ অংশই মুসলমান। ইহারা শিক্ষা ক্ষেত্রে অবনত ও অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।'[১১]

মানসিক শক্তির পুষ্টি সাধন ও মনুষ্যত্ব লাভকে তিনি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, শরীর, মন ও আত্মার পুষ্টিসাধন ব্যতিরেকে মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। 'টিচার্স ম্যানুয়েল' গ্রন্থে তিনি লিখেছেনঃ

> 'উদ্ভিজ্জ বীজ যেমন বায়ু, জল ও সূর্য্যতাপ সাহায্যে ফলবান বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, শিশুও সেইরূপ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাবলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে।'[১২]

---

[১১] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

[১২] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ৮ম খন্ড, ঢা.আ.মি.পা.ট্রাস্ট, ঢাকা প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃঃ ৪২৫।

Dhaka University Institutional Repository

'আমার জীবন ধারা' গ্রন্থে তিনি মানসিক শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন। শরীর, মন ও আত্মা নিয়েই মানুষের সৃষ্টি। শরীরের জন্য যেমন ব্যায়াম প্রয়োজন তেমনি আত্মার জন্যও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। 'Teachers Manual' গ্রন্থে তিনি চরিত্র গঠন, নৈতিক ও ধর্ম শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের ধর্ম ও চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা লাভের সুযোগ নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। অথচ জাপানসহ বিশ্বের নানা সভ্য দেশে বিদ্যালয়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের বিধান রয়েছে। এই শিক্ষা পদ্ধতি মানব মনের উৎকৃষ্ট উপাদানগুলির উন্মেষ সাধনে অক্ষম বলে তিনি মন্তব্য করেন। ছাত্ররা যথাযথ ধর্ম শিক্ষা ও পাপ-পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী বিচার সম্পর্কে অবগত হলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি অনেকাংশে দূর হত। শাসকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও আন্দোলন বহুলাংশে কমে যেত বলে তাঁর ধারণা ছিল। তাঁর ধারণাগুলোর কিছু উল্লেখ করা হলো ঃ

১. পৃথিবীর সর্বত্রই মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বহুল পরিমাণ তাহার শিক্ষার উপর নির্ভর করে। একমাত্র শিক্ষার প্রভাবেই মানব প্রজ্ঞা, আত্মসংযম, আত্মসম্মান ইত্যাদি গুণের অধিকারী হইয়া থাকে।

২. শিক্ষা বিস্তারের ফলে জ্ঞানের প্রসার এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়। মানবের কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা প্রধানতঃ ইহাদের দ্বারাই দূরীভূত হয় এবং ইহারাই মনুষ্যকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, পাপস্পৃহা এবং হীনরুচির কবল থেকে রক্ষা করে।

৩. ইউরোপের সরকারি শিক্ষা প্রণালীর সহিত ধর্ম্মশিক্ষা অবিচ্ছেদ্য রূপে সংশ্লিষ্ট। তথায় প্রচলিত যাবতীয় শিক্ষা প্রণালীই কতগুলি সার্বভৌমিক এবং অবিসংবাদিত নৈতিক বিধান মানিয়া লইয়াছে। সুইজারল্যান্ডে ধর্মশিক্ষা, লিখন, পঠন, গণিত, ব্যাকরণ ইত্যাদির সহিত একাসনে প্রতিষ্ঠিত।

৪. ভারতবর্ষে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়েই যে শুধু ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নহে; বরং সমস্ত বেসরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিও এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

Dhaka University Institutional Repository

৫. স্কুল-কলেজে প্রচলিত শিক্ষার প্রকৃতির সহিত দেশের সুশাসন, শাসনযন্ত্রের শৃঙ্খলা এবং বিশুদ্ধতা, সর্বসাধারণের সুখ ও সম্পদ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি মানব মনের উৎকৃষ্ট উপাদানগুলির উন্মেষ সাধনে অক্ষম। সুতরাং এতদ্বারা অসন্তোষ এবং অশান্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে বাধ্য।

৬. ধর্ম্ম বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রাচ্য শিক্ষার আদর্শের প্রতিকূল। ভারতের হিন্দু মোছলেম নির্বিশেষে উভয়েরই বৈষয়িক শিক্ষা প্রণালী ধর্ম্ম প্রভাব প্রযুক্ত ছিল। প্রত্যুত তাহাদের আদর্শানুযায়ী বিদ্যা ও ধর্ম্ম অভেদ্যরূপে জড়িত। যুগপৎ ধর্ম্ম এবং বৈষয়িক শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে কাহাকেও সম্যক্ শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত করা হইত না।

৭. চরিত্র গঠনই শিক্ষার সর্বপ্রধান এবং কেন্দ্রীয় সমস্যা হওয়া উচিত। নীতি ও চরিত্রহীন শিক্ষা অনর্থের কারণ। ছাত্রগণের নীতি এবং চরিত্র গঠন কার্য্যে সুনিয়ন্ত্রিত গৃহ এবং সুশিক্ষিত মাতাপিতার প্রভাব প্রভূত পরিমাণে কার্য্যকরী।

৮. ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, জীবনাখ্যায়িকা ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং নগরবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ এবং শিক্ষাদান করিতে হইবে।

৯. ধর্ম্মশিক্ষা এবং চরিত্র গঠন পরস্পর নির্ভরশীল এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃত শিক্ষার জন্য উভয়েরই প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী অথচ নৈতিক চরিত্রে বিশেষ উন্নত এরূপ থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় কিন্তু কোটি কোটি অশিক্ষিত লোকের নিকট ধর্ম্মসংশ্রববিরহিত কোন উপদেশই ফলপ্রসু হয় না।.....

১০. ধর্ম্ম শুধু বাচনিক স্বীকৃতি নহে, বাস্তব জীবনে কার্য্যতঃ ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। ধর্ম্মজীবন যাপনের জন্য কেবল কতকগুলি বাহ্যিক প্রথা এবং অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নহে, বরং আমাদের সমস্ত কর্ম্ম এবং সমগ্র জীবনকে ধর্ম্মানুমোদিত করিয়া গঠন করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

১১. যে শিক্ষা মানবমনে সর্বমঙ্গলধারা করুনাময় সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু না কিছু ধারণার উদ্রেক করেনা, তাহাকে কখনই পূর্ণ শিক্ষা বলা যায় না। শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক সর্বপ্রকার শিক্ষাকেই ধর্ম্মশিক্ষা সাহায্যে পরিপূর্ণতা দান করা প্রয়োজন। দেহমনের পুষ্টির জন্য যেরূপ উপযুক্ত আহার ও অনুশীলন প্রয়োজন, মানবমনে ধর্ম্ম এবং নৈতিকভাবের উদ্দীপনাও তদ্রূপ আবশ্যক।

১২. একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী ছাত্রের সমাবেশ হেতু ধর্ম্মোপদেশ দানে অসুবিধা আছে সত্য। সরকার স্বপরিচালিত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া বেসরকারি এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার পথে কোন বাধা দেখা যায় না। অবশ্য এতদ্বারা যাহাতে ছাত্রগণের বিশিষ্ট মত বা ধর্ম্মভাবে কোনরূপ আঘাত না লাগে, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

১৩. হিন্দু ছাত্রগণের জন্য কিরূপ ধর্ম্মোপদেশ সমীচীন হইবে, সে সম্বন্ধে মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়; তথাপি ঐক্যস্থাপন অসম্ভব নয়। তবে মোসলেম ছাত্রগণের জন্য ধর্ম্মশিক্ষার নির্দ্দিষ্ট Syllabus প্রস্তুত করা কঠিন নহে। তাহাদিগকে ছাত্রাবাসে ব্যক্তিগত রুচি এবং মতানুযায়ী ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালনের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে।

১৪. ভূতপূর্ব্ব আর নেথান, সি.আই.সি.এস. মহোদয়ের নেতৃত্বে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে ধারাবাহিকরূপে অনেকগুলি সভা আহূত হয় এবং তথায় ধর্ম্মত নীতি শিক্ষার সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়। তাঁহার সিদ্ধান্ত ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার সমীপে উপস্থিত করা হইয়াছে। অন্যান্য অনেক মন্তব্যের মধ্যে ইহাও ছিল যে, নীতি শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সরকার বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিবেন; ধর্ম্ম শিক্ষার ক্লাশে কোন ছাত্র যোগদান করিবে কি না করিবে,

Dhaka University Institutional Repository

মাতাপিতা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে ছাত্রের মতামত গ্রহণ করা হইবে না।

১৫. সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়সমূহ ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার জন্য স্ব স্ব ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে, তাহাতে সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই। বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহ গভর্ণমেন্ট হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করিবার অধিকার প্রদান করা প্রয়োজন এবং অভিভাবকগণের মতামত লইয়া তাঁহাদের সন্তানদের জন্য ধর্ম্ম এবং নীতিকে অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত করা আবশ্যক।.....

ধর্ম্ম এবং নীতিকে বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্য বিষয়ের অঙ্গস্বরূপ মনে করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে কখনই যুবকগণের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না।

১৬. জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেম সিদ্ধিলাভের তিনটি মার্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রেম-মার্গকেই হিন্দু সাধক ও মোসলেম সুফীগণ সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন। আমিত্ব ত্যাগের প্রধান উপায় প্রেম। সূফীগণ প্রেমকেই চরম তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। হিন্দু 'নির্বাণ' সূফীদিগের 'বাকা' নামে অবিহিত।.....

১৭. ধর্ম্ম নির্বিশেষে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক করা প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য। সাম্প্রদায়িক শিক্ষা এই পুস্তকের আলোচ্য নহে। মানব প্রেম সকল ধর্ম্মে প্রধান স্তম্ভ। স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে সৃষ্টের প্রতি ভালবাসা স্বভাবতই জন্মে।..... উহার ফলে ধর্ম্মে অনুরাগ ও চরিত্র গঠিত হয়। শিক্ষক ধর্ম্মপরায়ণ হইলে তাহার প্রভাব ছাত্রদিগের উপর সুফলপ্রসু হয়। একটি ছাত্রও ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইলে, শিক্ষক স্বীয় পরিশ্রম কথঞ্চিৎ পুরস্কৃত মনে করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগের শিক্ষকগণ এই দায়িত্বের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন না। তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ নিবেদন যেন তাহারা সুমতি বালক-

Dhaka University Institutional Repository

> বালিকাদিগের কোমল হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই সত্যের আলোকের উন্মেষ করাইতে ও ধর্ম্মভাব জাগাইতে যত্নবান হন।[১৩]

এ থেকে বুঝা যায়, তিনি শিক্ষাকে কতটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। অশিক্ষাকে তিনি ঘাতক ব্যাধি ম্যালেরিয়া অপেক্ষা মারাত্মক হিসাবে অভিহিত করেছেন। যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে আধুনিক শিক্ষা যে বঙ্গীয় মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য তা তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিক্ষা ব্যতীত জীবন সংগ্রামে সাফল্য লাভ সম্ভবপর নয় বলে তিনি দ্ব্যর্থহীন মন্তব্য করেছেন। তাই তিনি শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলিম সমাজের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তিনি মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, হিন্দু মুসলিম সমাজের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য বিরাজ করছে তা দূর করা না হলে এর বিষময় প্রভাব থেকে সরকারও অব্যাহতি পাবে না। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা রোধ এবং 'সব শ্রেণীর প্রজাদের উন্নতি বিধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা সরকারের কর্তব্য' এটা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন।

মুসলিম সমাজে শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার অন্তরায় হিসাবে দারিদ্র্য ও সুযোগের অভাবকে তিনি দায়ী করেছেন। কিন্তু তিনি গোঁড়ামী প্রসঙ্গে কোথাও উল্লেখ করেননি। এটি অসাবধানতাবশত নয়। তিনি যে সময়ে গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন তখন মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন গোঁড়ামী মুখ্য কারণ হিসাবে দেখা দেয়নি। দারিদ্র্য, প্রতিকূল পাঠ্যসূচি, ভাষাবাহুল্য, হোস্টেলের ব্যয়াধিক্য ও অপ্রাচুর্য, ধর্মীয় শিক্ষার অভাব প্রভৃতিকে তিনি মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর পূর্বসূরীগণ গোঁড়ামী ও কুসংস্কারকে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। নবাব আবদুল লতিফ ১৮৬৩ সালে বলেনঃ

---

[১৩] ঐ পৃঃ ৭১৬-৭২৪।

Dhaka University Institutional Repository

> 'কুসংস্কার ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত এবং ইংরেজ ও হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৮৬৩ সালে এপ্রিল মাসে আমি মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করি।[১৪]

১৮৯৯ সালে জনৈক আব্দুল গাফ্ফার কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মিহির ও সুধাকর' নামক সাময়িকীতে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে মুসলিম সমাজের অনীহার দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম কারণটি ছিল 'রাজভাষা শিক্ষা করাকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্যরূপ কুসংস্কার মনে করা।'[১৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সম্ভ্রান্ত ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারের সন্তান। এ সময়ে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা আসেনি। স্বাভাবিক কারণে তিনি গোঁড়ামীকে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখেননি। তবে ধর্মশিক্ষার প্রতি বাঙ্গালি মুসলিম সমাজে প্রচন্ড অনুরাগ ও আগ্রহের প্রসঙ্গ তাঁর লেখনিতে প্রকাশ পেয়েছিল।

তিনি স্বীয় সমাজে সময়োপযোগী ও জাগতিক শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেনঃ

> '.....জীবন সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য ইহাদিগকে পৃথিবীর অপর সকলের সমকক্ষ করিতে হইবে। জনসাধারণের অজ্ঞানান্ধকার বিদুরিত করিতে হইলে সম্যকরূপে শিক্ষা বিস্তার প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যতীত বর্তমান যুগের জটিলতার মধ্যে জীবন সংগ্রামে মোটামুটিভাবে সাফল্য লাভ করাও সম্ভবপর নহে।'[১৬]

---

[১৪] নবাব আবদুল লতিফ খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।

[১৫] গোলাম মঈনউদ্দিন কর্তৃক রচিত 'খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ জীবন ও জীবনচেতনা' শীর্ষক অপ্রকাশিত গবেষণাকর্ম, পৃঃ ১১।

[১৬] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, শিক্ষা-ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বিস্তারে তাঁর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি মুসলিম ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেনঃ

> 'মোছলেম ছাত্রদের জন্য বর্ত্তমানে এরূপ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন যেখানে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রগণ ইছলামের বৈশিষ্ট্য না হারাইয়াও বর্ত্তমানে জাগতিক সভ্যতার সমকক্ষতা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে।'[১৭]

দু'টি প্রধান কারণে তিনি মুসলিম সমাজে জাগতিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন: (১) 'কোরআন এবং হাদীসের পবিত্র শিক্ষা বিস্মৃত হওয়াতেই মোছলমানের এই নিদারুণ মানসিক অবনতি সংঘটিত হইয়াছে। (২) বাঙ্গালার মোছলমান কৃষক কতকটা ধর্ম্মান্ধ; সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন বৈষয়িক শিক্ষা তাহাদের মনঃপুত নয়।'[১৮]

মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনি এমন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন, যাতে মুসলমান অভিভাবকদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকে। তিনি প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে যুগোপযোগী করার সুপারিশ করেন। অন্যদিকে সৈয়দ আমীর আলী মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পূর্ন তুলে দেয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

বাঙ্গালি মুসলমানদের আরেক প্রধান সমস্যা ভাষা সমস্যা। মুষ্টিমেয় বহিরাগত মুসলমান ছাড়া সিংহভাগ বাঙ্গালি মুসলমানের মুখের ভাষা বাংলা হলেও তাদের মাতৃভাষা রাষ্ট্র ভাষা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিন ধরে চলে। এ সমস্যার উৎস খুঁজতে আমাদের পিছনে ফিরে যেতে হবে। এ সমস্যার বীজ প্রোথিত আছে এদেশের মুসলিম সমাজগঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে। বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে মূলত এদেশে মুসলিম সমাজ গঠন শুরু হয়। মুসলিম সমাজ গঠিত হয় বহিরাগত মুসলমান (শাসকবর্গ, পরিষদবর্গ, সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী, ওলামা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি) ও নিম্নবর্গের হিন্দু ও বৌদ্ধদের

---

[১৭] ঐ পৃঃ ৭।

[১৮] ঐ পৃঃ ৭ ও ৬।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ধর্মান্তরিত দেশজ মুসলমানদের সমন্বয়ে। উনিশ শতকের সামাজিক বিন্যাসে বহিরাগত মুসলমানরা আশরাফ (উঁচুজাত) ও দেশজ মুসলমানরা আতরাফ (নিচুজাত) নামে পরিচিতি লাভ করে। আশরাফদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাষা ছিল ফার্সী। এদের সংখ্যা ছিল অল্প (১.৫%)। অথচ এরা ছিলেন বাঙালি মুসলিম সমাজের স্বঘোষিত নেতা। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশজ মুসলমানদের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার কারণে আশরাফগণ তাদের নিজেদের উর্দূভাষাকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর চাপাতে চেষ্টা করেন। এভাবে ভাষা নিয়ে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের সূচনা হয়। উনিশ শতকের শেষপাদে মুসলিম সমাজের ভাষা-দ্বন্দ্ব তীব্ররূপ ধারণ করে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই বিতর্ক অব্যাহত থাকে। ভাষা সমস্যা মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দেয়। 'মিহির ও সুধাকর'-এর এক সম্পাদকীয়তে ১৮৯৯ সালে উল্লেখিত হয়ঃ

> 'যে স্থলে হিন্দুদিগকে বাঙালা ও ইংরেজী এই দুইটি মাত্র ভাষা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন..........সেই স্থলে বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে পাঁচটি ভাষা শিক্ষা না করিলে চলিতে পারে না। ধর্ম্মভাষা আরবী, তৎসহ পার্সী এবং উর্দূ এই দুইটি, আর রাজভাষা ইংরেজী তৎসহ মাতৃভাষা বাঙালা।'[১৯]

ভাষা সমস্যা সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) অত্যন্ত সজাগ ছিলেন এবং এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন। তিনি ধর্ম গ্রন্থের ভাষা আরবী, মাতৃভাষা বাংলা ও সরকারি ভাষা ইংরেজি শিক্ষা করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি ফার্সী ও উর্দুভাষা তুলে দিয়ে তদস্থলে বাংলা প্রচলনের মাধ্যমে ভাষা সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগের সুপারিশ করে বলেনঃ

---

[১৯] মিহির ও সুধাকর, প্রাগুক্ত, ৮ই পৌষ, ১৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

'ধর্মগ্রন্থের ভাষা এবং মাতৃভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য্য। আবার ইংরেজি পৃথিবীর সাধারণ ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষত: সামাজিক, ঝণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কারণে ইংরেজি শিক্ষা না করিলে চলে না। সুতরাং জাতীয় ইতিহাস ইত্যাদি বহুল পরিমাণে মাতৃভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হইলে মোছলমান ছাত্রের গুরুভার কিছুটা লাঘব হইবে।.....পারস্য ভাষা উঠাইয়া দিলে এবং ক্রমে ক্রমে উর্দুর পরিবর্তে বাঙ্গালা প্রচলন হইলে ভাষা সমস্যা কিছু সরল হইয়া আসিবে।'[২০]

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে এটি স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, তিনি মাতৃভাষা বাংলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং উর্দু ও ফার্সীকে বাহুল্য মনে করেছেন। এখানে তাঁর পূর্বসূরি নবাব আবদুল লতিফ বা সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তার সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবদুল লতিফ ও আমীর আলী মাতৃভাষা হিসাবে বাংলার পক্ষাবলম্বন করেননি। আবদুল লতিফ মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজির সঙ্গে আরবী-ফার্সী শিক্ষা দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য উর্দু এবং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের জন্য মুসলমানী বাংলা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। এক্ষেত্রে তিনি বাংলার মুসলিম সমাজকে অভিজাত ও অনভিজাত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। অন্যদিকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা বাংলার উপর জোর দিয়েছেন এবং গোটা মুসলিম সমাজকে এক করে দেখেছেন।

আবাসিক সমস্যা মুসলিম ছাত্রদের আর একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের লেখনী, কোলকাতা কমিশনের কাছে দেয়া সাক্ষ্য, সরকারী রেকর্ড প্রভৃতিতে এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। তৎকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপ্রতুল ছিল।

---

[২০] খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ, শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্যের কারণে অনেক মুসলিম ছাত্রের পক্ষে জেলা শহর বা কোলকাতায় গিয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন সম্ভব হতনা। আবার অনেকের আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও সামাজিক বৈষম্যের জন্যে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া মুশকিল হত। একেত হোস্টেল সংখ্যা ছিল নগণ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকার সচ্ছল মুসলিম পরিবারের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। ফলে মুসলিম ছাত্রদের জায়গির পাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। অন্যদিকে হিন্দু গৃহস্থরা মুসলমানদের বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি হত না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) আবাসিক সমস্যার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। তিনি হৃদয় বিদারক ভাষায় বর্ণনা করেনঃ

> 'একটি রজকালয়ে আমার স্থান নির্দিষ্ট হইল। মিঞা আমির চাঁদ নামক একটি বৃদ্ধের হাতে আমার ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন। আহারান্তে আমাকে অন্যত্র গিয়া আঁচাইতে হইত, এই হেতু যে, আমি মুছলমান। পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐ বাড়ির কর্তৃপক্ষ রামগতি রজক স্বয়ং হরিসংকীর্ত্তনকারী এবং ঈশ্বরপ্রেমিক বলিয়া হিন্দু-ভক্তদিগের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। যাহা হউক, আমি উক্ত আবেষ্টনের অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ায় আমার সাহচর্য্য গৃহকর্ত্তৃপক্ষের মন:পুত হয় নাই, তাই আমাকে অন্যত্র আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে হইল। ..... যাহা হউক, এক্ষণে আমি অনঙ্গ বাবুর বহির্বাড়ীতে স্থান পাইলাম। আমার পাকশালার জন্য অনঙ্গ বাবুর গোশালার অর্দ্ধাংশ নির্দিষ্ট হইল।'[২১]

লেখাপড়ার জন্য কোলকাতায় গিয়ে তিনি বড় বিপাকে পড়ে যান। তথায় অনেক চেষ্টার পর সরকারি পায়খানা ও পেশাব খানার পাশে একটি কামরা ভাড়া নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি ছিল মুটিয়া-মজুরদের বস্তি।[২২]

---

[২১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, আমার জীবন ধারা, আ.মি.পা. ট্রাষ্ট, ৮ম সংস্করণ, ঢাকা ২০০৩, পৃঃ ৩।

[২২] ঐ পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতার আলোকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) তাই মুসলিম ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। অনেক মুসলিম ছাত্র আর্থিক অনটনের জন্যে হোস্টেলে থাকতে পারত না। তাই তিনি সিট ভাড়া ও অন্যান্য কর থেকে মুসলিম ছাত্রদের অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তৎকালে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের একই গৃহে থাকার ক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যা দেখা দিত। ছোঁয়া-ছুঁয়ি ও জাত-পাতের ব্যাপারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ছাত্রদের পক্ষ থেকে মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে খেতে ও বাস করতে আপত্তি উঠত। এ বিষয়টি নিয়ে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকে স্বতন্ত্র হোস্টেলের প্রস্তাব করেন, তবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর প্রস্তাব ছিল বাস্তবানুগ। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাছে তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেনঃ

> 'Hindu and Muhammadan boarders should as possible, be accommodated in the same place, seperate arrangement being made for cooking and other purpose. Combined hostels will be wellcomed both from the scholastic and the economic point of view. They will greatly facilitate the growth of an intimate brotherhood among the students of different creeds and will permit of an organised tutorial system.'[23]

খাবার দাবারের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের গোঁড়ামী তাৎক্ষণিকভাবে দূর করা অসম্ভব ছিল। এই ধরনের নাজুক বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করাও সমীচীন নয়। তাই তিনি আহার ও পাক-শালা পৃথক রেখে একই গৃহে বিভিন্ন ধর্মের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করেছেন। এক সঙ্গে বাস করলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর উদার ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

[23] Calcutta University Commission, 1917, Chapter vi.P. 174.

Dhaka University Institutional Repository

অবহেলিত নারী সমাজের শিক্ষার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন। নারী শিক্ষাকে তিনি নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করেন। 'পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষে এলম শিক্ষা ফরজ' এই উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, 'যিনি এলম রাখেন তাঁর কর্তব্য পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কে অংশীদার করা।' স্ত্রী-জাতিকে চির-অজ্ঞতা ও তমসাচ্ছন্ন রাখা সমীচীন নয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, স্ত্রী শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি অনুদানের প্রায় সবটাই হিন্দু বালিকাদের শিক্ষার পিছনে ব্যয় হয়। অথচ মুসলমান ছাত্রীদের পড়ার জন্য কোন স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নেই। তিনি তাঁর কর্মজীবনে অন্তঃপুর বাসিনীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহনে ব্রতী হন।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল। এটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজের দারিদ্র্য ছিল এর প্রধান কারণ। এ ছাড়াও আরো বহু কারণ বিদ্যমান ছিল যার জন্যে মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাছে সাক্ষ্য প্রদানকালে মুসলমান নেতারা এসমস্ত কারণ সঠিকভাবে তুলে ধরেছিলেন। তৎকালে বাংলার মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও নেতাগণ কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। এদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)ও ছিলেন। তিনি একাধিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ও পরামর্শ প্রদান করেন। মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে মুসলিম নেতাদের অভিমতের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপঃ

a. The lack of adequate provision for instruction in Persian and Arabic,
b. the difficulty experienced by Muslim students in obtaining admission into colleges,
c. the lack of hostel accommodation for Muslim students,
d. the encouragement by the University of a Sanscritised Bengali, which is difficult for Musalmans to acquire,

Dhaka University Institutional Repository

e. the use of University books which are either uncongenial to Musalmans as being steeped in Hindu religion and tradition, or even positively objectionable to them, because they contain statements offensive to Muslim sentiment. Elaphinstone's History of India is cited as a case in point,

f. the requirement that each candidate should write his name instead of giving a number of on the answer books shown up a University examinations in,

g. the delay in the issue by the University of certain Arabic and Persian text books.[24]

প্রজ্ঞাবান খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)ও তাঁর 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান' গ্রন্থে মুসলিম উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হিসাবে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে এসব অন্তরায় দূর করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি পরিবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটিতে মুসলিম প্রতিনিধি নিয়োগ, হোস্টেল সুবিধা বাড়ানো, শিক্ষক নিয়োগে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। তিনি বলেনঃ

> 'শিক্ষার আদর্শ নির্মাণ কার্য্যে সিনেট, সিন্ডিকেট, বোর্ড, নিয়োগ সমিতি, পাঠ্য নির্বাচন সমিতি ইত্যাদির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এই সকল সমিতিতে মোছলমান না থাকায় মোছলেম শিক্ষার যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইতেছে।
>
> .....
>
> বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সমিতিতে যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের উপযুক্ত প্রতিনিধি স্থান পাইতে পারে তজ্জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইবে।'[২৫]

---

[24] Calcutta University Commission, Op. Cit. P. 175.

[২৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, শিক্ষা-ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান,প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শিক্ষার উৎসাহকল্পে তিনি প্রতি বিভাগে অধিকতর মুসলিম শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগের পরামর্শ দেন। তৎকালে শিক্ষা বিভাগের চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তিনি মিউনিসিপালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ডের শিক্ষা সম্পর্কীয় সভায় যথেষ্ট মুসলিম প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক মনে করেন।

তাঁর শিক্ষা চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সর্বত্র জ্ঞানের আলো প্রবেশ করানো। শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসাবে তাঁর দায়িত্ব ছিল সকল জাতি-গোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নতি সাধন করা। তিনি সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন। সমাজের এক বৃহৎ অংশকে পশ্চাৎপদ রেখে সুষম সামাজিক উন্নয়ন অর্থহীন। সর্বশ্রেণীর প্রজাগণ যাতে সমভাবে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে তার সুব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। একজন সচেতন ও দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন। তাঁর নীতি ছিল, 'শরীরের অঙ্গ বিশেষের মাংসপেশীগুলি পরিচালনা করা এবং অবশিষ্টগুলি অকর্মণ্য করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নহে, কারণ প্রকৃত শক্তি লাভ মাত্র তখনই সম্ভব হয়, যখন ইচ্ছাবৃত্তির আজ্ঞাধীন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একাদিষ্ট হইয়া শ্রমলিপ্ত হয়। যে অঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তাহাদের দিকেই অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।'[২৬]

মুসলমানদের প্রতি অধিক সহানুভূতি নয় বরং মানবতার দিক থেকে সকলের প্রতি সমতাবোধ (এটাই ধর্মীয় মূল্যবোধ) তাঁর সাহিত্যে যে ভাবে ফুটে উঠেছে তার উপযোগিতার কথা বিবেচনা করেই ***'খানবাহাদুর আহ্ছানুল্লাহ (রঃ)এর সাহিত্যে ধর্ম ও মানব প্রেম'*** শীর্ষক বর্তমান গবেষণা কর্মের অবতারণা। উল্লেখ্য, এখানে খানবাহাদুর আহছানউল্লা(রঃ)এর নিজের নাম সহ কিছু নাম তিনি যেভাবে উল্লেখ করেছেন সে বানানেই বক্ষমান অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[২৬] গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ভূমিকা ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও দেশকাল

১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন খুলনা (বর্তমান সাতক্ষীরা) জেলার নলতা গ্রামে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের তারিখ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য সূত্র নেই। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, 'সাধারণতঃ কোনো মোছলমান কোষ্ঠী-পত্র রাখেন না, সেই জন্য বয়স সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নহি।'[১] এ সময়ে তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়েই জীবিত ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর সুশিক্ষার প্রতি পিতা ও পিতামহ ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। তাঁর বয়স পাঁচ বছর হওয়ার পূর্বেই তিনি পড়াশুনা শুরু করেন এবং তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার ভার মতিলাল ভঞ্জ চৌধুরী নামক একজন স্থানীয় পন্ডিতের হাতে ন্যস্ত করেন। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করে তিনি নলতা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পর তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং কিছুকাল পড়াশুনা বন্ধ রাখেন। অতঃপর পিতার নির্দেশক্রমে তিনি কোলকাতার নিকটবর্তী টাকী গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে ভর্তি হন। তৎকালে মুসলিম ছাত্রাবাসের অভাব হেতু অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রকে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে হতো। কিন্তু বাসা ভাড়া পাওয়া মুসলমান ছাত্রদের জন্য খুব সহজ ছিল না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ছাত্রাবস্থার অনেক বিবরণ থেকে একথা জানা যায়। টাকীর অনঙ্গ মোহন বসু তাঁকে টাকীতে সর্বপ্রকার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখানে তিনি একটি রজকালয়ে থাকবার স্থান পান। আমীর চাঁদ নামক এক বৃদ্ধ তাঁকে রান্নাবান্না করে

---

[১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, আমার জীবন ধারা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ৮ম সংস্করণ, ঢাকা-২০০৩, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

দিতেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকতেন। এখানে তিনি বেশি দিন থাকতে পারেননি। এখানকার স্মৃতি বর্ণনায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বলেছেনঃ

> 'আহারান্তে আমাকে অন্যত্র গিয়া আঁচাইতে হইত, এই হেতু যে আমি মুছলমান। পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐ বাড়ির কর্তৃপক্ষ রামগতি রজক স্বয়ং হরিসংকীর্ত্তনকারী এবং ঈশ্বরপ্রেমিক বলিয়া হিন্দু ভক্তদিগের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। যাহা হউক আমি উক্ত আবেষ্টনের অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ায় আমার সাহচার্য্য গৃহকর্ত্তৃপক্ষের মনঃপুত হয় নাই তাই আমাকে অন্যত্র আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে হইল।'[২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর অসুবিধার কথা বিবেচনা করে অনঙ্গমোহন নামে এক ব্যক্তি তাঁকে নিজ বাড়িতে স্থান দিলেন। অনঙ্গমোহন বসুর গোশালার অর্ধাংশ তাঁর পাকশালার জন্য বরাদ্দ হলো। এখানে বৃদ্ধ আমীর চাঁদ তাঁর খানা পাক করতেন ও পরিবেশন করতেন। অন্য কোথাও স্থান না পেয়ে তিনি অনঙ্গ বসুর এই আশ্রয়কে আল্লাহ্তায়ালার রহমত ভেবে গ্রহণ করেন এবং এই আশ্রয় ও আশ্রয়দাতা সম্পর্কে মনে কোন প্রকার ঘৃণা পোষণ করেননি। এই স্থান সম্পর্কে তিনি স্মৃতিকথায় বলেছেনঃ

> 'অন্য কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া সাদরে অনঙ্গবাবুর আশ্রিত হইয়া রহিলাম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ গো-সেবাকে মাতৃসেবার স্থান দিয়া থাকেন, তাই আমাকে গোশালায় স্থান দিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। আমিও স্বীয় অদৃষ্টের প্রতি প্রসন্ন থাকিয়া কালাতিপাত করিতে থাকিলাম।'[৩]

টাকী গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্তমান ৭ম শ্রেণীতে) ভর্তি হন। এই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান ৯ম শ্রেণীতে) উন্নীত হওয়ার পর একদিন কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ঘরের

---

[২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু বালক তাঁকে কোলকাতায় পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধার কথা বলে এবং কোলকাতায় যাওয়ার প্রলোভন দেখায়। মফস্বলের শিক্ষা অপেক্ষা শহরের শিক্ষামান উন্নত ভেবে তিনি কোলকাতায় গিয়ে পড়াশুনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং পিতা-মাতাকে এ ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম হন। টাকী স্কুল থেকে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে তিনি কোলকাতায় আসেন এবং উক্ত বালকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু কোলকাতায় এসে তিনি নতুন এক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। কোলকাতায় কোন জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে উক্ত ছেলেরা তাঁকে কোন সাহায্য করতে পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে অনেক খোঁজাখুঁজি ও কষ্ট স্বীকার করে তিনি একটি থাকবার জায়গা ঠিক করেন। এ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লিখিত হয়েছেঃ

> '.....সাত পাঁচ ভাবিয়া একাকী চেতলাঘাট হইতে নামিলাম ও বাসার অনুসন্ধানে তৎকালীন চাউলপট্টিতে উপস্থিত হইলাম। একটি দোকানদারের মাথায় টুপি দেখিয়া সেই দিকে ছুটিলাম ও ভাড়াটিয়া বাড়ির অনুসন্ধান করিলাম। তিনি আমাকে হানিফ বাবু নামক তাঁহার জনৈক মুছলমান বন্ধুর নিকট পাঠাইলেন। সেখানে অতি আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইলাম কিন্তু তিনি প্রথম মাথা নাড়িয়াই জানাইয়া দিলেন-না, কোন বাসোপযোগী বাড়ি খালি নাই। কিয়ৎ পরেই তিনি পুনরায় আমায় ডাকিয়া বলিলেন-হাঁ, একটি ছোট কামরা খালি আছে, কিন্তু তাহা কি তোমার উপযোগী হইবে? আমি বলিলাম-যে কোনো স্থানে মাথাটি রাখিতে পারিলেই ধন্য হইব। তখন তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠিয়া আমাকে সঙ্গে লইলেন ও একটী ছোট্ট কামরা যাহা মুটিয়াদের থাকিবার জন্য অভিপ্রেত, তাহাই দেখাইলেন। মাসিক ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন-এক টাকা চারি আনা। সংলগ্ন কামরাগুলিতে মুটিয়া-মজুরের অবস্থান। সরকারি পায়খানা ও সরকারি পেশাবখানা কামরাটির নিকটবর্তী। অনন্যোপায় হইয়া অতি দুঃখের সহিত এই কামরাটি লইতে রাজী হইলাম। দরমার বেড়া, দরমার দরজা, গোলপাতার চাল। কামরাটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৬ হাত

Dhaka University Institutional Repository

> ৬ হাত হইবে। ইহা ভবানীপুরের অন্তর্গত চাউলপট্টিতে অবস্থিত। একটি তক্তপোষ খরিদ করিলাম। উহার বাবুর্চ্চি আমীর চাঁদ, আমি প্রবাসী ছাত্র। পিতার আদেশ-শহরের লোকের সহিত মিশিবে না, তাই দিবারাত্র ঐ Solitary cell বা নির্জ্জন কারাবাসতুল্য ঘরের মধ্যে সময় অতিবাহিত করিতাম।'[৪]

মাতাপিতার প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাঁর সমগ্র জীবনেতিহাস থেকে আমরা লক্ষ্য করি, মাতাপিতার আদেশ নিষেধকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং জীবন যাপনের সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল থেকেছেন। এ নির্ভরতা তাঁকে জীবন সংগ্রামে জয়ী করেছে। চলার পথের কোন দুঃখবোধ তাঁকে এতটুকুও বিচলিত করতে পারেনি। শিক্ষক, গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ছিল অপরিসীম যা আজকের দিনে বিরল। তাঁর ছাত্র জীবনের সহকারী, ভৃত্য ও বাবুর্চিকেও তিনি সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। কোলকাতায় এসে যখন তিনি বাসস্থানের খোঁজে পাগলপারা তখন আমীর চাঁদের উক্তিকে তিনি এভাবে স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেনঃ

> 'বৃদ্ধ আমীর চাঁদ আমাকে বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে বারংবার আদেশ করিতে লাগিলেন।'[৫]

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মতিলাল ভঞ্জ চৌধুরী। বাল্যশিক্ষককে তিনি পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন। এই শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

> '..... আমিও তাঁহার জীবনকাল পর্যন্ত যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ব্রতী ছিলাম। কলিকাতায় অধ্যয়ন কালে অবসর পাইলেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম ও বাল্যসুলভ ভক্তি সহকারে পরিধেয়াদি উপঢৌকন দিতাম। সেই

---

[৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

[৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮।

Dhaka University Institutional Repository

বাল্যস্মৃতি আমার ক্ষুদ্র বক্ষে এখনও সজীব রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগে শিক্ষক-ছাত্রের সম্বন্ধ অননুসরণীয় হইয়া পড়িয়াছে। একদা পাঠশালায় শিক্ষাকালে কেন্দ্র পরীক্ষায় উপস্থিত হই ও তৎকালীন 'গ-মিতিয়' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটি রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার পাই। উক্ত পুরস্কার ভক্তিসহকারে আমার বাল্য শিক্ষকের পদপার্শ্বে উপস্থিত করি। তিনিও স্নেহভরে আশীষ অর্পণ করেন।'[৬]

শিক্ষকের প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধাবোধ তাঁকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শিক্ষকের কাছে আপন করে তুলেছিল এবং শিক্ষকেরাও তাঁকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। কোলকাতায় তিনি এল.এম.এস.(লন্ডন মিশন সোসাইটি) ইনস্টিটিউশনের বছরের প্রায় শেষ ভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান নবম শ্রেণীতে) ভর্তি হন। এ সময়ের একটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। মাতাপিতার নির্দেশ ছিল শহরে অকারণে ঘোরাফেরা না করা। তিনি তাই একাকী স্কুলে যান এবং ছোট্ট ঘরে ফিরে পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। পূর্বোল্লিখিত যে সকল বালক তাঁকে শহরে এসে পড়াশুনা করার প্রলোভন দেখিয়েছিল তারা হঠাৎ করে একদিন তাঁর বাসায় এসে উপস্থিত। তারা বালক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু তিনি পিতার আদেশের কথা স্মরণ করে বন্ধুদের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন না। কিন্তু তারা কোন অজুহাতেই কর্ণপাত না করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কে এক প্রকার জোর করেই ঘরের বাইরে নিয়ে আসে এবং স্টার থিয়েটারের কাছে উপনীত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) শহরে থেকে পড়াশুনা করলেও সিনেমা থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁর এই অনভিজ্ঞতার সূত্র ধরে এই ছেলেরা সকলের টিকিটের পয়সা তাঁর কাছ থেকে আদায় করে এবং তাঁকে নিয়ে থিয়েটার হলে প্রবেশ করে। থিয়েটার দেখার এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ

---

[৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

'থিয়েটার দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম কিন্তু মনে কেমন এক আবেগ দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল, আবার দেখিবার ইচ্ছা মনের কোণে জাগিল। তখনই পিত্রাদেশের কথা মনে পড়িল। নামাজে বসিলাম, প্রতিজ্ঞা করিলাম-হে খোদা, যে বস্তু এইরূপ চিত্তাকর্ষক, সে বস্তুর আকর্ষণে আর যেন জীবন মধ্যে আকৃষ্ট না হই। সেই প্রতিজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া সারা জীবন থিয়েটার, যাত্রা, ফিল্ম কিছুই দেখিবার সাধ করি নাই। আমার প্রতি কেহ কেহ অনভিজ্ঞতার দোষারোপ করেন। কিন্তু আমি অনভিজ্ঞ থাকিয়াই অসীম শক্তিশালী মহাপ্রভুর শোকরিয়া প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে আদায় করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারই মনোমোহিনী স্মৃতি বুকে লইয়া যেন পৃথিবীর সর্ব্ব প্রকার আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিতে পারি, ঐ এককত্বের অতল সমুদ্রে নিজেকে নিমজ্জিত রাখিতে পারি।'[৭]

ইতোমধ্যে তিনি এল.এম.এস. ইনস্টিটিউশন এ প্রথম শ্রেণীতে (বর্তমান দশম শ্রেণীতে) উন্নীত হন। কিন্তু তাঁর বাসস্থান সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। এ সময়ে একবার তাঁর পূর্বতন বন্ধু ও সহপাঠী মোহাম্মদ ইবরাহীমের সঙ্গে হুগলী বেড়াতে যান। মোহাম্মদ ইবরাহীম হুগলীতে থাকেন। তাঁর বাসার দুরবস্থার কথা শুনে মোহাম্মদ ইবরাহীম খুবই ব্যথিত হলেন। হুগলীতে তিনি কাজী মাজেদ বখশ নামক হুগলী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক উদ্যমশীল ছাত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। মাজেদ বখশের সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতা গড়ে ওঠে। মাজেদ বখশ তাঁর বাসার দুরবস্থার কথা জেনে ব্যথিত হন এবং এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর প্রাক্তন প্রাইভেট শিক্ষক মুনশী তমিজ উদ্দীন আহমদকে বাসার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য অনুরোধপত্র পাঠান। ইতোমধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)

---

[৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

পুনরায় কোলকাতায় ফিরে আসেন। মুনশী তমিজ উদ্দীন আহমদের বাড়ি ছিল ২৪ পরগণার রামচন্দ্রপুর। তিনি অত্যন্ত উদার প্রকৃতি ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়ার পল্লীতে তার একটি বাড়ি ছিল। তিনি কাজী মাজেদ বখশের পত্র পেয়ে স্বয়ং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর লালিত্যে মুগ্ধ হয়ে অন্যত্র তাঁর থাকার ব্যবস্থা না করে ভবানীপুরে নিজের বাড়িতেই স্থান দিলেন। এখানে এক বৃদ্ধা হাজি মহিলা তাঁর খাবার রান্না করে দিতেন। এই বাড়িতে মুনশী তমিজ উদ্দীনের এক ছোট ভাইও থাকতেন। চক্রবেড়ী বাজারের উপর তার একটি দোকান ছিল। তিনি সাধারণত রাত্রি ৮টার পর বাসায় ফিরতেন। বৃদ্ধা হাজি মহিলাটি রান্নার কাজ শেষ করে সন্ধ্যার পূর্বেই বাসায় ফিরে যেতেন। সন্ধ্যার পর এই নির্জন বাড়িতে তিনি একা থাকতেন। একদিন রাতে মুনশী তমিজ উদ্দীনের ছোট ভাইটি তাঁর শয়নকক্ষের ছাদের উপর উপর্যুপরি ঢিল ছুড়ে তাঁকে ভুতের ভয় দেখায়। পরে তিনি বিষয়টি জানতে পারেন। কিন্তু এই নির্জন বাড়িতে তিনি আর থাকতে চাইলেন না। রাতে তিনি এতই ভীত হয়ে পড়েন যে প্রাতে সে অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে নতুন বাসাবাড়ির খোঁজ করতে থাকলেন। পরবর্তী আর একটি রাত আসার পূর্বেই তিনি জনৈক মুনশী আবদুল গফুরের বাড়ির একটি কক্ষ মাসিক ৪ টাকায় ভাড়া নিলেন। কিন্তু এখানেও বাসোপযোগী পরিবেশ পাননি। মুনশী আবদুল গফুর ছিলেন একটি পাদরি স্কুলের শিক্ষক। তার অনেক বন্ধু ছিল যারা মূলত অসৎ প্রকৃতির। এছাড়া তিনি নিজে ছিলেন মদ্যপায়ী। মুনশী আবদুল গফুর এবং তার বন্ধু-বান্ধবদের চালচলন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর পছন্দ না হওয়ায় এ স্থানও তিনি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি পুনরায় কাজী মাজেদ বখশের শরণাপন্ন হন এবং তাকে বর্তমান অসুবিধার কথা জানিয়ে পত্র দেন। কাজী মাজেদ বখশ এ পত্র পেয়ে ভবানীপুর আসেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে হুগলী ফিরে আসেন। হুগলীতে এসে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। টেস্ট পরীক্ষায় তিনি অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। লন্ডন মিশনারি স্কুলের হেডমাস্টার নন্দবাবু তাঁকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। তাই টেস্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষা ছাড়াই তিনি ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি লাভ করেন। হুগলীতে অল্প কিছুদিন তিনি কাজী মাজেদ বখশের বাড়িতে অবস্থান করেন। এখানে অবস্থানের বিষয়ে মাজেদ বখশের অভিভাবকের কাছ থেকে আপত্তি উঠলে তিনি হুগলী কলেজের কাছে চুঁচুড়ায় একটা বাসা ভাড়া করেন এবং ফাইনাল পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত এ বাসাতে অবস্থান করেন।

১৮৯০ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয়ার জন্য কোলকাতায় আসেন এবং এ বছর কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স (বর্তমান এস.এস.সি.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি লাভ করেন। তারপর তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন। হুগলী কলেজে পড়ার সময় তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। অসুস্থ অবস্থায় এফ.এ. (বর্তমান এইচ.এস.সি.) পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন এবং এ পরীক্ষাতেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তিও লাভ করেন। ম্যালেরিয়ার ভয়ে তিনি হুগলী ত্যাগ করেন এবং কোলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন।

শতাব্দীকাল পূর্বে এদেশের মুসলমানরা শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন অগ্রণী ছিল না। অবশ্য শিক্ষার তেমন অনুকূল সুযোগও তখন ছিল না। সে সময়ে মুসলমান উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। তাছাড়া পরীক্ষায় কঠোরতা ছিল যথেষ্ট। বি.এ. পরীক্ষায় শতকরা মাত্র ১৩/১৪ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতো, তার মধ্যে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা নামে মাত্র।[৮] উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে যারা পথিকৃৎ ছিলেন তাদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর নাম উল্লেখ করা যায়। তৎকালীন বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ১৮২৩ সালে স্থাপিত একটি কমিটির (General Committee of Public Instruction) মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এই কমিটি জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশীপ পরীক্ষা গ্রহণ করতো। এরপর কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই (বর্তমান মোম্বাই) শহরে ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ বছরই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু এন্ট্রান্স পরীক্ষা গ্রহণ করে। ১৯৫৮ সালে কোলকাতা

[৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল দশজন। এদের মধ্যে যে দু'জন মাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁরা হলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু। মুসলমানদের মধ্যে আহমদ (পরে দেলওয়ার হোসেন নামে পরিচিত) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি ১৯৬১ সালে বি.এ. পাশ করেন। এদেশের আর দু'জন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এ.কে. ফজলুল হক এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সহ যে তেরোজন মুসলমান কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন;[৯] তাঁরা হলেনঃ

আবুল কাসেম	প্রেসিডেন্সি কলেজ
এ.কে.ফজলুল হক	প্রেসিডেন্সি কলেজ
মতলুব আহমদ খান চৌধুরী	প্রেসিডেন্সি কলেজ
শেখ আহ্ছানউল্লাহ	প্রেসিডেন্সি কলেজ
নূরুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সি কলেজ
শেখ ওসমান আলী	প্রেসিডেন্সি কলেজ
সৈয়দ হোসেন আলী	প্রেসিডেন্সি কলেজ
আবদুল মালেক	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
মাসুদুল হোসেন	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
মোঃ ইচাকিন	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
আলাউদ্দিন আহমদ	ঢাকা কলেজ
সৈয়দ আলী মোহসেন	শিক্ষক
জহুরুল হক	শিক্ষক

[৯] সৈয়দ মুর্তজা আলী, শিক্ষাক্ষেত্রে দিশারী (প্রবন্ধ), বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ১৭শ বর্ষ, দ্বিতীয়, তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৭৯, পৃঃ ১০৩-১২২।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ছাত্রাবস্থায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) নামের আগে পদবি হিসাবে 'শেখ' ব্যবহার করতেন কিনা সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায় না। তবে পরবর্তীতে তাঁর বিভিন্ন লেখায় লেখকের নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ জাতীয় পদবি যুক্ত হতে কখনো দেখা যায় নি।

বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজেই এম.এ. পড়েন এবং ১৮৯৫ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন।[১০] এম.এ. পড়ার সময় একই সঙ্গে তিনি কোলকাতার রিপন কলেজে আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন কিন্তু বি.এল. পরীক্ষা দেওয়ার অবকাশ পাননি।

এভাবে নিদারুণ কষ্ট, শারীরিক অসুস্থতা ও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ছাত্রজীবনের কঠিনতম দিনগুলো অতিবাহিত করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান জাতির অনগ্রসরতা এবং মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা তাঁকে বিচলিত করে। শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করার সময় তিনি মুসলমান ছাত্রদের উপরোক্ত সমস্যা সমাধানে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। সে সময়ে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন এ.ডব্লিউ. ক্রফট। তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং শিক্ষা বিভাগের যে কোন একটি চাকরি প্রার্থনা করেন। মিঃ ক্রফট তাঁকে অল্প কিছুদিনের জন্য রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সুপারনিউমারি টিচার নিযুক্ত করেন। কিন্তু এ সময় তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হন। কোন ঔষধেই সে জ্বরের উপশম হচ্ছিল না। জ্বর নিয়ে তিনি রাজশাহী উপস্থিত হন। কিন্তু কোনভাবেই তিনি নতুন চাকরিতে যোগদান করতে পারছিলেন না। হেডমাস্টার বিরক্ত হয়ে প্রিন্সিপ্যাল লিভিংস্টোনকে তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে নিয়োগ দেয়ার অনুরোধ করেন। প্রিন্সিপাল বিশেষ বিবেচনায় আরো এক সপ্তাহ পদটি খালি রাখতে সম্মত হলেন। খানবাহাদুর

[১০] খানবাহাদুর আহছানউল্লা, আমার জীবনধারা, আহছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ঢাকা। ৮ম সংস্করণ, ২০০৩;পৃষ্ঠা-১১।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্ছানউল্লা (রঃ) নিরূপায় হয়ে জনৈক কবিরাজের শরণাপন্ন হন। কবিরাজ তাঁকে সাপেরবিষ খেতে দিল। বিষের প্রভাবে জ্বর ছেড়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে তিনি স্কুলের কাজে যোগদান করেন। তবে এখানে তাঁকে বেশি দিন থাকতে হয়নি। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে তিনি উচ্চতর বেতনে ফরিদপুরের অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে চাকরির নিয়োগপত্র পান। এ সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ

> 'এক দিকে আমার স্বদেশী হেডমাষ্টার আমাকে অসহায় অবস্থায় রাজশাহী হইতে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর, অপরদিকে একজন বিদেশী প্রিন্সিপ্যালের সহানুভূতি। অবশেষে দয়াময়ের শক্তি প্রয়োগ। জ্বরাক্রান্ত দেহে ৫০টী টাকায় অস্থায়ী চাকুরীর জন্য লোলুপ। আর একায়েক স্থায়ীভাবে ১২৫ টাকার পদে বহাল।'[১১]

এভাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর কর্মজীবন শুরু হয়। ভবিষ্যতে যাঁর জীবন ও জীবন কাহিনী অসংখ্য মানুষের আদর্শ ও শিক্ষার নজির হয়ে থাকবে, তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকের মত আদর্শ পেশায়। রাজশাহীতে যে কয়েকমাস শিক্ষকতা করার সুযোগ পান সে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্ররা তাঁর বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময়ে তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর (বর্তমান নবম, অষ্টম ও সপ্তম শ্রেণীর) ক্লাস নিতেন। কিন্তু শিক্ষক হিসাবে তিনি এমনই সুনাম অর্জন করেন যে অনেক সময় প্রথম শ্রেণীর (বর্তমান দশম শ্রেণী) ছাত্ররাও তাঁর পাঠ শোনার জন্য চলে আসতো। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা তাঁর বাসায় নিয়মিত যাতায়াত করতো। তিনি যখন পরবর্তী চাকরিতে যোগদান করার জন্য রাজশাহী থেকে বিদায় নেন তখন ছাত্ররা ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ একটি ফুটবল খেলার আয়োজন করে। এছাড়া সন্ধ্যায়

---

[১১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা,আমার জীবনধারা, আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ঢাকা। ৮ম সংস্করণ, ২০০৩;পৃষ্ঠা-১২।

Dhaka University Institutional Repository

পাবলিক লাইব্রেরীতে প্রিন্সিপাল লিভিংস্টোনের নেতৃত্বে একটি সভাও আয়োজিত হয়। চাকরি জীবনের শুরুতে তিনি ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা এভাবে অর্জন করেন। সকল সৎগুণের অধিকারী একজন খাঁটি ও পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন তিনি, আর সে জন্য তাঁর সহকর্মী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সবাই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।

১৮৯৬ সালের অক্টোবর মাসে অতিরিক্ত ডেপুটি-ইন্সপেক্টরের নতুন পদে যোগদানের জন্য তিনি ফরিদপুর আসেন। এই পদে কাজ করার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য ছয়মাস তিনি স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর পদে কাজ করেন। এখানে তাঁকে বহু স্কুল পরিদর্শন করতে হতো। সে সময় এদেশের রাস্তাঘাট আজকের মত এমন উন্নত ছিল না। প্রয়োজনীয় যানবাহনের অভাব ছিল। কিন্তু পথের কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি কখনো কর্তব্যকর্মে অবহেলা করেননি। অনেক সময় রমজান মাসে রোজা রেখে পায়ে হেঁটেই দৈনিক বিশ মাইল পর্যন্ত ভ্রমন করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি কোন স্কুল কর্তৃপক্ষের আতিথ্য গ্রহণ করতেন না। সঙ্গে পিয়ন[১২] থাকতো এবং পিয়নের মাথায় বিছানাপত্র, চাল, ডাল ইত্যাদি থাকতো। সন্ধ্যা হলে কোন জায়গায় রাত কাটাতেন। এ সময়ের অনেক স্মৃতি তিনি তাঁর জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সে সময় হিন্দু সম্প্রাদায়ের মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং তার ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব নষ্ট হতো। অজ্ঞতা এবং তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ এর জন্য অনেকখানি দায়ী। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) একবার ফরিদপুরের কোঁড়কদীর কুলীন গ্রামে একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। স্কুলের 'সম্পাদক' তাঁকে সেদিন তাঁর বাড়িতে থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ

---

[১২] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, আমার জীবন ধারা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮২, পৃঃ ১৭।

এই পিয়নের নাম ছিল 'আলী'। হুগলীর অকৃত্রিম বন্ধু কাজী মাজেদ বকস্ এই পিয়নকে পাঠিয়েছিলেন। সূত্রঃ গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১ এর ফুটনোট।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি স্কুল পরিদর্শন করে সন্ধ্যার পূর্বে স্কুলের সম্পাদক মহোদয়ের বাইরের ঘরে এসে উঠলেন। সঙ্গে 'ইন্সপেকটিং পন্ডিত' মিঞা ফখর উদ্দিন ছিলেন। এসময় ছিল রমজান মাস। ইফতার করার জন্য চামড়ার সুটকেস থেকে পাউরুটি বার করলেন। আর যায় কোথায়, একদিকে গরুর চামড়ার তৈরী সুটকেস অন্যদিকে পাউরুটি। এদু'টি জিনিস সেকালে হিন্দুদের বিশেষ অপছন্দনীয় ছিল। তখন অধিকাংশ হিন্দুর ধারণা ছিল যে, গরুর চামড়া ও পাউরুটি ব্যবহার তাদের জাত ধর্ম নষ্ট করে। আজকের দিনেও এরকম ধারণা অনেকের আছে। যাহোক আশেপাশে সবার কাছে এটি একটি ঘোরতর অপরাধ হিসাবে গণ্য হয় এবং এর ফলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ভাগ্যে জোটে কটুবাক্য ও অবমাননাকর গালিগালাজ। আত্মসম্মানের ভয়ে তিনি তখনই সেখান থেকে চলে যান এবং একটি পুকুরের ঘাটে বসে ইফতার গ্রহণ করেন ও মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। এরপর পুনরায় হাঁটতে শুরু করেন। ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে মধ্যরাতের পরে তিনি পিয়ন সহ একটি পাঠশালায় এসে উপস্থিত হন। এখানে রাতের খাবার রান্না করে ক্ষুধা নিবারণ করেন ও পাঠশালাতেই রাত কাটান।

১৮৯৮ সালের ১এপ্রিল তিনি অস্থায়ী সাব-ইন্সপেক্টরের পদ ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে ডেপুটি-ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফরিদপুরে স্থায়ী পদে নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি সর্বপ্রথম এখানে সস্ত্রীক বসবাস করতে শুরু করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। ছাত্রাবস্থায় মরণোন্মুখ বৃদ্ধা দাদীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এক কিশোরীকে বিয়ে করেন। সমগ্র ছাত্রজীবনে কিংবা চাকরি জীবনের শুরু থেকে তিন বছর পার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সত্যিকার অর্থে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেননি। ব্যক্তিগত জীবনের এহেন সংযম খুবই দুর্লভ। দাম্পত্য জীবন শুরু করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বলেছেনঃ

> 'ইতঃপূর্ব্বে যখন ফরিদপুরে স্থায়ী পদে নিযুক্ত হই, তখন তথায় সস্ত্রীক থাকিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। এ যাবৎ সহধর্ম্মিণীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না। এই পরিচয়ের সহায়তার জন্য বৃদ্ধা পিতামহী সঙ্গে আসিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমার বিবাহ জীবন ফরিদপুর হইতে আরম্ভ। তখন শিশু বালিকা যৌবনের প্রাক্কালে আসীনা। লজ্জা ও ভয় নারী চরিত্রের একমাত্র ভূষণ। উহাই বহুদিন দাম্পত্য প্রণয়ের অন্তরায় হইয়াছিল। তখন ধীরে ধীরে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করিবার অবসর হইল। আমার বাল্যকালের প্রার্থনা খোদা তায়ালা বোধহয় শুনিয়াছিলেন, তাই এ যাবৎকাল দয়াপরবশ হইয়া তিনি আমাকে সাংসারিক জীবন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন।'[১৩]

১৮৯৮ সালে সে সময়ের তুলনামূলক বড় জেলা বাখরগঞ্জের ডেপুটি-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ পান। এ পদে তাঁর নিয়োগকর্তা ছিলেন ডিরেক্টর মার্টিন। বরিশাল তাঁর দপ্তর ছিল। এখানে অবস্থানকালে তিনি বিটসন বেল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ দত্ত, এ.কে. ফজলুল হকের পিতা কাজী ওয়াজেদ আলী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করেন। বরিশালে অবস্থানকালে তাঁর বড়ছেলে মোহাম্মদ শাসছুজ্জোহার জন্ম হয়। মোহম্মদ শাসছুজ্জোহা লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন এবং দেশে ফিরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি ঢাকার এডমিনিসট্রেটর জেনারেল (বর্তমান এটর্নি জেনারেল) পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছা বাঙালী মহিলা সমাজে বিশেষ সম্মান ও গৌরবের অধিকারিণী ছিলেন। মোহাম্মদ শামছুজ্জোহা ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা উভয়েই একই সময়ে লন্ডনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন। বেগম ফজিলাতুন্নেছাকে সরকারি বৃত্তি দিয়ে বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর বিশেষ অবদান ছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ

'আমি ডিরেক্টর অফিসে থাকিতে প্রস্তাব হইয়াছিল একটি উপযুক্ত মোছলেম মহিলাকে বৃত্তি দিয়া বিলাতে ট্রেনিং-এর জন্য পাঠাইতে এবং ট্রেনিং অন্তে

---

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

ইন্সপেক্টরস বা তত্তুল্য কোন পদে নিয়োগ করিতে। ভবিষ্যৎ মোছলেম মহিলাদিগের উচ্চ শিক্ষার উন্নতিকল্পে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। আমার সৌভাগ্য যে, বিলাতে পাঠাইবার সময় আমি আমার ভবিষ্যৎ পুত্রবধূকে সাহায্য করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তিনি অবশেষে আমারই পুত্রবধূ হইবেন। ঐ সময়ে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন জলপাইগুড়ির নওয়াব মুশার্রফ হোসেন।'[১৪]

বেগম ফজিলাতুন্নেছা কোলকাতার বেথুন কলেজের অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপিকা ছিলেন এবং পরবর্তীতে ঐ একই কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল পদে উন্নীত হন। ইতঃপূর্বে কোন মুসলমান মহিলা এই পদে চাকরি করার সুযোগ পাননি। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। মোহাম্মদ শামছুজ্জোহা এবং বেগম ফজিলাতুন্নেছা এঁদের দু'জনের কেউ-ই আজ জীবিত নেই। বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্পর্কে এক স্মৃতিচারণে যোবায়দা মির্যা বলেছেনঃ

'.....আমার আগে যারা ছিলেন তাদের কথা ঝাপসা হয়ে মুছে গেছে মন থেকে। তবু লীলা নাগ এবং ফজিলাতুন্নেছা কিংবদন্তির মত বংশ পরম্পরায় চলবেন নিঃসন্দেহে। লীলা নাগ নারী শিক্ষা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রীই শুধু নন, স্বদেশী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। সে সময় গান্ধীজীর চরকা-কাটার যুগ। ঘরে ঘরে, বিশেষ করে স্কুল-কলেজে, সব মেয়ের হাতে থাকতো ছোট্ট একটা পাথরের অথবা পেতলের বাটি, সুতো কাটার জন্যে একটা তকনী আর গোছা গোছা পেঁজা তুলো। রীতিমত প্রতিযোগিতা কে কত মিহি এবং তাড়াতাড়ি সুতো কাটতে পারে। সেই সুতো তাঁতে বুনে কাপড় তৈরী হতো।

---

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

হোক না সে মোটা কাপড়। তবু তো নিজের হাতের জিনিস। বিদেশী কলের কাপড় বর্জন করে লীলা নাগ নিজেও খদ্দর ছাড়া পরতেন না। কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উৎসবে-পালা-পর্বণে পরতেন লাল পেড়ে গরদ, এন্ডি কিংবা মুগার শাড়ী। চরকার হুজুক ক্রমশঃ কমে এলে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যোগ দিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকে। প্রায় সমসাময়িক ফজিলাতুন্নেছাও ছিলেন এদের মধ্যে আদর্শ সাজ-পোশাক, চাল-চলন, কথা-বার্তা। ১৯৪৭ সালে আমি এদের দুজনকেই দেখেছি। লীলা নাগ অনিল রায়ের সাথে বিয়ে হয়ে ঘোরতর রাজনীতিবিদ হয়ে গেলেন। আর ফজিলাতুন্নেছার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটলো-তিনি তখন মিসেস শামসুজ্জোহা, পাকিস্তানের এটর্নি জেনারেলের স্ত্রী.....।

লীলা নাগ অবস্থাপন্ন, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। অতএব তার আর কীই বা এমন বিশেষ কৃতিত্ব। তিনি তো সবরকম সুযোগ-সুবিধা পেয়ে তরতর করে ওপরে উঠেছেন বিনা কষ্টে। কৃতিত্ব হচ্ছে ফজিলাতুন্নেছার। টাঙ্গাইলের এক অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তাও মুসলমান। তার বাবা ওয়াজেদ আলী পন্নী জমিদারী সেরেস্তার সামান্য কর্মচারী। মেয়েটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসামান্য মেধা, শেখার অদম্য আগ্রহ, জমিদারের দৃষ্টি এড়ালো না। তারই উৎসাহে সে গ্রামের স্কুল থেকে ছেলেমেয়ে সকলের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে ম্যাট্রিক পাশ করলো। ইডেন কলেজ থেকে আই.এ. (তখন কলেজে মেয়েদের আই.এস.সি. পড়ার ব্যবস্থা ছিল না।) পাস করে বেথুন কলেজ থেকে ডিসটিংকশন পেয়ে বি.এ. পাস করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করলো। শুধু মুসলমানদের মধ্যেই নয়, হিন্দু-মুসলমান ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে অঙ্কের মত এত কঠিন বিষয়ে ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট হওয়া এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে কখনো সেকেন্ড হননি। .....এই অসাধারণ প্রতিভাময়ী মহিলাকে তার সময়ের একজন বিস্ময় বা প্রডীজি (Prodigy) বলা যেতে পারে।

পর্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে তাকে চলতে হয়েছে, সহায়সম্বলহীন। সহানুভূতিশীল কেউ যদি তাকে উৎসাহ দিয়ে তার কিছুমাত্র কষ্ট লাঘব করে থাকে সেইটাতো স্বাভাবিক। 'সওগাতের' সম্পাদক নাসির উদ্দিন সাহেবের প্রচেষ্টায় বহু কষ্টে বৃত্তি নিয়ে বিলেতে পড়তে যান..... ।

সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। একজন মধ্যস্থ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। একটা ওয়াসিলা তো লাগেই। যতই মেধাবী হোক, অজানা অচেনা এক মেয়েকে নাসির উদ্দীন সাহেব তৎকালীন ডি.পি.আই. আহ্ছানউল্লা সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যারপরনাই মহত্ব এবং সময়োপযোগী কাজ করেছিলেন। বিদেশ যাবার জন্যে প্রয়োজনমত এই সহায়তার জন্যে মিসেস জোহাকে বার বার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে শুনেছি। ..... মিস ফজিলাতুন্নেছা বেগম যখন বিলেতের পথে রওনা হন তখন কোলকাতা শহরের স্কুল কলেজের ছেলেরা মিছিল করে কত ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে তাঁর সাথে সাথে গিয়াছিল আউট্রাম ঘাট পর্যন্ত তাকে জাহাজে তুলে দেবার জন্য। এমন ঘটনা কোলকাতার ইতিহাসে এই একটিই ঘটেছিল। এখনতো সব বিলেত যায় প্লেনে চড়ে ফুড়ৎ করে উড়ে, কেউ টের পায়, কেউ টের পায় না।

নারীর শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে মিসেস ফজিলাতুন্নেছা জোহার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। দেশ বিভাগের সময় তিনি বেথুন কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। অপশন দিয়ে এসে দেখেন পাকিস্তানে সমপর্যায়ের কোন কলেজই নাই। অগত্যা তিনিই ইডেন ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপালের পোস্টে

Dhaka University Institutional Repository

যোগদান করলেন। অথচ বেথুন শুধু ডিগ্রী কলেজই ছিল না, বেশ অনেকগুলো বিষয়ে অনার্সও ছিল। অতএব, তিনি সারাক্ষণ লেগে থাকলেন ইডেনকে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করার জন্যে। দু'বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত সফল হলেন।

বিশের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক মেয়েকে নিয়ে নাজিমুদ্দিন রোডের আশেপাশের এলাকা জুড়ে বস্তিগুলোতে ঘুরে ঘুরে লেখাপড়া শেখানো, ওষুধ, কাপড়, খাবার বিলানো, মহামারীর সময় কলেরার ইনজেকশন, বসন্তের টীকা দেওয়া, সব করে বেড়িয়েছেন। তাঁর গুণগ্রাহীর অন্ত নেই। বহু ব্যক্তিগত আবেদন-নিবেদন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। তাঁর অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারেনি।'[১৫]

ডেপুটি-ইন্সপেক্টর পদে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর চাকরিকাল সাত বছর অতিবাহিত হয়। এ সময়ে ডিরেক্টর মার্টিন Subordinate Educational Service থেকে Provincial Educational Service এর জন্য বার জনের নাম মনোনীত করে বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর নাম এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল। ডিরেক্টর মার্টিন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কেই মনোনীত করেন। এর ফলে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্সপেকটিং লাইন থেকে টিচিং লাইন-এর প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে নীত হন এবং ১৯০৪ সালে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার পদে নিযুক্ত হন। এখানে অবস্থানকালে তিনি মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেন এবং দীর্ঘদিনের অন্তরায়গুলো দূর করতে সচেষ্ট হন। সে সময় রাজশাহীতে নাটোর মহারাজার পক্ষ থেকে একটি হিন্দু ছাত্রাবাস তৈরী করা হয়; কিন্তু মুসলমান ছাত্রের জন্য কোন ছাত্রাবাস ছিল না। তিনি মুসলমান

---

[১৫] যোবায়দা মির্যা, কাকতালীয় যোগাযোগ, দৈনিক ইত্তেফাক, মঙ্গলবার, ২৫ চৈত্র ১৩৯২, ৮ এপ্রিল ১৯৮৬ সংখ্যা।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময়কার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ

> '..... আমি রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষার প্রস্তাব করি। কত দিবা কত রাত্রি বৃক্ষতলে একাকী যাপন করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, সহৃদয় ব্যক্তিগণ আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে প্রায় সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হইল।'[১৬]

সরকারি অনুদান ছাড়া শুধুমাত্র সাহায্যের অর্থে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের এমন দুঃসাহসী ও আন্তরিক প্রচেষ্টা আজকের দিনেও বিরল। ইতোমধ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন ছোট লাট স্যার বামফিল্ড ফুলার (Sir Bamfylde Fuller) রাজশাহী পরিদর্শনে আসেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এ সুযোগে ছোট লাট বাহাদুরকে অভ্যর্থনা দিয়ে মুসলমান ছাত্রদের হোস্টেলের অসুবিধার কথা নিবেদন করার ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্য বিভিন্ন হীন প্রচেষ্টা অবলম্বন করে। ছোট লাট বাহাদুরের অভ্যর্থনার জন্য যে তোরণ তৈরী করা হয় তা রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে দেয়। রাজশাহীর অধিকাংশ ছাপাখানার মালিক অভিনন্দন পত্র ছাপাতে রাজি হয়নি। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এসবের মধ্যেও ভেঙে পড়েননি। তিনি গোপনে কোলকাতায় লোক পাঠিয়ে অভিনন্দন পত্র ছাপিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন। স্থানীয় কলেজ পরিদর্শন করে ছোট লাট বাহাদুর কলেজিয়েট স্কুলে এলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) মুসলিম হোস্টেলের অভাবের কথা নিবেদন করেন। প্রিন্সিপাল এ প্রস্তাবে আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন, রাজশাহীতে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়, অতএব প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ইটের তৈরী হোস্টেল নির্মাণ করলে তা ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। শুধু টাকার অপচয় হবে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) অত্যন্ত ধীর এবং শান্তভাবে এর জবাবে বলেন, রাজশাহী

---

[১৬] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, আমার জীবন ধারা, প্রাগুক্ত, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮২, পৃঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

কলেজটি যদি ইটের তৈরী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবৎ ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে তাহলে মুসলিম হোস্টেলও রক্ষা পাবে এবং তিনি কলেজের মত একটি হোস্টেল পেলেই খুশি। এর চেয়ে বড় বাড়ি তিনি চান না। ছোট লাট বাহাদুর একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ ইংরেজ অফিসার ছিলেন এবং সহজেই সবকিছু অবগত হলেন। সন্ধ্যায় তিনি তাঁর লঞ্চে (launch) একটি সভা ডাকলেন এবং সেখানেই মুসলিম হোস্টেল তৈরী করার জন্য একটি নক্শা এবং পঁচাত্তর হাজার টাকা অনুমোদন করেন। দু'তলা বিরাট হোস্টেল তৈরী হল মুসলমান ছাত্রদের জন্য। ছোট লাট বাহাদুরের স্মৃতি রক্ষার্থে এবং তাঁর নাম অনুসারে এ হোস্টেলের নামকরণ করা হয় 'ফুলার হোস্টেল'। রাজশাহীর এই ফুলার হোস্টেলের নাম আজ হয়তো কারো অজানা নেই, কিন্তু এই হোস্টেল নির্মাণের পিছনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর অবদানের কথা আমরা প্রায় ভুলে গেছি।

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে ইতঃপূর্বে কোন মুসলমান হেডমাস্টার নিযুক্ত হননি। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) প্রথম মুসলমান হেডমাস্টার। এখানে তাঁকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা এবং ন্যায়নীতির প্রতি অবিচল আস্থা দেখে হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে বিশেষ ভক্তি করতো, ভয়ও পেত। অন্যায়কে সব সময় তিনি কঠোর হস্তে দমন করেছেন। একবার একটি ছেলে টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেয়। ছেলেটি স্থানীয় হিন্দু উকিল পরিবারের। এ পরিবারটি বিশেষ প্রভাবশালী। সবাই তাদের ভয় করতো, সম্মান করতো এবং ছেলেটি এ কারণে অত্যধিক উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বুদ্ধি ও সাহসিকতার সাথে ঘটনাটির মোকাবেলা করেন। প্রথমে তিনি সকল শিক্ষকদের নিয়ে একটি সভা করে বিষয়টি আলোচনা করেন এবং পরে ক্লাশে জানিয়ে দিলেন যে, অপরাধী ছেলেটিকে শাস্তি দেয়া হবে, সবাই যেন শাস্তি দেখতে উপস্থিত থাকে। নির্দিষ্ট দিনে সকল ছাত্র শিক্ষক এক জায়গায় সমবেত হলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) অপরাধী ছাত্রটিকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

'দেখ ভাদুড়ী, তুমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। ভালরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তুমি টেস্ট পরীক্ষার মুদ্রিত প্রশ্ন অফিস হইতে বাহির করিয়া বন্ধুবান্ধবদের বিলি করিয়াছ, যাহার ফলে অধিকতর অর্থব্যয়ে পুনরায় প্রশ্ন ছাপাইতে হইয়াছে এবং সবাইকে অযথা দুর্ভোগের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। সমবেত শিক্ষকদের অভিমত যে, তোমাকে এ জন্য ২৫টি বেত্রাঘাত সর্বসমক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা তোমাকে স্কুল হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে এবং তোমাকে কুত্রাপি পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। আমি হঠাৎ ক্রোধপরবশ হইয়া এই শাস্তি দিতেছি না, পূর্ণ এক সপ্তাহ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া আমার সহকর্মীদের সহিত একমত হইয়া স্কুলের ভবিষ্যৎ শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই শাস্তি দিতে বাধ্য হইয়াছি। এখন তোমার শাস্তি গ্রহণের ইচ্ছা থাকে তবে হাত বাড়াও।'[১৭]

ছেলেটি লজ্জায় সমস্ত মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে শাস্তি গ্রহণ করে। এই শাস্তির ফলে ভবিষ্যতে আর কোন ছাত্র তাঁর স্কুলে এরূপ অপরাধ করতে সাহসী হয়নি।

সে সময়ে রাজশাহীতে মুসলমানদের মধ্যে একতার বড় অভাব ছিল। দলগত বিদ্বেষ ও মতানৈক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরাজমান ছিল। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) মুসলমান সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, পল্লীতে পল্লীতে সভা করে মুসলমানদের মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। রাজশাহীতে মুসলমান ছাত্রদের মাদ্রাসার বড় অভাব ছিল। কলেজের কয়েকটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে মাদ্রাসার ক্লাশ হতো। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) মিশনারিদের বিস্তৃত এলাকা হুকুম দখল করে তা মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ করেন। এর ফলে মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রশস্ত পাকা গৃহ,

---

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তৃত খেলার মাঠ ও উপযুক্ত ছাত্রাবাস লাভ করে। রাজশাহীতে সে সময়ে কোন মুসলমান ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে পারতো না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর প্রচেষ্টায় মোহাম্মদ এমাদউদ্দীন আহমদ সর্বপ্রথম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এর ফলে তাঁর উপর হিন্দু সমাজের ব্যক্তিবিশেষের বিদ্বেষ ভাব দৃষ্ট হল। কিন্তু কালক্রমে উক্ত ভাব তিরোহিত হয়।[১৮]

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড় ও আন্তরিক। ১৯৩৬ সালে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কে এ সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি এ সময়ে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কাজে ও সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি এ স্মরণ সভায় যোগদান করতে পারেননি। কিন্তু আমন্ত্রণের জবাবে তিনি উদ্যোক্তাদের কাছে যে মূল্যবান পত্রটি লেখেন তা সম্প্রতি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রাচীন কাগজ পত্রের মধ্য থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই পত্রে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের কথা উল্লিখিত হয়েছে। পত্রটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হলোঃ

> 'In days passed in the midst of the boys at Rajshahi were the happiest in my life. I was thus comparatively young and associated myself very cheerfully in every phase of their activity. I forgot at time that I was a teacher and that they were taught. The interest of the boys were always dear to me and it was always my anxiety to advance their interests and make them happy both in and outside the School.'[19]

---

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

[১৯] মুহম্মদ আবু তালিব, সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (প্রবন্ধ),সূত্রঃ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থঃ সম্পাদনা গোলাম মঈন উদ্দীন,আ.মি.পা.ট্রাস্ট,ঢাকা, জুলাই ২০০২, পৃঃ ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর এইচ. শার্প সে সময়ে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর কাজে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তাঁর কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি হিসাবে তিনি ১৯০৭ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের ডিভিশন্যাল ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হন। দীর্ঘ সতেরো বছর তিনি চট্টগ্রাম অবস্থান করে এই বিভাগের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালান। সে সময়ে চট্টগ্রামের মুসলমানগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন অগ্রণী ছিলেন না, শিক্ষার উপযোগী সুযোগ সুবিধারও অভাব ছিল। মাদ্রাসাই একমাত্র উচ্চশিক্ষার স্থান ছিল। হিন্দু বসতি স্থানে যে সকল উচ্চ বিদ্যালয় ছিলো সেখানেই মুসলমান ছাত্ররা সাধারণত পড়াশুনা করতো। মুসলমানদের জন্য কোন মধ্য উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন স্থানে মুসলমান কর্তৃত্বাধীন মধ্য ও উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ডিরেক্টর এইচ. শার্পের সুপারিশক্রমে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার এ অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করেন। এইচ. শার্প বরাবরই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর কর্মদক্ষতা, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। এর ফলে চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষার উন্নতিকল্পে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর প্রার্থিত অর্থ প্রদানে তিনি কখনোই কার্পণ্য বা দ্বিধাবোধ করেন নি। যথাযথ অর্থ প্রাপ্তির ফলে সাবডিভিশনাল স্কুলগুলোর অবয়ব ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফেনী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর হাইস্কুল গুলোর প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকার পিছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। চট্টগ্রাম শহরের কাছে শাওড়াতলী স্থানের বিরাট স্কুলটি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) অন্যমত একটি কীর্তি। এখানে তিনি জমি খরিদ করে সরকারি অর্থে এই বিরাট স্কুলটি নির্মাণ করার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগের বহু স্থানে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু জমিদার বাড়িতে তিনি অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘকাল চট্টগ্রামে অবস্থান করার

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এবং এই বিভাগের শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ও অবদান লক্ষ্য করে অনেকে তাঁকে চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে মনে করতেন। তাঁর মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তিনি স্থান কাল পাত্র ভেদে সর্বত্র সমভাবে শিক্ষার উন্নতির জন্য কাজ করেছেন।

খানবাহাদুর খেতাব লাভঃ

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন অসহযোগ হতে সরকারী স্কুলকে মুক্ত রাখার কৃতিত্বের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ১৯১১ সালে তাকে খানবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন।[২০] একই বছর তিনি লন্ডনের রয়েল সোসাইটির মেম্বার (MRSA) নির্বাচিত হন।

১৯১২ সালে দিল্লী দরবার সংঘটিত হয়। এই দরবারে সম্রাট পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের সম্মেলন ঘোষণা করেন। এর ফলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কয়েক বছরের জন্য প্রেসিডেন্সি বিভাগের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত হন এবং চট্টগ্রাম থেকে কোলকাতায় চলে আসেন। এ সময়ে ইন্সপেক্টর ছিলেন ডঃ ডান। এই পদে যোগদানের অব্যবহিত পরে তিনি তিন মাস ছুটি নিয়ে তাঁর পীর গফুরশাহ (রঃ) এর সঙ্গে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। হজ্জ করা আজকের দিনে অনেক সহজ হয়ে এসেছে। কিন্তু খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) যে সময় হজ্জ করেন সে সময়ে হজ্জ করা খুবই কষ্টকর ছিল। জীবনের আশা ত্যাগ করেই মানুষ হজ্জ করতে যেত। কারণ হজ্জের সমস্ত পথই ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। আমাদের দেশ থেকে তখন জাহাজযোগেই সবাই হজ্জ করতে যেত। মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের মধ্যে যাতায়াতের জন্য উটই ছিল একমাত্র বাহন। মরুভূমির গরম বালির উপর দিয়ে উট চলতো। বিভিন্ন মঞ্জিলে উট থামতো আর সেখানেই রান্না ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হত। একমাত্র মঞ্জিলেই খাওয়ার পানি পাওয়া যেত। উটই এ পানির সন্ধান দিত। শত্রুর ভয়ে পথের মধ্যে থামতে পারতো না। কাফেলার সঙ্গে একত্রে চলতে হত। পবিত্র হজ্জে খানবাহাদুর

---

[২০] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারকগ্রন্থ, আ.মি.পা.ট্রাস্ট, ঢাকা-২০০০, পৃঃ ৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্ছানউল্লা (রঃ) অনেকবার অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। কখনো শত্রুর কবলে পড়েছেন, কখনো পিপাসায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন, কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালার কৃপায় তিনি শেষ পর্যন্ত হজ্জ সমাপন করে দেশে ফিরে আসেন।

চট্টগ্রাম বিভাগে চাকরিরত অবস্থাতেই তিনি 'ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস' (আই.ই.এস.) ভুক্ত হন। তৎকালীন সরকারি চাকরিতে আই.ই.এস. বিশেষ সম্মানীয় পদমর্যাদার পরিচয় বহন করতো। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তিনিই প্রথম আই.ই.এস-এর অন্তর্ভুক্ত হন। এরপর বঙ্গ দেশের মোছলেম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর হিসাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) পদোন্নতি লাভ করেন। এই পদে ইতঃপূর্বে ইংরেজ অফিসার মিস্টার টেলার কর্মরত ছিলেন। সহকারী ডিরেক্টর হিসাবে তিনি ৫ বছর কর্মরত থাকেন। এ সময়ে তাঁর মাসিক বেতন (মূল বেতন ও অন্যান্য ভাতাসহ) ছিল ১৮৫০.০০ টাকা। আজ থেকে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল পূর্বে যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ছিল অত্যন্ত কম তখন এত বেশি টাকা বেতন পেয়েও এবং ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে কাজ করেও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বিলাসী জীবন যাপন করেননি। বরং চেহারায়, পোশাকে এবং আচার ব্যবহারে তিনি ছিলেন একজন সংযমী মানুষ। এ সম্পর্কে শ্রী অঞ্জলী বসু বলেন ঃ

> 'অবিভক্ত বাংলায় ইতঃপূর্বে কোন ভারতবাসী সহকারী ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হননি এবং তিনি অবসর গ্রহণ করলে দ্বিতীয় কোন ভারতবাসী উক্ত পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় পুনরায় ইংরেজ অফিসার মিস্টার বটমলিকে নিয়োগ করা হয়। সে সময়ে শিক্ষা বিভাগে ডিরেক্টরকে সাহায্য করার জন্য দু'জন সহকারী ডিরেক্টর থাকতেন। কিন্তু উভয়ের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম সমান ছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হলে সহকারী ডিরেক্টরের পদ কলিকাতায়

Dhaka University Institutional Repository

স্থানান্তরিত হয়; খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কলিকাতায় চলে আসেন। তিনি কিছুদিন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর পদে কর্মরত থাকেন।'[২১]

কোলকাতায় অবস্থানকালে (১৯২৪-২৯) তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেম্বর (Senator) মনোনীত হন এবং পরে সিন্ডিকেটের (Syndicate) সদস্য নির্বাচিত হন। ইতঃপূর্বে কোন মুসলমান এই সম্মান লাভ করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সিন্ডিকেটের হাতে, তাই এই পদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সদস্য পদে নির্বাচিত হন। তিনি একজন সৎ, ধার্মিক, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসার ছিলেন। শিক্ষা বিভাগের নানা প্রকার উন্নতি সাধন এবং চাকরি জীবনের সৎ ও সদিচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলির জন্য তৎকালীন সরকার তাঁকে খানবাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি ১৯২৯ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর কর্মজীবনের প্রায় পুরো সময়টাতে দেশে এক ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অস্থিরতা বিরাজ করে। আমরা ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ১৮৭০ থেকে বাঙালি মুসলমানের জীবন বিকাশের যে সংঘাতমুখর পটভূমি সেখানে এদেশের কয়েকজন মুসলিম মনীষী তৎকালীন মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির জন্য কাজ করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, জেহাদি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন যেমন- মুন্সী মেহেরুল্লা জন্ম ১৮৬১, মুন্সী জমিরুদ্দিনের জন্ম ১৮৭১। এঁরা যুক্ত ছিলেন গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে। ধর্ম সংস্কার এবং এর মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ছিল এঁদের মৌলনীতি। ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (জন্ম ১৮৭৫), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (জন্ম ১৮৮০), মাওলানা আকরাম খাঁ (জন্ম ১৮৮৩)। পাশাপাশি আরো লক্ষণীয় যে, ১৮৭৭

---

[২১] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৯০, ১ম সংস্করণ, ৩য় খন্ড, পৃঃ ভূমিকা ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

সালে রুশ-তুর্কি যুদ্ধ ও ১৮৮৩ সালে বিপ্লবী জননেতা জামালুদ্দীন আফগানীর একইসলামবাদ (Pan-Islamism) প্রচারকে কেন্দ্র করে মুসলিম জাগরণের প্রচেষ্টা। রুশ-তুর্কি যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার হয়েছিল তার কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায় অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'মোহাম্মদীয়া আকবরী' পত্রিকায়। মুসলমানরা যখন নানাভাবে দুর্দশা ও হতাশাগ্রস্থ এবং এদের মঙ্গলের জন্য যখন উপরোক্ত মনীষীগণ নানামুখি সংগ্রাম ও সংস্কার প্রচেষ্টায় মুখর, এমনি এক পরিমন্ডলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর জন্ম। তাঁর কৈশোর কেটেছে এ জাতীয় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে, যৌবনের কিয়দংশ অতিবাহিত হয়েছে নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে। সে সময়কার অধিকাংশ আন্দোলন ছিল সরকার কেন্দ্রিক, সাধারণ মুসলিম জনকেন্দ্রিক নয়; তাই সে সময়ের অনেক আন্দোলন তৎকালীন বিত্তবান শরীফ মুসলমানদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেও ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেনি। এর প্রভাব যতটা রাজনীতিতে ততটা তৎকালীন অবহেলিত ও দুঃস্থ মুসলমানদের হৃদয়ে নয়। মুন্সী মেহেরুল্লা, জমিরুদ্দীন প্রমুখ মনীষীগণ মাতৃভাষার ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র ধর্ম প্রচারের কাজে। কিন্তু তৎকালীন মুসলমান সমাজকে বাঁচাবার জন্য সত্যিকার যে প্রচেষ্টা ও লক্ষ্য চিহ্নিত হওয়া দরকার ছিল তা তৎকালীন অনেক মুসলিম সমাজকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তখন মুসলমানদের জন্য যা দরকার ছিল তা হলো শিক্ষা গ্রহণ করা এবং ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আয়ত্ত করা এবং মাতৃভাষার উন্নতি ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার পথ সুগম করা। প্রথমটি মুসলমানদের বৈষয়িক অনিশ্চয়তা দূর করবে, শেষোক্তটির মাধ্যমে মুসলমান জাতির জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হবে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এ জাতীয় সত্যিকার অভাব বোধ এবং প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে এর সমাধানে সময়োপযোগী ও যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দেশ জাতি ও ধর্মের জন্য অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসাকে ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করতেন। তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি হিন্দু মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ও অনুরাগী ছিলেন। দেশ, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে প্রতিশ্রুতি ছিল, অন্তর্গত বিশ্বাস ও সংগ্রামী যে মনোভাব ছিল তা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর লেখা নিম্নোক্ত দু'টি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়ঃ

> 'যে জাতির সাহিত্য নাই সে জাতির আত্মসম্মান নাই, যে জাতির আত্মসম্মান নাই, সে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। যদি মোছলেম বলিয়া পরিচয় দিতে হয়, যদি অন্য জাতির সমকক্ষতা করিতে হয়, তবে মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাবে, ভাবাপন্ন করিতে হইবে। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে বাঙালা ভাষার উন্নতি একান্ত আবশ্যক।'[২২]
>
> 'ভাই সকল! হিন্দু মুসলমানী দ্বন্দ্ব আজ হইতে ভুলিয়া যাও; 'হিন্দু বাঙালা' 'মুসলমানী বাঙালা' এই পার্থক্য বোধক শব্দগুলি অভিধান হইতে উঠাইয়া দাও; উভয়ের সাহায্যে বঙ্গ ভাষার আয়ত্ত বৃদ্ধি কর এবং ভাষার উত্তরোত্তর উন্নতি দ্বারা দেশের সম্মান সাধন কর। আমিত্ব ছাড়িয়া দাও; এক মনে এক প্রাণে, প্রেমময়ের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেম লইয়া জাতি নির্বিশেষে বঙ্গ ভাষার উন্নতি সাধন কর।'[২৩]

এদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর অবদান অনস্বীকার্য। আমরা ১৯৫২ সালকে প্রথম ভাষা আন্দোলনের ফল বলে মনেকরি। কিন্তু এই

---

[২২] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, জয় প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৮, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯।

[২৩] প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন যে পাকিস্তান পূর্ব কাল থেকে শুরু হয়েছিল তা আমরা জানি না। বৃটিশ আমলে কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতিক হিন্দী এবং উর্দু ভাষার প্রাধান্যের জন্য যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার ফলে বাংলা তার গুরুত্ব এবং মর্যাদা হারাতে বসেছিল। এমনি ক্রান্তিলগ্নে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও সৈনিক হিসাবে অবতীর্ণ হন।[২৪]

শিক্ষা বিভাগেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সমগ্র চাকরি জীবন অতিবাহিত হয়েছে। চাকরির শেষ পর্যায়ে এই বিভাগের উচ্চ পদে উন্নীত হয়ে তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে আরো সুন্দর ও সুচারুভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে এবং তাঁর সক্রিয় হস্তক্ষেপের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে তথা মুসলিম শিক্ষার বিপুল সংস্কার সাধিত হয়। 'মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন।'[২৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর উল্লেখযোগ্য শিক্ষাসংস্কারমূলক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নরূপঃ

১. সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। অনেকের ধারণা, এর ফলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে (সাম্প্রদায়িক কারণে) পক্ষপাতিত্ব হওয়ার সুযোগ থাকে। সেজন্য নামের পরিবর্তে পরীক্ষার খাতায় ক্রমিক নং (Roll Number) লেখার রীতি প্রবর্তনের স্বপক্ষে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বিশেষ প্রচেষ্টা চালান এবং সর্বপ্রথম অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় এই রীতি চালু করতে সক্ষম হন। এর পর এই অনুকরণে তিনি আই.এ. এবং বি.এ. পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখা রহিত করেন।

---

[২৪] আনোয়ারুল করিম, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ও তাঁর চিন্তাধারা (প্রবন্ধ), আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ১০ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃঃ ৫।

[২৫] সৈয়দ মুর্তজা আলী, শিক্ষা ক্ষেত্রে দিশারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬-১২২।

Dhaka University Institutional Repository

২. সে সময় উচ্চ মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক মাদ্রাসা হতে পাস করে ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হতে পারত না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) উক্ত মাদ্রাসাদ্বয়ের শিক্ষামান উন্নীত করেন এবং মাদ্রাসা পাস করা ছাত্রদের কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি করেন।

৩. কোন কোন স্কুল কলেজে সে সময়ে মৌলবির পদ ছিল না। তিনি সর্বত্রই মৌলবির পদ সৃষ্টি করেন এবং পন্ডিত ও মৌলবির বেতনের পার্থক্য রহিত করেন।

৪. উর্দুকে তখন Classical language এর মধ্যে গণ্য করা হতো না। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের উর্দুভাষী ছাত্রদিগের অসুবিধা হতো। তাঁর প্রচেষ্টায় উর্দু সংস্কৃতের স্থান দখল করে।

৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সক্রিয় প্রচেষ্টায় কোলকাতায় মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব উথাপিত হয় যেখানে আরবী, ফার্সী, উর্দু শিক্ষার বৈশিষ্ট্য থাকবে। ইসলামী ঐতিহ্য, ইসলামী আচার, বাধ্যতামূলক নামাজ ও ইসলামিক পারিপার্শ্বিকতা গঠন অন্যতম উদ্দেশ্য হবে। তাঁর জোরালো যুক্তির ফলে তৎকালীন সরকার প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোলকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল 'মিঃ হারলি' এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন।

৬. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর প্রচেষ্টায় বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসলিম হাইস্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক মুসলমান শিক্ষকের কর্মসংস্থান হয়। কোলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, মোছলেম ইনস্টিটিউট প্রভৃতি তাঁর অবদানের সাক্ষ্য বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. তিনি স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করেন এবং মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য মুসলমান লেখকের লেখা পুস্তক ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করেন। এর ফলে মুসলমান লেখকগণ পাঠ্যপুস্তক লেখার সুযোগ পান এবং মুসলমান পুস্তক প্রকাশকগণের অবস্থার উন্নতি হয়। তৎকালীন 'মখদুমী লাইব্রেরী' 'প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী' 'ইসলামিয়া লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠা এবং টিকে থাকার ক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর অবদান অনস্বীকার্য।

৮. মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তির ধারা নির্দিষ্ট হয় এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর তত্ত্বাবধানে সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বৃত্তি বণ্টন করা হত। স্কুল-কলেজে মুসলমানদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা তিনি নির্ধারণ করেন এবং গরীব ও মেধাবী ছাত্রকে বর্ধিতহারে বিনা বেতনে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বৈদেশিক উচ্চশিক্ষার জন্য মুসলমানদের সরকারি বৃত্তি প্রাপ্তির পথ তিনি সুগম করেন।

৯. টেক্সট বুক কমিটিতে তিনি মুসলমান সভ্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন এবং পরীক্ষকদিগের মধ্যে মুসলমান পরীক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক, কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা নির্ধারণ, ট্রেনিং কলেজে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা, স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মুসলমান ন্যুন সংখ্যা নির্ধারণ করেন।

১০. তাঁর প্রচেষ্টায় New Scheme মাদ্রাসার সৃষ্টি হয় এবং আরবী শিক্ষার মধ্যস্থতায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। হাইস্কুলে আরবী অধিকতর ভাবে Second Languge রূপে গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১১. মুসলমান ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর প্রচেষ্টায় বিশেষ বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের শিক্ষা ও শিল্পের বিস্তারকল্পে তিনি অনুকূল সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেন।[২৬]

এছাড়া ১৯১৪ সালে অবিভক্ত বাংলার গভর্ণর ৩০ জুন ২৪৭৪ সংখ্যক রেজিলিউশনে মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনটি বিশেষ ধারার স্বপক্ষে সুপারিশ পেশ করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেন। প্রাদেশিক পরিষদের ডিরেক্টর হর্নেল এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এই কমিটির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন।[২৭] কমিটির সুপারিশ মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিতে একটি সুদূরপ্রসারী অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর অবদানের অনেক তথ্যই এখনো অনুদঘাটিত। পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেন্টের চীফ-সেক্রেটারি বিটসন বেল একদিন তার শিলং ভবনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কে আমন্ত্রণ জানান। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে যত কমিটি বা কনফারেন্স হত তার সব কমিটিতেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সদস্য বা অন্য কোন পদাধিকার বলে জড়িত থাকতেন। আইন পরিষদে যখন Medium of Education বা শিক্ষার Medium কি হবে সে নিয়ে তুমুল বিতর্ক ও আলোচনার সূত্রপাত হয় তখন চীফ-সেক্রেটারি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর লিখিত Article টি সমর্থন করতঃ উক্ত পরিষদের গোচরীভূত করেন।[২৮]

---

[২৬] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, জয় পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ঢাকা-১৯৯০, ৩য় খন্ড, পৃঃ ভূমিকা ১৯।

[27] Azizul Hoq, History and Problem of Muslim Education in Bengal, 1917,

[২৮] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) যখন চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত তখন বিভাগীয় কমিশনারের প্রস্তাব অনুসারে শিক্ষা সম্পর্কে সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করে। সদরের সরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাগুলির আবশ্যকতা অনুযায়ী স্থান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পর্কিত বিষয়ে রিপোর্ট প্রণয়ন করা এই কমিটির কাজ ছিল। কলেজের অধ্যক্ষ যাত্রামোহন সেন ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই কমিটির সদস্য ছিলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এই কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন।[২৯]

বৎসরাধিককাল কাজ করার পর কমিটি একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। এই রিপোর্ট সরকারের কাছে বিবেচিত ও মনোনীত হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সরকারি মঞ্জুরি লাভে সমর্থ হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিভাগীয় কমিশনারের সুপারিশক্রমে এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর উপযুক্ত কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সরকার তাঁকে মধ্যবর্তী দুটি গ্রেড অতিক্রম করে পরবর্তী গ্রেডে তাঁর বেতনস্কেল নির্ধারণের অনুমোদন প্রদান করে।

'তৎকালে চট্টগ্রামে মুসলমান শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। মাদ্রাসাই একমাত্র উচ্চশিক্ষার স্থান ছিল। হিন্দু পল্লীতে যে সকল হাইস্কুল ছিল, তাহাতেই মোসলেম বালকগণ শিক্ষা লাভ করিত। তাহাদের নিজস্ব কোনো মধ্য বা উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল না।'[৩০] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সক্রিয় প্রচেষ্টায় তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগের বহু স্থানে মুসলমান কর্তৃপক্ষের অধীনে উচ্চ ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়।

---

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

সে সময় যে অল্প সংখ্যক মুসলমান ছাত্র বি.এ. পাশ করতে সক্ষম হতো তারা অধিকাংশই হাকিম হওয়ার জন্য লালায়িত থাকতো। এরা প্রশাসনিক চাকরি বা শিক্ষা বিভাগের চাকরিতে আসতে চাইতো না।[৩১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সক্রিয় প্রচেষ্টায় এবং ব্যক্তিগত সাহায্য সহযোগিতা ও উপদেশ লাভ করে কোন কোন মুসলমান গ্রাজুয়েট শিক্ষা বিভাগের চাকরি করতে সক্ষম হয়।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) তাঁর চাকরি জীবনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ মোবারক আলী (এরপর খান বাহাদুর) এর জন্য ১৯১১ সালের মার্চ মাসে কলেজ স্কোয়ারে একটি বইয়ের দোকানের ব্যবস্থা করেন।[৩২] স্বীয় মুর্শিদের ইঙ্গিতে বিহার প্রদেশের মখদুমূল মোলক(রঃ) এর নামানুসারে এর নাম 'মখদুমী লাইব্রেরী' রাখা হয়। কিছুকাল পরে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর পুত্র মোঃ বদরুদ্দোজা 'এম্পায়ার বুক হাউস' নামে স্বতন্ত্র একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে এ লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন করে 'আহ্ছানউল্লা বুক হাউস' রাখা হয়। ১৯৩৬ সালে দোকানের পরিবর্তিত নামকরণ হয় 'মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস' এবং ৩নং কলেজ স্কোয়ার থেকে ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে (এলবার্ট হলের দক্ষিণে) স্থানান্তরিত হয়। তাঁর স্থাপিত 'মখদুমী লাইব্রেরী' প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ইসলামী গ্রন্থ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে।[৩৩] এই সময় মুসলমানগণ বইয়ের ব্যবসায় খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর জন্য এটি ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 'মখদুমী লাইব্রেরী'র ভিত্তি স্থাপন শুধুমাত্র ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে ভুল হবে। খানবাহাদুর

---

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২।

[৩৩] শ্রী অঞ্জলী বসু সম্পাদিত এবং শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কোলকাতা ৭০০০৯ কর্তৃক প্রকাশিত সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, ১৯৭৬, পৃঃ ১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্ছানউল্লা (রঃ) ছিলেন মনেপ্রাণে সাহিত্যানুরাগী। সাহিত্যচর্চায় তিনি নিজে শুধু অগ্রণী ভূমিকা পালন করেননি, সে সময়ের অন্যান্য মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশের এবং প্রচারের মাধ্যম হিসাবে তিনি এই লাইব্রেরীকে ব্যবহার করেন। ব্যবসায়িক মানসিকতা নয়, একান্ত আন্তরিকতা ও দরদ দিয়ে এখান থেকে নিয়মিতভাবে মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশ করা হত। মুসলমান লেখকরা আবার পূর্ণোদ্যমে নতুন নতুন সাহিত্য-সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। এর ফলে, এ 'মখদুমী লাইব্রেরী'র মাধ্যমে সে সময়ের কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' ও 'আনোয়ারা'র নাম উল্লেখ করা যায়। 'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে খান বাহাদুর মোবারক আলী বলেছেনঃ '.....হঠাৎ একদিন নদীয়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মীর মশাররফ হোসেন ছাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র মীর এবরাহীম হোসেন ছাহেব তাঁহার পিতার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ বিষাদ সিন্ধু অবাঁধা অবস্থায় গাড়ী ভর্তি করিয়া আমার দোকানে আনিয়া জমা দিলেন। চুক্তি হইল-বাঁধান খরচ বাদে ২৫ টাকা হিসাবে কমিশন পাইব।'[৩৪]

'মখদুমী লাইব্রেরী' থেকে প্রকাশিত 'আনোয়ারা' উপন্যাসটি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সম্পর্কে প্রকাশকের বক্তব্যঃ

> 'সে সময় পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যার পরে গ্রামবাসীগণ হয়ত কোন বৃদ্ধলোকের নিকট গিয়া গল্প শুনিত অথবা তাস পাশা খেলিয়া সময় কাটাইত। কিন্তু যে গ্রামে একখানা আনোয়ারা পুস্তক গিয়াছে সেখানে সকলে অবাক হইয়া আনোয়ারার কেচ্ছা শুনিত। তাহাতে পুস্তকটি প্রচুর বিক্রয় হইতে থাকে। এই আনোয়ারা পুস্তক দেশের অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে লেখাপড়া শিক্ষার আগ্রহ আনায়।'[৩৫]

---

[৩৪] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃঃ ৫৩।

[৩৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৫ সালে এক সরকারি নির্দেশবলে মুসলমান লেখকদের প্রণীত পুস্তকই মক্তব মাদ্রাসায় পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। 'মখদুমী লাইব্রেরী' এ সময়ের এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মুসলমান লেখকদের লেখা পাঠ্যপুস্তক বিপুল পরিমাণে মুদ্রণ ও প্রকাশ করার দায়িত্ব ও ঝুঁকি একমাত্র 'মখদুমী লাইব্রেরী'ই গ্রহন করেছিল। মুসলিম সাহিত্যে অনুরাগী ও উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা 'মখদুমী লাইব্রেরী'র এ অবদানের কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবেন। 'মখদুমী লাইব্রেরী'র প্রকাশিত সেদিনের সচিত্র বর্ণপাঠ, প্রথম পড়া, মক্তব বর্ণপাঠ, মক্তব বাল্যশিক্ষা, নীতি ও ধর্মশিক্ষা, মক্তব-মাদ্রাসা সাহিত্য, ধারাপাত, আমপারা, উর্দু কায়দা প্রভৃতি বই বহু মুসলমান শিক্ষার্থীর পাঠ্য বইয়ের অভাব পূরণ করে।

লাইব্রেরী সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বলেছেনঃ

> 'ধুম গতিতে লাইব্রেরীর কাজ চলিতে থাকিল। বহু সাহিত্যিক, লেখক, কবি ও কর্মীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইলাম। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পাঠের বই এবং অন্যান্য বহু পুস্তক আমরা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। দিকে দিকে আহ্ছানউল্লা বুক হাউসের সুনাম সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। আমাকেও পুস্তক লেখার আবার কখনো লাইব্রেরীর কাজে সারা দিনরাত খাটিতে হইতো।'[৩৬]

এ সব বিষয় পর্যালোচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সে সময়ের মুসলমান লেখক-লেখিকাদের সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল সুযোগ প্রদানের জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য 'মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[৩৬] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, জীবন স্মৃতি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৬, পৃঃ ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

চাকরি জীবনে এবং অবসর জীবনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) নিরলসভাবে সাহিত্য সাধনা করেছেন। তৎকালীন মৃতপ্রায় মুসলমানদের নবজাগরণের জন্যে মুসলিম ঐতিহ্য এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও বিধিবিধান শীর্ষক বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তিনি নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। এদিক থেকে তাঁর গ্রন্থের একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি হিসাবে বাংলা একাডেমী তাঁকে ফেলো সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৬০ সালের ৪ মে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর কর্মপরিষদের ৩২তম সভায় তাদের পুরস্কার উপসংঘের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেঃ

> 'In view of the literary services rendered to the Bengali literature in general and Bengali literature of East Pakistan in particular it is recommended that the following literary persons be offered the honour of being the Fellow of Academy:
>
> 1. Khan Bahadur Ahsanullah, 2. Shaikh Reazuddin Ahmed, 3. Shaikh Habibur Rahman, Sahitya Ratna, 4. Nurunnesa Khatun, Vidya vinodini.'[37]

বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এ সম্পর্কে একাডেমী পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ,১৩৬৭) একটি প্রতিবেদন পেশ করেন এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কে নিম্নোক্ত পত্র লেখেনঃ

'পত্রের সংখ্যা ৮০২২-বা এ, ১৪ই জুলাই, ১৯৬০

---

[৩৭] বাংলা একাডেমী পত্রিক, একাডেমীর কথা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরকঃ পরিচালক, বাংলা একাডেমী,
বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

জনাব,

বিগত ৪ঠা ও ৫ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর কর্মপরিষদের ৩২-তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি আপনাকে সানন্দে জানাইতেছি যে, বাংলা সাহিত্যে আপনার বিশিষ্ট ও বহুমুখী দানের স্বীকৃতিরূপে একাডেমী আপনাকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির 'ফেলো' বা 'সম্মানিত সদস্যের' মর্যাদা দিয়া নিজেকেই গৌরবান্বিত মনে করিতেছে।

অতঃপর, আপনি যথানিয়মে একাডেমীর যাবতীয় সুখ-সুবিধা ভোগ করিবেন। আপনার বিশেষ অবগতির জন্য এতৎসঙ্গে আবশ্যক কাগজ-পত্র পাঠাইলাম।

আশা করি, একাডেমী আপনার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। ইতি-

আপনার একান্ত অনুগত,
স্বাঃ মুহাম্মদ এনামুল হক[৩৮]

ইন্তেকালঃ

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ১৯৬৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা ১০মিনিটে তিনি স্বীয়গ্রাম নলতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং নিজ গ্রামেই তিনি সমাহিত হন। জানাযায় ১৫/১৬ হাজার লোক শরীক হয়। একটি অজগ্রামে সে সময়ে ১৫/১৬ হাজার লোকের সমাগম তাঁর প্রতি অসংখ্য মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার নিদর্শন।[৩৯]

---

[৩৮] বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৪র্ধ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবন ১৩৬৭।
[৩৯] গোলাম মহিউদ্দিন সম্পাদিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারকগ্রন্থ,আ.মি.পা.ট্রাস্ট,ঢাকা-২০০০,পৃঃ ৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)এর সাহিত্যে ধর্ম ও সূফীবাদ

সাধারণত ধর্ম বলতে বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি ভক্তি বা আনুগত্য প্রকাশের প্রবৃত্তিকে বুঝায়। শাব্দিক বিশ্লেষণে ধর্ম শব্দটি সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। 'ধৃ' ধাতুর সাথে ম (র্তৃ) প্রত্যয় যোগে 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে তাই যা ধারণ করা যায়, বা ধারণ করে রাখে তাকেই ধর্ম বলা হয়। অর্থাৎ মননগতভাবে বিশিষ্ট কোনো প্রত্যয় বা বিশ্বাস পোষণ করাই হচ্ছে ধর্ম। যেমন- সাধুর ধর্ম, খলের ধর্ম, মানব ধর্ম, জীবন ধর্ম ইত্যাদি। তবে পরিভাষাগত ভাবে ধর্ম বলতে জীবন বিধানকে বুঝায়। যেমন ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম ইত্যাদি। যে কোনো ধর্ম পালন করতে গেলে বিশেষ কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। এ নিয়ম অনুসরণকে বলা হয় ধর্মীয় সাধনা। প্রত্যেক সাধক পুরুষ সঠিকভাবে ধর্মীয় সাধনা করে থাকেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ধর্মীয় সাধনা করেছেন, ধর্মীয় সাধনার গভীরে নিমগ্ন হয়েছেন। পারিবারিক সূত্রে তাঁর হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ভক্তির উদয় হয়েছে। তাঁর রচিত 'আমার জীবন ধারা' শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেনঃ

> 'কোনো বিলাস ব্যসন আমার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আমি বাল্যকাল হইতে নামাজ পড়িতাম। আমার একমাত্র আরাধনা ছিল যেন অন্যেরাও আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চলে।'[১]

অতএব দেখা যাচ্ছে ধর্ম সাধনার ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করার অভ্যাস তাঁর মধ্যে গড়ে উঠে বাল্যকাল থেকেই। আর এটা তাঁর পরিবারের প্রভাব থেকে এসেছিল তা সত্য। অধ্যাত্ম

---

[১] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮, পৃঃ ৬।

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিতে বিশ্বাস, অলৌকিক কর্মকান্ডে আস্থা, ফকির দরবেশগণের আত্মিক ক্ষমতা ইত্যাদি সংক্রান্ত মানসিক প্রস্তুতি তাঁর হয়েছিল অতি শৈশবে। তাঁর লিখিত ভাষ্য থেকেই এ কথা অবহিত হওয়া যায়। তিনি বলেনঃ

> 'আমার পিতামহ মুনশী মোহাম্মদ দানেশ গ্রামের মধ্যে সকলের মান্য ছিলেন। তাহার উপর জনৈক দরবেশ ছাহেবের নেকদৃষ্টি পতিত হয়।'[২]

এই দরবেশ অলৌকিক ক্ষমতাবলে আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর পিতামহকে কঠিন ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত করেন। এই ঘটনার কথা পিতামহের মুখে শুনে বালক আহ্ছানউল্লা (রঃ) আধ্যাত্মিকতার প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। ছোটবেলা থেকে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় সাধনায় গুরুর প্রয়োজন। আরবী ভাষায় যাকে বলা হয় মুর্শিদ, ফার্সীতে বলে পীর। মুর্শিদ ও পীরের বাংলা প্রতিশব্দ গুরু। গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণকে আরবীতে বায়আ'ত গ্রহণ বলা হয়। এ বিষয়টিও আহ্ছানউল্লা (রঃ) পারিবারিক প্রভাবে অবহিত হন। তাঁর বাল্যকালে তাঁর পিতা মুনশী মোহম্মদ মুফিজউদ্দিন ইরান থেকে আগত পীর মাওলানা ছূফী মোহম্মদ আলী শাহের বায়আ'ত (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করেন।[৩] নিষ্ঠাবান ধর্মসাধক এবং সমাজসেবক হিসেবে মুফিজউদ্দিনের পরবর্তী জীবন অতিবাহিত হয়। আহ্ছানউল্লা (রঃ) পিতৃ-আদর্শ অনুসরণের ফলে একটি পুত-পবিত্র পীর মুর্শিদী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হন। তবে তিনি প্রচলিত ধর্মীয় পীর ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত মানবতার প্রতীক, জীবন প্রেমিক ও মানবতার মুক্তিসাধক। সাধারণে অতি সহজেই যে তাঁকে পীরের আসনে বসিয়েছে, সে তাঁর নানা দৃশ্যগ্রাহ্য মহিমার কারণে। আবার অনেকে তাঁর স্বকীয় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তাঁকে পীর আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত এবং শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম পদে আসীন। সে জন্যেই শিক্ষিত সমাজের অনেকেই এমনকি অমুসলিমরাও তাঁকে

---

[২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

[৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

একাধারে শিক্ষাগুরু ও ধর্মগুরু বলে স্বীকার করেছে। যেমন প্রখ্যাত গবেষক নিরাপদ রায় এ বিষয়ে বলেছেন ঃ

> 'শ্রী গীতায় শ্রী ভগবান ব্যক্ত করেছেন-'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' অর্থাৎ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই। ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হউন বা প্রতিনিধি প্রেরণ করুন-যাহাই করুন না কেন আমরা সাধারণ্যে বলিব মহাত্মার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অলৌকিক শক্তির আধার সাধু, পীর, দরবেশ, ঋষি ইহারাই। ইহারা অমৃতের পুত্র। স্বর্গের আলোকবর্তিকা হস্তে ধারণ করিয়া ইহারা অবনীর অন্ধকার বিনাশ করিতে ধরাবক্ষে আগমন করেন। অবিভক্ত বঙ্গের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এমনি একজন অমৃতের পুত্র। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান তথা বাঙালী মাত্রেরই নিকট তিনি 'পীর সাহেব' বলিয়া খ্যাত।'[৪]

বস্তুতঃ তাঁর জীবনে সূফীবাদের প্রভাব পড়ে পারিবারিকভাবে। সে জন্য আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ধর্মীয় সাধনার বিশেষত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে সূফীতত্ত্বের পরিচিতি, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং সূফী সাধনায় তাঁর অবস্থান নির্ণয় অতি জরুরী। ইসলামের ইতিহাসে সূফীতত্ত্বের গুরুত্ব সর্বাধিক। সূফীতত্ত্বের আরো মূল্যবান স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে মুসলিম দর্শনে। ইসলামে নিহিত মরমিবাদ মূলত সূফীবাদ নামেই পরিচিত। বিদ্বানদের মতে ইসলামী মরমিবাদ বিশ্ব-মরমিবাদের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ।[৫] উল্লেখ্য, ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত মিস্টিক (মরমি)

---

[৪] গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারকগ্রন্থ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০,পৃঃ ১৭৯।

[৫] খানবাহাদুর আবদুল হাকিম (সম্পাদিত), বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ ৬৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

কথাটি আরবী, ফার্সী, তুর্কী, মুসলমানদের এ তিনটি প্রধান ভাষায় 'সূফী' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়।[৬] তবে মিস্টিক ও সূফী সম্পূর্ণ সমার্থক নয়। সূফী শব্দের একটি ধর্মীয় তাৎপর্য এবং সীমিত ব্যবহার আছে। এ অর্থে তা কেবল ঐ সকল মরমিদেরকে বুঝায় যারা ইসলামের অনুসারী।[৭]

'সূফ' صوف থেকে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি। 'সূফ' صوف আরবী শব্দ, এর অর্থ পশম। সূফ শব্দ থেকে 'তাসাওউফ' এর উৎপত্তি যার অর্থ পশমি বস্ত্র ধারণ। মরমি তত্ত্বের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করার কাজকেও তাসাওউফ বলা হয়। এরূপ সাধনায় আত্মসমর্থিত ব্যক্তি ইসলামী পরিভাষায় সূফী নামে অভিহিত।[৮] আত্মসমর্পিত ঐ ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা ও সাধন-ভজন প্রণালী সূফীতত্ত্ব বলে গণ্য।

সূফীতত্ত্বের উদ্ভব সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত। মদীনায় ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে মদীনার মসজিদ সংলগ্ন নির্জন স্থানে অবস্থানরত সংসার-নির্লিপ্ত আল্লাহ-প্রেমিক একদল লোক 'আহলুস সুফ্ফা'[৯] নামে পরিচিত হন। এঁদের উপর আরোপিত উক্ত 'সুফ্ফা' শব্দ থেকে সূফী শব্দের উদ্ভব বলে ধরা হয়। 'সাফা'[১০] (পবিত্রতা) শব্দ থেকে 'সূফী' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। গ্রীক ভাষায় 'সোফিস্ট' শব্দের পরিবর্তিত রূপ 'সোফিয়া' থেকে 'সূফী' শব্দ এসেছে বলে কারো কারো ধারণা।

---

[6] R. A. Nicholson, The Mysties of Islam, Reprinted Edition, Routledge & Kegan paul, London, 1947, page –2.

[৭] প্রাগুক্ত।

[৮] আবদুল হক ফরিদি (সম্পাদিত) সংক্ষিপ্ত ইসলামিক বিশ্বকোষ, প্রথম খন্ড, প্রথম সংস্করন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮২, পৃঃ ৪৯৪।

[৯] প্রাগুক্ত।

[১০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সূফীতত্ত্ব উদ্ভবের কারণস্বরূপ ভারতীয় বেদান্ত-দর্শনের প্রভাবের কথা উল্লেখ হয়ে থাকে। কারো কারো মতে নব্য প্লেটোবাদী খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারকদের ধর্মীয় অনুপ্রেরণা সূফীতত্ত্বের উদ্ভবের কারণ। অন্যদিকে আল-কোরআনই প্রকৃতপক্ষে সূফীতত্ত্বের মূল উৎস-এ ধরনের যুক্তিও উত্থাপিত হতে দেখি।[১১]

সূফীতত্ত্ব উদ্ভবের উপরোক্ত চারটি কারণের মধ্যে প্রথম তিনটি বাহ্যিক এবং চতুর্থ কারণটি অভ্যন্তরীণ। আর এটাই সূফীতত্ত্ব উদ্ভবের যথার্থ ও আসল কারণ। পাশ্চাত্য গবেষকদের মতেও সূফীতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম উৎস ঐ মহাপবিত্র গ্রন্থ 'আল-কোরআন।'[১২] কোরআনে বর্ণিত হয়েছেঃ

> 'তিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াত সমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষাদেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপুর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।'[১৩]

সূফীদের মতে এই প্রজ্ঞা হচ্ছে অধ্যাত্ম জ্ঞান, যা সূফীতত্ত্বের মূল বিষয়। এ ছাড়া আরো আয়াত আছে যেগুলোতে সূফীতত্ত্বের মর্মকথা নিহিত আছে বলে অনেকে ধারণা করেছেন। আয়াতগুলোর অর্থ এ রকম ক. 'বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?।'[১৪] খ. আমরা তার (মানুষের) ঘাড়ের রগ বা শিরার চেয়েও নিকটতম।'[১৫] এ ধরনের আরো অনেক আয়াত

---

[১১] সাইদুর রহমান, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, আমিনুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৬৮।

[12] R.A. Nilcholson, The Idea of Personality in Sufism, First Edition, Cambridge University Press, London, 1923, Page, 3,4,37.

[১৩] সুরা ৬২, আয়াত ২।

[১৪] আল-কুরআন, ৫১:২০,২১।

[১৫] আল-কুরআন, ৫০:১৬।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত করা যায়। বস্তুত কোরআনের এসব গূঢ়ার্থক আয়াতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপরেই সূফীতত্ত্বের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।[১৬] উৎপত্তির কারণ যাই হোক সুউচ্চ মরমি আদর্শ সূফীতত্ত্বকে খুব শীঘ্রই জনপ্রিয় করে তোলে। সূফীতত্ত্বের মূল বিষয় পর্যালোচনা করলে এ কথা জানা যায়। মরমিবাদের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ এই সূফীতত্ত্ব। সূফীতত্ত্বের গতিও তাই দুর্বার। মরুময় আরব দেশে সূফীতত্ত্বের উদ্ভব। সেখান থেকে এ মতবাদ উপস্থিত হয় গোলাপকুঞ্জময় পারস্যে।[১৭] পারস্যের ধর্মীয় চিন্তায় মরমি ভাবধারা বৃদ্ধির সাথে সাথে সূফী-সাধকগনের ভূমিকাও সেখানে মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে সমকালেই সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সূফীতত্ত্বের প্রসার ঘটে। ভারতীয় উপমহাদেশে সূফীতত্ত্বের আগমন, প্রভাব ও প্রসার এই গতিরই একটি স্বাভাবিক ফল।[১৮]

খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে সূফীতত্ত্ব প্রবেশ করে।[১৯] অবশ্য আরব বণিকদের ব্যবসা সূত্রে ভারতীয় ভূখন্ডে মুসলিম আগমন অষ্টম শতাব্দীতেই সম্ভব হয়।[২০] তথাপি একাদশ শতাব্দীকেই বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সূফীতত্ত্ব প্রচারের যথার্থ কাল বলে বিদ্বানেরা স্থির করেছেন।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে সূফীতত্ত্বে একটি ভাবসংঘ (স্কুল অব থট) হিসেবে চিশতিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকাভুক্ত সূফীদের মাধ্যমে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষত বাংলায় তাঁরা প্রচারাভিযান জোরদার করে। পারসিক সূফী বায়েজিদ বোস্তামীর ভারতীয় গুরু বু-আলি

---

[১৬] আহমদ শরীফ, বাংলার সুফী সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ভূমিকা -ঘ।

[17] দেখুন Mary Boyce, Zoroastrians, first Edition, Routladge and kegan paul, London, 1979, Page150-51.

[১৮] প্রাগুক্ত।

[১৯] মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব, প্রথম সংস্করণ, মহসীন এ্যান্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃঃ ১৭

[২০] মুহাম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃঃ ৪০-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

কলন্দরের ব্যক্তিগত আদর্শের প্রেরণাও এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়।[২১] বাংলার সংস্কার, বিশ্বাস, লোকাচার ইত্যাদির সাথে সূফীতত্ত্বের সম্মিলন ঘটে। আবার সূফীদের আদর্শ, ধ্যান-ধারণা এবং সাধন প্রণালী এ দেশের সাধকগণ অবলম্বন করেন। মোট কথা এ দেশের প্রাণের সাথে আরব-পারস্যের প্রাণের মিল ঘটে যায়।[২২]

বাংলাদেশে এই সূফীতত্ত্বের এক ধারা বৈষ্ণব ভাববাদ এবং অন্য ধারা ইসলামী ভাববাদে উদ্বুদ্ধ সাহিত্য-সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে। আমরা এই দ্বিতীয় ধারায় অনেক সাধক এবং ফকির-দরবেশকে পেয়েছি। এদের মধ্যে অনেকে একাধারে সাধক এবং সাহিত্যসাধক ছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় সূফীতত্ত্বের যে জোরদার প্রচারাভিযান চলে তা অধিকতর গতিশীলতা লাভ করে যাদের দ্বারা, তারা হচ্ছেন খাজা নিজামুদ্দিন এর অনুগামী আখি সিরাজুদ্দিন (ইনঃ ১৩৫৭ ইং), শেখ আলাওল হক (ইনঃ ১৩৯৮), নূর কুতুবুল আলম (ইনঃ ১৪১৬), শেখ জাহিদ (ইনঃ ১৪৫৫), শাহ মখদুম, আবদুল্লাহ কিরানুল হোসেন, শাহ রাহমূল্লাহ, শাহ বড় দস্তগির, শাহ আব্দুর রহিম (ইনঃ ১৭৪৫) প্রমুখ। সামা গজলের সমগোত্রীয় ভাবসঙ্গীত রচয়িতা লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯০ইং) এর কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তীকালে চতুর্থ শতক থেকে ঊনিশ শতক পর্যন্ত এসব সাধক, ফকির-দরবেশ এবং কবি-সাহিত্যিকের অবদানে বাংলার সূফীতত্ত্ব এবং মরমি সাহিত্যধারা সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁদের আত্মিক এবং তাত্ত্বিক অবদান অনস্বীকার্য। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এ ধারারই এক অতি স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ-সৃষ্ট ব্যক্তিত্ব। সূফীতত্ত্বের দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে তিনি স্বনামধন্য সাধকপুরুষ হিসেবে নিজেকে যুক্ত করেছেন। তাঁর এ সংযুক্তি বাংলাদেশের মরমি চিন্তাধারা এবং মরমি সাহিত্যধারার সপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি। বাংলাদেশের অধ্যাত্ম-ভাবসাধনা তাঁর অবদানে ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে।

---

[২১] দেখুন, প্রাগুক্ত।

[২২] দেখুন, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এদেশের সাহিত্য অঙ্গনে এবং আধ্যাত্মিক-জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সাধনা, ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং ধর্মনিষ্ঠায় পূর্ণ ছিল তাঁর জীবন। জীবনের শুরুতেই তাঁর মধ্যে ধর্মীয় সাধনার সূত্রপাত ঘটে। নিয়মিত ইবাদত, ঐশী ভাবনায় মশগুল থাকা এবং পরজীবন-চেতনায় উদ্বেলিত হওয়া তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়। কর্মজীবনে কর্মের কঠিন শৃঙ্খলায় আবদ্ধ থেকেও তিনি কখনো ধর্মীয় সাধনা থেকে বিরত থাকেননি। চাকরিসূত্রে চট্টগ্রামে অবস্থানকালে তাঁর মনে গভীর অধ্যাত্মচেতনা জাগ্রত হয়। তাঁর মধ্যে অস্থিরতা, ব্যাকুলতা এবং নির্জন প্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেনঃ

> 'চট্টগ্রামের প্রাথমিক অবস্থিতিকালে মাতা-পিতা আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা আমার ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও নির্জনপ্রিয়তা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ও যেখানে কোন দরবেশ বা মজ্জুবের কথা শুনিতেন, পিতা সেখানেই আমাকে লইয়া হাজির হইতেন। তাহাদের ভয় হইয়াছিল যে, আমি সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া হয়ত পাছে কোনো অজ্ঞাত স্থানে প্রস্থান করি। তাঁহারা আমাকে বুঝাইবার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিলেন। মাতার উপদেশ, স্ত্রীর অনুরোধ, বন্ধু-বান্ধবের যুক্তি কার্য্যকরী হইল না।'[২৩]

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। একদিন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এক সাধুপুরুষকে স্বপ্নে দেখেন। এর ফলে তাঁর মনের অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়। ইতোমধ্যে এক সাধুপুরুষ বিভিন্ন দেশ ভ্রমনের এক পর্যায়ে চট্টগ্রামে আসেন এবং তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে তিনি আহ্ছানউল্লা (রঃ) কে একটি চিঠি পাঠান। আহ্ছানউল্লা (রঃ) তখন সরকারি কাজে মফস্বলে

---

[২৩] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮, পৃঃ ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। সদরে ফিরে তিনি জানতে পারেন যে, ঐ সাধুপুরুষ চট্রগ্রাম ছেড়ে কুমিল্লায় গেছেন। সংবাদ জানামাত্র আহ্ছানউল্লা (রঃ) কুমিল্লার পথে যাত্রা করেন এবং সেখানে ঐ সাধুপুরুষের সাক্ষাৎ লাভে তিনি অভিভূত হয়ে যান, কারণ ইনিই তাঁর স্বপ্নে দেখা সাধুপুরুষ। ঐ সাধুপুরুষের নাম সৈয়দ হাবিব আহমদ। অধ্যাত্ম সাধনায় সাফল্য লাভের পর তিনি গফুর শাহ্ নামে পরিচিত।[২৪]

১৯০৭ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সস্ত্রীক গফুর শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গভীরভাবে ধর্মীয় সাধনায় মগ্ন হন।[২৫] গফুর শাহের সান্নিধ্যে থেকে তিনি সূফীতত্ত্বের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি আয়ত্ত করেন। পীরের খিদমতে তিনি বড়ই তৎপর ছিলেন। উল্লেখ্য, কামেল পীরের পায়রবী (সেবা শুশ্রূষা) করা সূফীদের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। জগতের স্মরণীয়-বরণীয় সূফীসাধকগণ অতি দৃঢ়তার সাথে এ কর্তব্য পালন করেছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) প্রথম জীবনেই সূফীতত্ত্বের সারকথা অবহিত হন। তিনি পরমাত্মাজ্ঞান লাভ করেন। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত স্মরণযোগ্য। তিনি বলেনঃ

> 'পরমাত্মা জ্ঞানের তিনটি মার্গ-জ্ঞানমার্গ, কর্ম্মমার্গ ও প্রেমমার্গ। দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানবল দ্বারা ঐশীজ্ঞান লাভ করে, কর্ম্মীপুরুষ সুকর্ম্ম দ্বারা তাহাকে লাভ করিতে চায়। আর প্রেমিক আত্মজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে প্রেমময়ে আত্মসমর্পন করে। তাহার নিকট প্রেমময়ই একমাত্র কাম্য, একমাত্র লভ্য, একমাত্র লক্ষ্য। প্রেমময়ের সন্তুষ্টিসাধনই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত। সমগ্র বিশ্ব লইয়া তাহার প্রেমের পরিধি বিস্তৃত হয়। তাহার প্রেম স্বজন, স্বশ্রেণী কিংবা মানবজাতি লইয়া সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহার দয়া সহানুভূতি সর্ব্বভূতে সমপরিমাণে ব্যাপ্ত থাকে। সে নির্জ্জীবেও অস্তিত্ব অনুভব করে। ভূমন্ডল

---

[২৪] প্রাগুক্ত।
[২৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

> অতিক্রম করিয়া নভোমন্ডল ও পাতালমন্ডল, এমন কি পরলোক পর্যন্ত প্রেমিকের আকর্ষণ বিস্তৃত। সে প্রত্যেক জড়ে ও অজড়ে প্রেমময়ের এহছান (কৃপা) প্রতিভাত দেখে, সে বিশ্বজগতে তাহারই পরিবেষ্টন লক্ষ্য করে। তিনি ব্যতীত কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। আমিত্বের জ্ঞান দূরীভূত হইয়া কেবল তাহারই জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। সে আত্মহারা হইয়া কেবল তাহারই অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে।'[২৬]

চট্টগ্রামে অবস্থান কালে আহ্ছানউল্লা (রঃ) এইভাবে প্রেমমার্গে উপনীত হন। প্রেমমার্গে উপনীত হয়ে তিনি স্রষ্টারই অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। ধর্মীয় সাধনায় তাঁর দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। এব্যাপারে তাঁর সহায়ক হন তাঁর দীক্ষাগুরু হজরত গফুর শাহ (রঃ)।

গুরুর দীক্ষাগুণে আহ্ছানউল্লা (রঃ) ধর্মীয় সাধনার বিভিন্ন স্তম্ভকে মজবুত করেন। ইসলামের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে কালেমা। বস্তুত এটাই প্রধান স্তম্ভ। সকলের আগে কালেমাতে বিশ্বাস স্থাপন করাই ইসলাম ধর্মের সারকথা। লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু-আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। এ হচ্ছে আল্লাহর একত্বে আস্থা রাখা। কেউ যতই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করুক না কেনো এই কালেমার বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত প্রকৃত ঈমানদার বা বিশ্বাসী হতে পারবে না। আহ্ছানউল্লা (রঃ) তাঁর ধর্মীয় সাধনায় এ বিশ্বাস রেখেছেন। তাই তাঁর উক্তিতে জানা যায়ঃ

> 'যে ব্যক্তি জগতের কার্য্যাবলীর মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও দখল দেখে না, সেই ব্যক্তিই একেশ্বরবাদী। আল্লাহতালার একত্বে বিশ্বাস করার নামই তাওহীদ এবং আল্লাহর উপর সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীয় ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করাই তাওয়াক্কোল।'[২৭]

---

[২৬] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ২য় খন্ড, আ.মি.পা. ট্রাষ্ট, ২য় সংস্করণ, জুলাই ২০০২, পৃঃ ১০৯।

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

এই তাওয়াক্কোল যার আছে, তিনি পূর্ন ঈমানের অধিকারী। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাস-স্থাপনকারী। তবে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে পূর্ণ বিশ্বাস না এলে কিছু লাভ হয় না। আহ্ছানউল্লা (রঃ) বলেনঃ

> 'খোদা যে একমাত্র প্রভু, এই জ্ঞান না হইলে নির্ভরতা আসেনা। যখন আমরা বুঝি তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা, তখনই তাহার উপর স্বতঃই নির্ভরতা আসে। মুখে খোদার একত্ব স্বীকার করিলে তাওয়াক্কোল জন্মে না। যিনি অন্তরের সহিত একত্ব মানিয়া লইয়াছেন কিংবা তাহা মোশাহেদা (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ) করিয়াছেন, তাহারই তাওয়াক্কোল সত্য ও প্রকৃত।[২৮]

বস্তুত আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর এ বক্তব্য অনস্বীকার্য। ধর্মীয় সাধনায় তাঁর দৃঢ় একেশ্বর-প্রত্যয় ছিল বলেই তিনি পীরে কামেল পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করতে পেরেছিলেন পীরত্বের দাবিদার না হয়েও। তাঁর ধর্মীয় সাধনার বিশেষত্ব এখানেই। তিনি নিয়মিত নামাজ, রোজা অন্যান্য ইবাদত, তাছবীহ, তাহলীল ইত্যাদির অভ্যাস করেন। নামাজ সম্পর্কে তাঁর অভিমত নিম্নরূপঃ

> 'যে ব্যক্তি দীনতা ও নম্রতার সহিত যথানিয়মে নামাজ আদায় করে তাহার নামাজ আরশ পর্যন্ত উত্থিত হয়। যে সকল অবস্থা মনকে বিচলিত করে, মিনতি ও দীনতা হইতে বিরত রাখে, সেই সকল অবস্থায় নামাজ পড়া মাকরূহ্। ভক্তি ও বিনয়ের সাথে নামাজ আদায় করিলে সে নামাজ পরলোকের পাথেয় স্বরূপ হয়। নামাজের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মনকে আল্লাহর সম্মুখে তন্ময়ভাবে নিমগ্ন রাখাই নামাজের জীবন।
>
> 'আকিমিছ ছালাত লেজেকরী; অর্থাৎ নামাজ পড় আমার স্মরণের জন্য। (ছুরা তা-হা, প্রথম রুকু, ১৪ আয়াত)। আল্লাহকে স্মরণ করাই নামাজের উদ্দেশ্য।

---

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

> মনকে তাহা হইতে দূরে রাখিলে নামাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়না। (হাদিছ-অধিকাংশ নামাজীর নামাজের ষষ্ঠাংশ বা দশমাংশ মাত্র গৃহীত হইয়া থাকে)। রাসূল (সাঃ) আরো ফরমাইয়াছেন, যে নামাজে মন আল্লাহর দিকে হাজির না হয়, সে নামাজের প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাতও করেন না। যে নামাজে মন সর্বদা আল্লাহর দিকে রুজু থাকে তাহাই পরলোকের পাথেয় স্বরূপ হয়।'[২৯]

নামাজের যথার্থ স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য এবং রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত এবং কোরআন-হাদীস সমর্থিত নীতিনির্দেশ তুলে ধরে আহ্ছানউল্লা (রঃ) স্বয়ং তাঁর ধর্মীয় সাধনার বিশেষত্ব প্রদর্শন করেছেন। আল-কোরআনের বিশেষ আয়াত উদ্ধৃত করে তিনি গভীর দর্শনজ্ঞানের পরিচয় রেখে গেছেন।

ইসলাম ধর্মের তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে 'রোজা'। রোজা বলতে সাধারণত দিবাভাগে পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা বুঝায়। তবে পানাহার বিরতি রোজার প্রাথমিক শর্ত। প্রকৃত রোজা হচ্ছে আত্ম-সংযম। এ সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বলেনঃ

> 'পান, আহার হইতে ক্ষান্ত হইলে রোজার সাধারণ বিধি পালিত হয়; এরূপ রোজা নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। যে রোজা কেবল ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তিকারক বস্তু হইতে বিকর্ষণ করে, তাহা মধ্য শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। সাধু মহাপুরুষদিগের রোজা সর্বোন্নত শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। তাঁহাদের অন্তর একমাত্র আল্লাহর চিন্তায় নিমগ্ন থাকে এবং মন সর্বতোভাবে তাঁহাতেই উৎসর্গীকৃত হয়। লোভ ও কামনাকে দূর করে হৃদয়কে পবিত্র রাখাই রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য।'[৩০]

---

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২।

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

রোজার যথার্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ধর্মীয় সাধনার আর একটি বিশেষত্ব। তিনি নিজে নিখুঁত ভাবে নামাজ-রোজা পালন করেছেন এবং শিষ্যদেরকেও প্রকৃত নামাজ-রোজা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছেন।

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হজ্জ। তবে মক্কায় যাওয়া এবং আনুষ্ঠানিকতা পালন করলেই যে হজ্জ হয় তা নয়, হজ্জের বিশেষ তাৎপর্য আছে। আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ভাষায়ঃ

> 'হজ যাত্রা পরলোক যাত্রার অনুরূপ। হজ যাত্রার সময়ে পরিবারবর্গ ও বন্ধু-বান্ধব হইতে বিদায়, মৃত্যুকালের বিদায়স্বরূপ। এহরামের বস্ত্র কাফনের বস্ত্র সদৃশ। যেহেতু এই সময়ে সাংসারিক সকল চিন্তা, বন্ধন হইতে হৃদয়কে মুক্ত করিতে হয়। হজ-যাত্রার পূর্বে সাংসারিক মায়া ও পার্থিব চিন্তা হইতে হৃদয়কে পাক করিতে হয়। আরাফার দিন খোদা বান্দার উপর অবারিতভাবে অসীম করুণা বর্ষণ করেন এবং অসংখ্য কবিরা গোনাহ মার্জনা করেন। আরাফাতের ময়দান হাসরের ময়দান স্বরূপ। বাদশাহর দরবারে আসিয়া দীনহীন ব্যক্তি দুঃখ কাহিনী পেশ করে, সেইরূপ হজযাত্রী আরাফাতের ময়দানে পৌছিয়া আত্মনিবেদন করে।'[৩১]

এ বিষয়ে তিনি কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেনঃ

> 'নিশ্চয়ই মানব মন্ডলীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আদিগৃহ মক্কায় অবস্থিত। ইহা বিশ্বজগতের জন্য পবিত্র ও সুপথ প্রদর্শক। ইহাতে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ বর্তমান। (তথায়) মাকামে এবরাহিম অবস্থিত, যে কেহ তথায় প্রবেশ করিবে, সে নিরাপদ, প্রত্যেক মানবের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে কাবা গৃহে হজ্জ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যে প্রবাসের ভার বহন করিতে সমর্থ।'[৩২]

---

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯।

[৩২] আল কোরআন, ৪ঃ ৯৬-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

মক্কায় হজ্জ সমাপনান্তে মদীনায় হজরত মুহম্মদ (দঃ)এর রওজা জিয়ারত অতি পূণ্যময় কর্ম। হাদীসে উল্লিখিত হয়েছেঃ

> 'যে ব্যক্তি আমার কবর জেয়ারত করিবে, সে যেন আমাকে আমার জীবিত অবস্থায় দর্শন করিল।'[৩৩]

আহ্ছানউল্লা (রঃ) নিজে হজ্জব্রত পালন করেছিলেন। হজ্জের সুফল সম্পর্কে তিনি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে অনেক সুবক্তব্য পেশ করেছিলেন।

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ 'যাকাত'। যাকাত অর্থ পবিত্রকরন। উদ্বৃত্ত ধনের উপর শতকরা আড়াই টাকা দান করাকে যাকাত বলা হয়। জমিতে যে ফসল হয় অবস্থাভেদে তার দশ বা বিশ অংশ দান করাকেও যাকাত বলা হয়ে থাকে। তবে এর বিশেষ নাম 'ওশর'। এ ছাড়া পশুরও যাকাত দিতে হয়। দরিদ্র মুসলমানের অভাব দূর করাই যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য। মনে রাখা কর্তব্য যে, যাকাত গ্রহীতা ভিক্ষুক নয়, পূর্বোক্ত হিসেবে অর্থ-গ্রহণের অধিকারী। যাকাত সম্পর্কে আহ্ছানউল্লার নিজস্ব উক্তি এরূপঃ

> 'প্রত্যেক ধর্মে খয়রাতের বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু ইসলাম খয়রাতকে অবশ্যকর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছে। প্রত্যেক ধনী তাহার দরিদ্র প্রতিবেশী ভাইকে স্বীয় আয়ের অংশ হইতে নির্দিষ্ট হিসেবে যাকাত দিতে ধর্মত বাধ্য। সমস্ত মুসলমানকে একই পরিবারভুক্ত মনে করিয়া, প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তি অসচ্ছল ব্যক্তিকে সাহায্য করিবে; ইহাতে সমাজের দীনতা দূরীভূত হইবে ও ভ্রাতৃত্ব বর্ধিত করিবে।'[৩৪]

যাকাতরূপ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর বিশেষ বক্তব্য আছে। সে বক্তব্য সকলের জন্যেই মহান বাণী। আহ্ছানউল্লা (রঃ) বলেনঃ

---

[৩৩] আল-হাদীস।

[৩৪] খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

'তাছাওয়াফ মানুষের শ্রেণী বিভাগ করে না। যে ব্যক্তি ন্যায়বান সেই আল্লাহতালার নজরে অতি মহৎ। যে ব্যক্তি স্রষ্টা ও সৃষ্টের সন্তুষ্টি সাধন করে সেই-ই প্রকৃত ভক্ত। মানবসমাজে প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার রহিয়াছে। যে তাহার ভাইয়ের দাবী অগ্রাহ্য করে, সে মোছলেম নামে বাচ্য নহে। নিজে যেরূপ খাও, গোলামকেও সেইরূপ খাওয়াও, পরাও। আঁ-হজরত আদেশ করিয়াছেন-তুমি নিজের জন্য যাহা ভাল মনে কর, তোমার ভাইয়ের জন্যও তাহাই করিবে, অন্যথায় তুমি মোমেন বলিয়া গৃহীত হইবেনা।'[৩৫]

ধর্মের পাঁচ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথে আহ্ছানউল্লা (রঃ) ধর্মের চার অন্তর্নিহিত স্তরে সাধনা করেন। এই স্তর চারটি হচ্ছে শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত, মারিফত। এই চার স্তরে সাধনা করে যে জ্ঞান লাভ করেন, তা বর্ণিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে। তিনি একে একে এই চার স্তরে সাধনার পর্যায়ক্রমে বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেঃ

'শরীয়ত বলিতে বাহ্যিক আচার বিচার ও ব্যবহার বুঝায়।'[৩৬]

শরীয়ত হচ্ছে ধর্মের প্রাথমিক স্তর। বাহ্য আচরণ-বিধিমালা মানা শরীয়তের কাজ। তবে শরীয়তের গভীর তত্ত্ব আছে। আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর পূর্বসূরি মরমি কবি লালন শাহ বলেছেনঃ

'আগে শরিয়ত জান বুদ্ধি শান্ত করে।
শরিয়তের কাজ রোজা আর নামাজ
ঠিক শরিয়ত বলছো কারে।।
নামাজ রোজা হজ কলমা যাকাত
তাই করিলে কয় শরিয়ত

---

[৩৫] প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫৬।
[৩৬] প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

শরা অনুসারে ।

আমি ভাবে বুঝতে পাই

এসব আসল শরিয়ত নয়,

আরো কিছু অর্থ থাকতে পারে ।।

বে-এলেম বে-মুরিদ জনা

শরিয়তের আঁৎ-চেনে না,

মুখে তোড় ধরে ।

যদি চিনতো আঁৎ

ছাড়তো অদেখা নিয়াত

নিয়ত বাঁধতো না আর বর্জোখ ছেড়ে ।।

শরিয়তের গদ ভারি

যে যা করে সে ফল তারি

হবে আখেরে ।

লালন বলে মোর

বুদ্ধিহীন অন্তর

আমি মরি মূলে, লাগে ডালের পরে ।।'[৩৭]

এখানে শরীয়ত সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। শরীয়তের পরম অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন পদকর্তা। বাহ্যিক লোক দেখানো রোজা-নামাজে আসলে শরীয়ত পালন হয় কিনা, তাতে সন্দেহ আছে। নিস্কলুষ হৃদয় দিয়ে উপাসনা-উপবাস করতে হয়। আহ্ছানউল্লা (রঃ) ঠিক সেই কথাটিই বলেছেন। তিনি বলেনঃ

---

[৩৭] মুহম্মদ আবু তালিব,লালন শাহ ও লালন গীতিকা,দ্বিতীয় খন্ড,প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮, পৃঃ ৭-৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

'যাহার হৃদয় কলুষিত ও পাপ-পঙ্কিল তাহার এবাদত বাহ্যিক, অন্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। এরূপ বাহ্যিক এবাদতে শান্তি ও আনন্দ লাভ হয় না। যে সাংসারিক মোহে মুগ্ধ, তাহার এবাদত বাহ্যিক।'[৩৮]

এ সম্পর্কে রাসূল করিম (দঃ) বলেনঃ

'যে ব্যক্তি পরকালের প্রেমে মজিল, দুনিয়া তাহাকে ত্যাগ করিল; আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার মোহময় পথে অগ্রসর হইল, সে পরকাল হইতে চিরবঞ্চিত রহিল।'[৩৯]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এ কথারই ব্যাখ্যা দিয়েছেন একটু অন্যভাবে। তাঁর ভাষায়ঃ

'বাহ্যতঃ যাহারা সংসারে লিপ্ত থাকিয়া হৃদয় ও মনকে সংসারের লোভ ও মোহ হইতে অনাকৃষ্ট করিতে পারে, তাহারাই প্রকৃত সংসার বিরাগী এবং তাহাদের এবাদত প্রকৃতই মূল্যবান ও ফলপ্রদ।'[৪০]

অর্থাৎ শরীয়ত পালন খুব তুচ্ছ বিষয় নয়। শরীয়ত পালনের গভীর তাৎপর্য আছে।

শরীয়তের ঠিক পরের স্তর হচ্ছে তরীকত। 'শরা' شرع থেকে শরীয়ত এবং তরীক طريق থেকে তরীকত ব্যুৎপন্ন। শরা' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিধান, খবর, বয়ান এবং তর্‌ক্ শব্দের অর্থ পথ বা রাস্তা। শরা' থেকে শরীয়ত-যেখানে এসে শরা'র খবর লিপিবদ্ধ হলো এবং তরক থেকে তরীকত-যেখানে এসে সেই লিপিবদ্ধতা কর্মে পরিণত হলো। তা হলে দেখা যায়, উভয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। শরীয়ত হলো 'খবর' এবং তরীকত হলো 'বাহক'। কাজেই বাহক ব্যতীত খবর পৌঁছানো যায় না। তা হলে তরীকতকে আর অবহেলা করা যায় না। এখন শরার খবর যা শরীয়তে লিপিবদ্ধ হলো তার সম্মান দিতে গেলে বা মর্যাদা রক্ষা করতে

---

[৩৮] খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১।

[৩৯] আল-হাদীস।

[৪০] খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

গেলে বা পুষ্টিসাধন করতে গেলে বিনা বাক্যব্যয়ে সকলকে তরীকতে আসতে হবে। তরীকতে না এলে যে শরীয়তকে অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং বিকলাঙ্গ করা হয় এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে।[৪১] আহ্ছানউল্লা (রঃ) তরীকত সম্পর্কে খুব পরিস্কার মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায়- 'তরীকত হৃদয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট'।[৪২] তরীকতে পৌঁছানো এবং তরীকতে অবস্থান করে যে সাধনা করতে হয়, তার জন্যে অধ্যাত্মবিদ্যা অর্জন অতি জরুরি। এই অধ্যাত্মবিদ্যা আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ভাষায়ঃ

> 'এলেমে তরীকত-যাহা রূহ ও নফছ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতঃ আল্লাহ তায়ালার ছেফাত বা গুনাবলীর কথঞ্চিৎ অধিকারী হওয়া যায়। এই শিক্ষা কামেল মুর্শিদ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহার জন্য বাহ্যিক বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যক হয়না। ইহার দ্বারা শিক্ষার্থী বাহ্যিক চক্ষু ব্যতীত দর্শন লাভ এবং বাহ্যিক কর্ণ ব্যতীত শ্রবণ শক্তি অর্জন করিতে পারে।'[৪৩]

তরীকতের পরের আলোচ্য হাকীকতঃ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) হাকীকত সম্বন্ধে বলেনঃ

> 'আকায়েদ ও শরীয়ত লইয়া যে ইসলাম পূর্ণ হয়, তাহা নহে, উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া হাকীকতের অনুসন্ধান করাই ইছলামের মূখ্য উদ্দেশ্য। হাকীকত জানিবার জন্য এলমে ছফিনা যথেষ্ট নহে। শরীয়ত দ্বারা জমি প্রস্তুত হয়। কিন্তু কেবল জমি প্রস্তুত হইলেই বাগিচা ফল ফুলে শোভিত হয় না। উহাতে কেবল উর্ব্বরতা উৎপন্ন হয়। যে পর্যন্ত 'কলব' তমসাচ্ছন্ন থাকে, সে

---

[৪১] রকীব শাহ, মিনহাজুল আরেফীন, প্রথম প্রকাশ, বনবীথি প্রকাশনী, ঢাকা,১৯৯০, পৃঃ ২০২-২০৩।

[৪২] খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫১।

[৪৩] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, নবম খন্ড, ঢাকা, আ.মি.পা. ট্রাস্ট, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৫ পৃঃ ২৮১।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত উহাতে বিদ্যা রশ্মি সহজে প্রতিফলিত হয় না। শরিয়ত 'পরস্ত' হইলে মোছলেমগণ এলমে হাকিকি অর্জ্জন করিবার সহজ পথ অনুসরণ করিতে পারে। তখন তাহার প্রবৃত্তিগুলির উপর প্রভুত্ব জন্মে এবং যদৃচ্ছা উহাদিগকে চালনা করিতে পারে। যখন উহাদের উপর মানবের পূর্ণ ক্ষমতা জন্মে, যখন নফছকে মানুষ সহজে দমন করিতে শিখে, তখন সে একত্বের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। এনছান ও নফছের মধ্যে চিরশত্রুতা। যিনি এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত মোছলেম। যিনি নফছকে যত অধিক পরিমাণে শাসন করিতে সমর্থ হন, তিনি ততই খোদা তায়ালার পেয়ারা হন। কেবলমাত্র এশ্‌কই মানুষকে হাকিকতে পৌঁছাইতে পারে।[৪৪]

হাকীকত সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (রঃ) যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই মূল্যবান। বস্তুত হাকীকতে দাখিল হতে হলে এশ্‌ক প্রয়োজন তা উপরোক্ত বক্তব্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এশ্‌ক ছাড়া 'এলম' ও দরকার। একে এলমে হাকীকত বলা হয়ে থাকে। আহ্‌ছানউল্লা (রঃ) বলেনঃ

'ইহার দ্বারা (এলম দ্বারা) খোদার শানাছায়ি (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ হয়। এই এলম দ্বারা ছালেক (শিক্ষার্থী) খোদা রাব্বুল আলামিন হইতে তাঁহার (রাব্বুল আলামিনের) গুনাবলী জ্ঞাত হইতে পারেন এবং বিনা অছিলায় স্বয়ং রায়ে-এলাহি বুঝিতে পারেন-যাহাকে এলম লাদুন্নি বলা হয়।'[৪৫]

অর্থাৎ শরীয়ত থেকে তরীকতে এবং তরীকত থেকে হাকীকতে উন্নীত হতে হলে যে এলম বা বিদ্যা দরকার, তা হচ্ছে এলমে লাদুন্নি। একে 'অধ্যাত্ম বিদ্যা' বলা যায়।

বস্তুত হাকীকত এমন এক স্তর যেখানে সাধক তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যান। স্রষ্টার নৈকট্য লাভে সমর্থ হন। আহ্‌ছানউল্লা (রঃ) এই স্তরে অনেক উচু অবস্থানে

[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১।

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮১।

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছেছিলেন বলে ধারণা করা যায়। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্য পর্যালোচনা করলে এ রকম উপলব্ধিই মনে আসে।

শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত- এ তিন স্তরের সাধনার বর্ণনা দেয়ার পর মারিফাত স্তরের কথা বলা আবশ্যক। বস্তুত এটি ধর্ম সাধনার সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। 'মারিফাত' অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। অর্থাৎ কোন বস্তুর আসল ভেদ। এ প্রসঙ্গে খানবাহাদুর (রঃ) বলেনঃ

> 'মোট কথা, হকিকতে আসিয়া পথের ভেদ এবং সত্য রূপে পথের সঙ্গে পরিচয় করিতে পারিলেন এবং আপনার নিকট যাহা পূর্বে শরার দ্বারা বয়ান হইয়াছিল ইহার অকাট্য সত্যতা উপলব্ধি করিয়া ঘাটায় আসিয়া পৌঁছালেন এবং সেই খবর অনুযায়ী পরিচয় লাভ হইল অর্থাৎ দর্শন হইল এবং এখানে আসিয়া হাঁটার পথ শেষ হইল আর শরার বর্নিত বিষয় বস্তুর শেষ মিমাংসা হইল। ইহাই হইল মারিফাত। অর্থাৎ মারিফাতে আসিয়া সকল প্রকার খবর শনাক্ত হইল।'[৪৬]

মারিফাতে পৌঁছিলে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির অপূর্ব কৌশল ও কারিগরি দর্শন করে আল্লাহ তায়ালার ফয়েজ ও রহমত লাভ করে ধ্যানে মশগুল হয়ে থাকে তত্ত্বজ্ঞানী। এই তত্ত্বজ্ঞানী তখন মারিফাতে অবস্থান করেন। বন্দেগী করতে করতে অনেক উর্ধ্বে উঠে যান। এ অবস্থাকে বলাহয় ফানাপ্রাপ্তি। 'ফানা' শব্দের অর্থ বিসর্জন নয়। স্বীয় অস্তিত্বকে ভুলে যাবার নামই ফানা। ছূফী মারিফাত স্তরে ঃ

> 'স্বীয় হাস্তি ভুলিয়া প্রভূর স্মৃতিতে এইরূপ ভাবে আসক্ত, মিলিত বা গ্রস্ত হয় যে, স্বীয় অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। তাহার স্বীয় সত্তার জ্ঞান বিদ্যমান থাকে না, সে সেই থাকে বটে কিন্তু তাহার আত্মজ্ঞান থাকে না। সর্বত্রই প্রভুরই সত্ত্বা

---

[৪৬] রকীব শাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

দেখিতে পায়। সে মাবুদের অস্তিত্বের মধ্যে আপনাকে দেখিতে থাকে। তাহার নিকট স্বীয় অস্তিত্ব লুপ্ত হয় এবং মাবুদের অস্তিত্বই জ্ঞানগোচর হয়।'[৪৭]

মারিফাতে দাখিলপ্রাপ্ত সাধক স্বীয় জ্ঞানকে ফানা করে স্থায়ী জ্ঞানে ডুবে যায়, আত্মিকজ্ঞান লুপ্ত হয়ে পরমাত্মাজ্ঞান জেগে উঠে। এই অবস্থায় আবেদ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর জ্ঞান রাখে না। মারিফাত স্তরের বাস্তব অবস্থা আহ্ছানউল্লা (রঃ) এভাবেই বর্ণনা করেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ধর্মীয় সাধনার চার স্তরে সঠিকভাবে সাধনা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে শিষ্যদের প্রতি তাঁর উপদেশবানী এবং আদেশ-নিষেধের ধারা লক্ষ্য করলে তা বুঝা যায়। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, ইসলামের স্তর চারটি-শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত, মারিফাত। বিশুদ্ধ অনুষ্ঠানের নাম শরীয়ত; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তরীকতে, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা হকীকতে, এবং প্রেমোৎকর্ষ দ্বারা মারিফাতে উপনীত হওয়া যায়। শেষ স্তরেই প্রেমময়ের নৈকট্য বা কোরবত লাভ হয়। এরই নাম তাওহীদ।

খানবাহাদুর (রঃ) উপরোক্ত চার বিষয়ের পারদর্শী পীরের মুরিদ ছিলেন। তাঁর মুর্শিদ বা পীরের নাম হজরত গফুর শাহ (রঃ)। গফুর শাহে (রঃ)এর আসল নাম শাহ্ ছূফী ছৈয়দ হাবিব আহমদ (রঃ)। গফুর শাহ্ (রঃ) এবং আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর মুরিদ হওয়া (শিষ্যত্ব গ্রহণ) সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, গফুর শাহ (রঃ) ছিলেন হজরত শাহ ছূফী ওয়ারেছ আলী (রঃ) নামক এক সিদ্ধ সাধকের শিষ্য। এই সাধক কাদরিয়া তরীকার অনুসারি দরবেশ ছিলেন। ফলে আহ্ছানউল্লা (রঃ) যথার্থ খান্দানি পীরের মুরিদ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উক্তি স্মরণ করা যায়। তিনি বলেনঃ

---

[৪৭] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ২য় খন্ড, আ.মি.পা.ট্রাষ্ট, ২য় সংস্করণ, জুলাই ২০০২, পৃঃ ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

'হজরত শাহ সুফী ওয়ারেছ আলী রহমাতুল্লাহ আলায়হে তরিকত জগতের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। ইনি ছিলেন মাদার-জাত অলি। এই মহাপুরুষ হজরত ছৈয়দ এমাম হোছায়েন (রাঃ) এর বংশ-সম্ভবত পীরানের-পীর দস্তগীর গওছে ছাকালায়েন হজরত ছৈয়দ মহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর কাদরিয়া ছেলছেলাভুক্ত। অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় ইহার জন্মের পূর্বে বহু ভবিষ্যদ্বানী প্রচারিত হইয়াছিল। ১২৩৮ হিজরীতে (১৮১৮ খ্রি) এই স্বনামধন্য মহাপুরুষ বড় বাঁকী জেলার অন্তর্গত দেওয়া শরীফ নামক কসবাতে একটি প্রাচীন উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন আশেককুলের শিরোমণি, ওয়ার্ছি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, আখেরী নবীর পূর্ণ তাবেদার ও হজরত ইসা আলায়হেছছালামের ছুন্নাতের পায়বন্দ ও তাওহীদ বাগিচার বুলবুল।'[৪৮]

40356/

এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, আহছানউল্লা (রঃ) প্রকৃতই খান্দানি পীরের (মুর্শিদের) শিষ্য ছিলেন। তাঁর দাদা পীর শুধু খান্দান অনুসারী সাধকই ছিলেন না, একটি ঘরানারও স্রষ্টা ছিলেন। আর সেটি 'ওয়ার্ছি সম্প্রদায়' নামে খ্যাত। আহ্ছানউল্লা (রঃ) ধর্মীয় সাধনায় ব্রতী হবার জন্যে কিভাবে হজরত গফুর শাহে (রঃ)এর শিষ্য হয়েছিলেন, তা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষণে আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর পীর-কেবলা গফুর শাহ (রঃ) কিভাবে হজরত ওয়ারেছ আলী (রঃ)এর বায়আ'ত গ্রহণ (শিষ্যত্ব গ্রহণ) করেন, তার বর্ণনা আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ভাষায়ঃ

'হুজুর আকদাছের বেছাল শরীফের অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে আমার পীর ও মুর্শিদ হজরত ছৈয়দ গফুর শাহ আল্-হোচ্ছামি আল-ওয়ার্ছি-যিনি ইতিপূর্ব্বে

---

[৪৮] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, আ.মি.পা. ট্রাস্ট, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, পৃঃ ৪২৩।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ছৈয়দ হাবিব আহমদ নামে পরিচিত ছিলেন, হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তখন তাহার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি আলিগড়ে পাঠাভ্যাস করিতেছেন হঠাৎ তাহার উপর বাশারাত (ঐশী ইঙ্গিত) হয়, যাহার ফলে তিনি এক শুভ মুহূর্তে সমস্ত পুস্তকাদি অগ্নিসাৎ করত নগ্নপদে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন হযরত আকদাছের পদাশ্রয় নিতে। তিনি ছিলেন ভারত বিখ্যাত স্যার আলী ইমাম ছাহেবের ঘনিষ্ট বংশজ। পাটনা জেলার অন্তর্গত করাইপারসরাই ইহার জন্মভূমি। হজরত আকদাছ ইহাকে একায়েক ফকিরি এনায়েত করেন।'[৪৯]

এভাবে আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর পীর ও মুর্শিদ হজরত গফুর শাহ (রঃ)এর দীক্ষা ও বায়আ'ত গ্রহণ সম্পন্ন হয়। মোটকথা, আহ্ছানউল্লা (রঃ) পীর-পরম্পরায় কাদরিয়া তরীকাভূক্ত সাধক। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ধর্মীয় সাধনায় খাঁটি মুসলমান ছিলেন, বিশুদ্ধ ছূফী ছিলেন এবং খান্দানি পীর ছিলেন। কিন্তু তাই বলে অজ্ঞ মুসলিম সমাজে প্রচলিত পীর ব্যবসার সাথে তাঁর কোন সংশ্রব ছিল না। এমন কি কোনো ধর্মীয় অহমিকা তাঁর হৃদয়ে ছিল, এমন কথা কেউ বলতে পারে না। স্রষ্টা এবং ধর্ম সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও উদার মনোভাব পোষণ করতেন তিনি। এজন্যে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন, তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ পর্যায়ের গ্রন্থাবলির মধ্যে সংসার-বিরাগী প্রেমিক ও প্রধান প্রধান অলি আল্লাহগণের উপদেশসমূহ ও মহাপুরুষগণের পরামর্শ বিষয়ক অমীয় বানী সম্বলিত গ্রন্থ 'মহাপুরুষের অমীয় বাণী', 'কোরআনের কতিপয় বাণী' এবং 'হজরত মোহাম্মদ', 'হজরত হাজী ওয়ারেজ আলী শাহ', 'মহাত্মা শ্রী রামকৃষ্ণ', 'স্বামী বিবেকানন্দ' প্রমুখ ধর্মগুরুর উক্তি সম্বলিত গ্রন্থ 'ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি' এবং বিভিন্ন ধর্ম, ধর্মগুরুদের জীবন ও উপদেশাবলী সম্বলিত গ্রন্থ 'বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

[৪৯] প্রাগুক্ত পৃঃ ৪২৫।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্ছানউল্লা (রঃ) ধর্মীয় চিন্তাচেতনায় এতই উদার ছিলেন যে, ঐশী প্রেমে উদ্বুদ্ধ কোনো মানুষ দেখলে তিনি তাকে সমাদর করতেন। মানুষের জাত, ধর্ম বা বংশ-পরিচয় নিয়ে চিন্তা করতেন না। জাত ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে তিনি ভালবাসতেন। ধর্মীয় সাধনায় সিদ্ধপুরুষ আহ্ছানউল্লা (রঃ) ছিলেন একেবারে অসাম্প্রদায়িক। জীবন স্মৃতিতে তিনি উল্লেখ করেছেন-'আমার হেডক্লার্ক চন্দ্রনাথ ছিলেন বিনয়ের আধার। তাঁরই আমন্ত্রণে একবার আশ্রমে যাইবার সুযোগ পাই।'[৫০] এ বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, তিনি পার্থক্য ও জাতি বিভেদের উর্ধ্বে ছিলেন। আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ধর্মীয় চিন্তাচেতনার এ এক বিশেষত্ব।

'বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী' গ্রন্থে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) হজরত নবীয়ে করীম(স.) সহ হজরত ওয়ারেছ আলী শাহ, যরথুস্ত্র, তীর্থঙ্কর মহাবীর, কনফুসিয়াস, বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিষ্ট, শ্রী শঙ্করাচার্য, শ্রী রামানুজানচার্য্য, গুরুনানক, শ্রী চৈতন্য দেব, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী শ্রী সারদামণি দেবী প্রমুখ ধর্মগুরুদের জীবনী ও উপদেশাবলী এবং ইসলাম ধর্মের ব্যাপকতা, কোরআনের বাণী, সৃষ্টি-কৌশল ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন। উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি আরো লেখেন ঃ

> 'স্রষ্টা দয়ার সাগর রহমানুর রহিম। তিনি যুগে যুগে ভ্রান্ত মানবকুলের পথ নির্দেশের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পথ-প্রদর্শক প্রেরণ করেছেন। কাজেই কোন জাতিকে, কোন সম্প্রদায়কে, কোন ধর্মকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়। স্রষ্টার উদ্দেশ্য চিরকালের জন্য একই। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য কিরূপে মানব তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে জগতের বুকে তাঁরই মাহাত্ম্য প্রচার করবে।'[৫১]

---

[৫০] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃঃ ৩০।

[৫১] প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী, মুখবন্ধের শেষাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

জগতের বিভিন্ন ধর্মগুরু সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর এই মনোভাব সত্যি প্রশংসনীয়। এ সকল ধর্মগুরুর জীবনী আলোচনায় তিনি কোথাও কোনো সংকীর্ণতার পরিচয় দেননি। ধর্ম-গুরুদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, তাঁদের জীবন যাপন এবং ধর্মীয় উপদেশাবলী যথাযথ ও নির্ভরযোগ্যভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ধর্মগুরুদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং অনুসারীদের প্রতি তাঁদের উপদেশাবলী বর্ণনায় আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর উদারতার পরিচয় সর্বত্র বিধৃত হয়েছে, বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মগুরু সম্পর্কিত তাঁর তুলনামূলক বিশ্লেষণটি এখানে উদ্ধৃত করা যায়ঃ

> 'জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই মূলনীতি এক। প্রত্যেক ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলে; 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিয়াছে ঈশ্বর।' ইসলাম ধর্ম্ম বলে, 'সৃষ্টের সেবাই স্রষ্টার সেবা। যেহেতু সৃষ্টের মধ্যে স্রষ্টার রূহ বিদ্যমান।' পার্সিক ধর্ম্ম বলে, 'পরদুঃখকারী ব্যক্তিই স্রষ্টার প্রিয়পাত্র।' খ্রিষ্ট ধর্ম্ম বলে, 'যারা সবার শান্তি কামনা করে, তাঁরাই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান' ইত্যাদি। প্রত্যেক ধর্ম্মের মূখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে স্রষ্টার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভ করিতে হইলে উপাসনারও প্রয়োজন। প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মে উপাসনার নির্দেশ আছে। কিন্তু উপাসনার ধারা বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্ন রকম, কেহ সাকার উপাসনা করেন, কেহ নিরাকার উপাসনা করেন। পার্সিকেরা অগ্নির মাধ্যমে পূজা করিয়া থাকেন। পার্সিক ধর্ম বলে যে, পার্সিকেরা অগ্নিকে পূজা করে না। ঈশ্বরকে পূজা করে অগিন্ন মাধ্যমে। হিন্দু ধর্ম্ম মূর্ত্তির মাধ্যমে পূজা করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, তাঁহারা মূর্ত্তিকে পূজা করেন না। মূর্ত্তিকে সামনে রাখিয়া পরমেশ্বরকে ধ্যানে পূজা করিয়া থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব নৃত্য করে উচ্চঃস্বরে হরিনাম গাইয়া ঈশ্বরের পূজা করেন। চৈতন্যদেব বলেন, ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর হইয়া নৃত্য করতঃ উচ্চৈঃস্বরে চোখের জল দিয়া হরিকে ডাকিলে তাঁর সন্ধান মিলে। ইসলাম ধর্ম্ম বলে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টের Direct সম্বন্ধ। উপাসনার সময় ঈশ্বরকে হাজের নাজের মনে করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। অন্যান্য ধর্ম্মে ধ্যান করিবার প্রথা আছে। ইসলাম ধর্ম্মেও আছে মোরাকেবা। মোরাকেবার সময় চোখটি বন্ধ করিয়া, নিস্পন্দ হইয়া মনে করিতে হইবে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তাহার সামনে আসীন আছেন। তখন আল্লাহ্‌তে ও আশেকেতে কোন তফাৎ থাকিবে না। আশেক ক্ষণেকের জন্য নিজের হাস্তিজ্ঞান লুপ্ত করিয়া মহাপ্রভুর সাথে মিশে এক হইয়া যাইবে। ইসলাম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। প্রত্যেক কালের প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে। ইসলামে কোন গোড়ামী নেই। পৃথিবীর বড় বড় মনীষীরা ইসলামকে অনেক উচ্চস্থান দিয়াছেন। গুরু নানক ইসলাম ধর্ম্মকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন ও দাড়ি রাখিতেন। ইসলামী কানুন মানিতেন। রাজা রামমোহন রায় কোরআন তেলাওয়াত করিতেন। ইসলাম আল্লাহ্‌র খাস মনোনীত পূর্ণত্বপ্রাপ্ত ধর্ম্ম। আল্লাহ্‌ তাহার পাক কোরআনে বলিয়াছেন যে,'হে মোহাম্মদ, ইসলামকে তোমার জন্য পূর্ণ করিয়া দিলাম'। ইসলাম জগতের বুকে আসিয়াছে এক মহাসম্পদ আল-কোরআন নিয়া। আল্লাহ্‌র কোরআন আর তাহার রাছুলের বাণী-সমগ্র কালের সমগ্র জগতবাসীর কল্যাণকর।'[৫২]

খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (রঃ)এর ধর্মীয় সাধনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এইখানে যে, সকল ধর্মের মর্মবাণীর মধ্যে একটি ঐক্য তিনি দেখতে চেয়েছেন। সেই ঐক্যের প্রেক্ষাপটে

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর নিজধর্ম ইসলামের মৌল বক্তব্যকে, অসাম্প্রদায়িক ইসলামী মতবাদকে এবং সর্বোপরি তাছাওউফ তত্ত্বকে তুলে ধরে ধর্মের শান্তি ও সান্তনার দিকটিকে তিনি প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেনঃ

> 'ছুরা ফাতেহার মাহাত্ম্য মানুষ সারা জীবন চিন্তা করিলেও পূর্ণ অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে না। আল্লাহতায়ালার জ্ঞান অসীম এবং মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আল্লাহর অসীম জ্ঞানের বিন্দুমাত্র ধারণা সসীম মানবের পক্ষে সম্ভবপর নয়।
>
> ছুরা ফাতেহা বজ্রনাদে ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্তায়ালা 'রাব্বুল আলামীন','রহমানুর রহীম' এবং 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন'। সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার করুণা ও মাহাত্ম্যের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অগণিত আলম বা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক। কোরআনের এই উক্তি বিজ্ঞানও সমর্থন করে। বিজ্ঞানের উক্তি-শূন্যমন্ডলে বিশ লক্ষ জগৎ বিদ্যমান.....
>
> বিজ্ঞান বলেঃ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঘুরিতেছে। সূর্য্য স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে এবং গ্রহগুলিও স্ব স্ব মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে। আবার সূর্য্য তাহার গ্রহ উপগ্রহসহ শূন্যমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে।'[৫৩]

তাঁর ধর্মীয় সাধনার এও এক বিশেষত্ব। ধর্মের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে। আবার ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান-অর্জন ছাড়া ধর্মের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করা এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও অনুরাগ সৃষ্টি করা সহজ সাধ্য নয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এ দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ইসলাম ধর্মের

---

[৫৩] প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৯-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

বিধি-বিধান সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। গতানুগতিক ধর্ম-পরিচিতি প্রদান করাই তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, ধর্মের প্রতি, আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও অনুরাগ সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য আমরা লক্ষ্য করি, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিধি-বিধানকে তিনি ঐতিহাসিক, সামাজিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন, একটি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য সত্যের উপর এ সকল বিষয়কে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো পাঠ করলে মানুষের মনে ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে।

ইতঃপূর্বে তরীকত সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। তবুও আবার বলতে হয়, লেখক এ গ্রন্থে শরীয়ত ও তরীকতকে ইসলামের দুটি অঙ্গ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। শরীয়ত হচ্ছে বহিরঙ্গ আর তরীকত হচ্ছে অন্তরঙ্গ। দেহের সাথে রূহের যে সম্বন্ধ, শরীয়তের সাথে তরীকতের সেই সম্বন্ধ। মানবজীবনে উভয়ই আবশ্যক। শরীয়তের বিধান প্রত্যেকেরই পালনীয়। শরীয়ত ছাড়া তরীকত অসম্পূর্ণ। রূহের উন্নতির জন্য তরীকত আবশ্যক। তরীকত সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

> 'যিনি আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে চান, যিনি খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভ করিতে চান, যিনি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার দিব্যমানতা উপলব্ধি করিতে চান, ইহলোকে পরলোকের স্বাদ গ্রহণ করিতে চান, যিনি এবাদতে তন্ময়তা লাভ করিতে চান, তাহার জন্য তরীকত অপরিহার্য্য। .....শুষ্ক শরীয়ত প্রেমিককে প্রেমময়ে লীন করিতে অক্ষম। যতক্ষণ দুনিয়াদারী খেয়ানত প্রবল থাকে, ততক্ষণ তরীকতে অগ্রসর হওয়া যায় না, যতই রূহ প্রবৃত্তিকে জয় করিতে সমর্থ হয়, ততই তরীকতের আনন্দ উপলব্ধি হয়।'[৫৪]

---

[৫৪] প্রাগুক্ত, তরীকত শিক্ষা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২, পৃঃ ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ধর্মীয় সাধনায় তরীকতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। তরীকত জগতে তাঁর গভীর আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। শরীয়ত এবং তরীকতে দৃঢ়পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ধর্মের নামে ভন্ডামি, রিয়া বা লোক দেখানো ভাব ছিল না তাঁর ধর্মীয় সাধনায়। তাঁর চরিত্র ছিল অতি মধুর ও পরিষ্কার। মানবতাই তাঁর চরিত্রের ধর্মীয়বোধের প্রাণকেন্দ্র। মানবপ্রেমই তাঁর ধর্মীয় আচরণের প্রধান অঙ্গ। প্রকৃত ধর্ম যে কেবল বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মে বা আচার অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়, এ যে বাহ্যিক আবরণে সীমিত নয়, মানবতার সেবায় তথা সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত মনুষ্যত্ব বোধের উজ্জীবনই যে প্রকৃত ধর্মবোধের ফলশ্রুতি-এ কথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তা নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মহাকবি শেখ সাদী বলেছেন যে, 'তরীকত জুজে খেদমতে খালক নিস্ত', সৃষ্টির সেবা ছাড়া এ ধরায় কোনো ধর্মের পথ নেই। এ কথা আহ্ছানউল্লা (রঃ) মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্ম কেবল বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়, ধর্ম মানবকল্যাণে, ধর্ম জীবসেবায়। এ পূত ধর্মীয় বাণীকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ জীবনকেই প্রকৃত জীবন বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।[৫৫] তাঁর কাছে সবার উপর মানুষ সত্য আর এটাই তাঁর জীবনদর্শন ও ধর্মীয় সাধনার সর্বশেষ বিশেষত্ব।

তাঁর মানবকল্যানব্রত ছিল তাঁর জীবনদর্শনের অপর পীঠ। সমস্ত কর্মের মধ্যে তিনি চেয়েছিলেন স্রষ্টার সন্তুষ্টি, তা যদি সত্য হয় এবং তা যথেষ্ট সত্য তবে তাঁর মানবকল্যাণ কর্মসূচির স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মানুষের দুঃখবেদনা বিমোচন ছিল তাঁর সাধনার অঙ্গ। তিনি বলেছেনঃ

> 'মানুষ বেশ জানে যে দারিদ্র্য, ব্যাধি, আত্মীয় বিয়োগ, জ্বরা, মৃত্যু, ভাগ্যবিপর্যয় ইত্যাদি নিবারণ তাহার অসাধ্য, অথচ এইগুলিই আবহমানকাল হইতে সমাজে এবং রাষ্ট্রে প্রবল অসন্তোষের তরঙ্গ উত্থিত করিয়া জগতটাকে

---

[৫৫] গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারকগ্রন্থ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯০,পৃঃ ২১।

Dhaka University Institutional Repository

কারাগার অপেক্ষাও ভয়াবহ করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল অপরিহার্য্য বিপৎপাতকে সহনীয় এবং ভোগ্য করিবার জন্য কোন ধারাবাহিক চেষ্টা এযাবৎ দৃষ্ট হইতেছে না। পরন্তু ইহা নিরাকরণের পন্থা আবিষ্কার জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে আদৌ সম্ভব নয়। তাই মানুষকে জড়ের অতীত অজড়ে, স্থূলের অতীত সূক্ষ্মে, কার্য্যের অতীত কারণে, অহমিকা জ্ঞানের অতীত পরমজ্ঞানে, তর্কের অতীত বিশ্বাস ও ভক্তিমার্গে লইয়া উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।'[৫৬]

আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর জীবনে শিক্ষার আলোক পরিপূর্ণভাবেই এসেছিল। তাঁর শিক্ষাজীবন কাল (১৮৭৩-১৮৯৫খ্রিঃ)। একালে বাঙালি মুসলমান সমাজ শিক্ষারক্ষেত্রে নিদারুণ অনগ্রসর ছিল। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সমগ্র চাকরিজীবন কেটেছে শিক্ষা বিভাগে। এখানে তিনি শিক্ষা উন্নয়ন ও শিক্ষা সংস্কারে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর সেই সংস্কার কর্মসূচির পরিচয় নিম্নোক্তভাবে দেয়া যায়ঃ

১. তিনি পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখা রহিত করে ক্রমিক নম্বর লেখার ব্যবস্থা করেন।

২. তৎকালে মাদ্রাসা পাস ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হতে পারতো না। তিনি তাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করেন।

৩. কোন স্কুল কলেজে সে সময়ে মৌলভীর পদ ছিলনা, তিনি সর্বত্রই মৌলভী পদ সৃষ্টি করেন এবং পন্ডিত ও মৌলভীর বেতনের পার্থক্য দূর করেন।

৪. সংস্কৃতের মত উর্দুকেও তিনি ক্লাসিক্যাল ল্যাংগুয়েজ-এর মধ্যে গণ্য করেন।

৫. তাঁরই প্রচেষ্টায়, মুসলমান ছাত্রদের জন্য কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

[৫৬] গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৮৮,১ম খন্ড,ভক্তের পত্র, পৃঃ ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬. তাঁর উদ্যোগে বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসলিম হাইস্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোলকাতার বেকার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, মুসলিম ইনস্টিটিউট তাঁর অবদানের সাক্ষ্য বহন করছে।

৭. তিনি স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করেন এবং মক্তব, মাদ্রাসার জন্য মুসলমান লেখকদের পুস্তক ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করেন। ফলে মুসলমান লেখক ও প্রকাশকদের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৮. মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ধারা নির্দিষ্ট হয় এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর তত্ত্বাবধানে সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এই বৃত্তি বন্টন করা হয়। বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য মুসলমান ছাত্রদের সরকারি বৃত্তি প্রাপ্তির পথ সুগম হয়।

৯. টেক্সট বুক কমিটিতে তিনি মুসলমান সদস্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। মুসলমান পরীক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক কর্মচারীর সংখ্যা নির্ধারণ, ট্রেনিং কলেজে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা, স্কুল কলেজের পরিচালনা পর্ষদে মুসলমানদের সংখ্যা নির্ধারণে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

১০.তাঁর প্রচেষ্টায় নিউস্কিম মাদ্রাসা সৃষ্টি হয়; হাইস্কুলে আরবী দ্বিতীয় ভাষা রূপে গৃহীত হয়।

১১. মুসলমান ছাত্রীদের জন্য তাঁর প্রচেষ্টায় বিশেষ বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হয়। এধরনের সংস্কার কর্মে কোন সাম্প্রদায়িক চেতনা সক্রিয় নয় বরং জাতীয় উন্নয়নের প্রবণতা প্রবলতর হয়েছে। ঊনিশ শতকীয় হিন্দু সংস্কার কর্মীদের মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রবল ছিল। মুসলিম সংস্কারকদের মধ্যে সে প্রবণতা সুশৃঙ্খল হয়নি। শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর প্রয়াস সামগ্রিকতা অর্জনে একটি প্রায়োগিক সম্ভাবনা সূচিত করেছিল।[৫৭]

---

[৫৭] দেখুন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, আমার জীবনধারা, আ.মি.পা. ট্রাস্ট, ৮ম প্রকাশ,২০০৩, পৃঃ ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাশের দশকের পাকিস্তানী মোহমুক্তির দ্রুতপ্রসার এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্য বাঙালি সংস্কৃতিকেন্দ্রিক জাতীয় চেতনার উদ্বোধন, আর্থ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলন। এই প্রত্যক্ষ বলয়ে আহছানউল্লা (রঃ)এর বিচরণ নয়, তবে সমকালের বহির্দেশেও তাঁর আবাসভূমি নয়। সেই কারণেই সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে, শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর এমন উদ্যোগী ভূমিকা। অধ্যাপক মুস্তফা নূর-উল ইসলাম মন্তব্য করেনঃ

> 'মেহেরুল্লাহ-ইসলামবাদী-সিরাজী-ফজলুল হকের কালে সচেতন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও আহ্ছানউল্লা যে নেতা বা নায়ক হননি কিংবা প্রচারক বক্তা হননি, তাতে কি আমাদের ক্ষতি হয়েছে? তাঁর মানস গঠন এবং কর্মপন্থা তদনুরূপ ধাঁচের ছিলনা। শতায়ূ জীবনে তাঁর পরিচিতি তিনি শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক, সমাজসেবী, সাহিত্যিক এবং সূফী।[৫৮]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমিক। তিনি মনে করেনঃ

> 'যে পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের কুৎসা হইতে বিরত না হইবে, যে পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ও মুসলমানী সমবায় না হইবে, যে পর্য্যন্ত উভয় জাতির মধ্যে সৌহৃদ স্থাপিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের উন্নতি সুদূর পরাহত।'[৫৯]

তাই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নিরসনের আহবান জানিয়ে খানবাহাদুর (রঃ) বাঙালি জাতিকে বলেছেনঃ

> 'ভাই সকল! হিন্দু-মুসলমানী দ্বন্দ্ব আজ হইতে ভুলিয়া যাও; 'হিন্দু বাঙালা' 'মুসলমানী বাঙালা' এই পার্থক্যবোধক শব্দগুলি অভিধান হইতে উঠাইয়া দাও;

---

[৫৮] গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারকগ্রন্থ, ঢা.আ.মি.পা.ট্রাস্ট,প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ২০০২, পৃঃ ৯৮।

[৫৯] গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, সপ্তম খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ১৯৯৪, পৃঃ ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

উভয়ের সাহায্যে বঙ্গভাষার আয়ত্ত বৃদ্ধি কর এবং ভাষার উত্তরোত্তর উন্নতি দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন কর। আমিত্ব ছাড়িয়া দাও, এক মনে এক প্রাণে প্রেমময়ের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেম লইয়া জাতি নির্ব্বিশেষে বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন কর।'[৬০]

[৬০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)এর সাহিত্য কর্মধারা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সাহিত্য-জীবন সুদীর্ঘ ষাট বছরকাল ব্যাপী বিস্তৃত। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় আশি। এগুলো ১২ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। রচনার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৭৮৭৫। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এ-এক বিস্ময়কর কীর্তি। তাঁর রচনাবলী আঙ্গিকের দিক থেকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ ১. প্রবন্ধ জাতীয় রচনা, ২. ভ্রমণ কাহিনী, ৩. পত্রাবলী। তবে এর অধিকাংশ প্রবন্ধ। অর্থাৎ স্বপ্নকল্পনা বা ভাবলোকের ব্যাপার এখানে একান্তই বিরল। নিম্নে তাঁর বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থের সংখ্যা উল্লিখিত হলঃ

জীবনী বিষয়ক	১৭
কোরআন ও হাদিস বিষয়ক	২১
শিশু সাহিত্য বিষয়ক	৫
ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক	৪
ইসলামি বিধান বিষয়ক	৫
ইতিহাস বিষয়ক	৯
বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা বিষয়ক	৩
ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক	২
শিক্ষা বিষয়ক	৩
ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক	১
বিবিধ	৮

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে কালানুক্রমিক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বর্ণনা দেয়া হলঃ

১৯০৫ঃ পদার্থ শিক্ষা (শিক্ষা)

মুদ্রকঃ জান মুহম্মদ খান, রাজশাহী। প্রথম প্রকাশঃ ২৮ এপ্রিল, ১৯০৫ খ্রিঃ, পৃঃ ৬৬। মূল্যঃ সাড়ে চারি আনা। গ্রন্থস্বত্বঃ গ্রন্থকার, হেডমাষ্টার, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯০৫ খ্রিঃ, ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ৩৪৬ (২) পৃঃ ৮-৯।

১৯১৫ঃ টীচারস্ ম্যানুয়েল (শিক্ষা)

যৌথ গ্রন্থকারঃ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, এম.এ. এবং অচ্যুতনাথ অধিকারী, বি.এ.। প্রকাশকঃ ম্যাকমিলান এন্ড কোং, ২৯৪ বৌবাজার স্ট্রীট, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ২৭ আগষ্ট, ১৯১৫ খ্রিঃ, পৃঃ ৪০১। মূল্যঃ পাঁচ সিকা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯১৫ খ্রিঃ, ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

১৯১৮ঃ বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য (ভাষা ও সাহিত্য)

প্রকাশক ও মুদ্রকঃ কৃষ্ণ চৈতন্য দাস, মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্ক, ৩৪ মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১৭ জুন ১৯১৮ খ্রিঃ, পৃঃ ২০, দ্বিতীয় সংস্করণঃ কাজী রফিকুল আলম,ঢাকা আহছানিয়া মিশন পাবলিশেন ট্রাস্ট,ঢাকা,জুন ১৯৮৩। মূল্যঃ আট টাকা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,১৯১৮ খ্রীঃ, ত্রৈমাসিক খতিয়ান, পৃঃ ৩০। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৪৯। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৮ঃ মোছলেম জগতের ইতিহাস (ইতিহাস)

প্রকাশকঃ মুহাম্মদ মোবারক আলী, মখদুমী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। মুদ্রকঃ মুহাম্মদ আজিজুর রহমান, নিউ ক্যালকাটা প্রেস, ১১/১ অন্তনী বাগান লেন, কোলকাতা। ২য় সংস্করণ, ১৯২৯ খ্রিঃ (১ম প্রকাশঃ ১৯২৫ খ্রিঃ) পৃঃ ৪৬০। মূল্যঃ আড়াই টাকা। তথ্যনির্দেশঃ বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত।

১৯২৬ঃ ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (ধর্ম ও জীবনী)

প্রকাশকঃ কাজী আবদুর রশীদ, বি.এ., প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশঃ ১ জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রিঃ, পৃঃ ২৬৭। মূল্যঃ দুই টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ১৯৬৬ খ্রিঃ, পৃঃ ৩০০। মূল্যঃ চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯২৬ খ্রিঃ, ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।

১৯২৯ঃ নীতি ও ধর্মশিক্ষা এবং চরিত্র গঠন (ধর্ম ও নীতি)

প্রকাশকঃ গ্রন্থকার, ১৭৯ দিলকুশা স্ট্রীট, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ৩ অক্টোবর ১৯২৯ খ্রিঃ, পৃঃ ৭। মূল্যঃ দুই আনা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯২৯ খ্রীঃ, ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

১৯২৯ঃ হেজাজ ভ্রমণ (ভ্রমণ কাহিনী)

প্রকাশকঃ গ্রন্থকার, প্রথম প্রকাশঃ ১জুলাই ১৯২৯ খ্রিঃ, পৃঃ ১৫৮। মূল্যঃ এক টাকা। তৃতীয় সংস্করণঃ ১মার্চ ১৯৩৫। চতুর্থ সংস্করণঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯২৫ খ্রিঃ, ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩০ঃ আল ইছলাম (ধর্ম)

প্রকাশকঃ মুহাম্মদ বদরোদ্দোজা, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ৩ ডিসেম্বর ১৯৩০ খ্রিঃ, পৃঃ ২৩১। মূল্যঃ পাঁচ সিকা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩০খ্রিঃ, ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

১৯৩০ঃ নামাজ শিক্ষা (ধর্মঃ ফেকাহ)

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৩০। প্রকাশের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। পঞ্চম সংস্করণঃ ১৯৬৬। প্রকাশকঃ বেগম আহ্ছানউল্লা, নলতা, খুলনা, পৃঃ ২০৮। মূল্যঃ আড়াই টাকা। তথ্যনির্দেশঃ শামসুল হক সংকলিত বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৭।

১৯৩১ঃ হজরত মোহাম্মদ (জীবনী)

প্রকাশকঃ মুহম্মদ বদরোদ্দোজা, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ৫ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ খ্রিঃ, পৃঃ ২৫২। মূল্যঃ পাঁচ সিকা। চতুর্থ সংস্করণঃ ১৯৪৬। পঞ্চম সংস্করণঃ ময়মনসিংহ, ইন্ডিয়া লাইব্রেরী, ১৯৪৮। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩১ খ্রিঃ, ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান। রাজশাহী ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত।

১৯৩১ঃ কোরান ও হাদিসের আদেশাবলী (ধর্ম)

প্রকাশকঃ মুহম্মদ বদরোদ্দোজা, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। তৃতীয় সংস্করণঃ ৯ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ খ্রিঃ, পৃঃ ৪৯। মূল্যঃ চারি আনা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩১ খ্রিঃ, ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩১ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান (শিক্ষা)

প্রকাশকঃ মুহম্মদ বদরোদ্দোজা, এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ৩০মার্চ ১৯৩১ খ্রিঃ, পৃঃ ২৪। মূল্যঃ পাঁচ পয়সা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, জানুয়ারী ১৯৮৮খ্রিঃ। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩১ খ্রিঃ, ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।

১৯৩১ঃ History of the Muslim World (ইতিহাস)

প্রকাশকঃ মুহম্মদ বদরোদ্দোজা, এম্পায়ার বুক হাউজ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। মুদ্রকঃ সারদা প্রসাদ মন্ডল, শ্রীরাম প্রেস, ১৬২ বৌবাজার স্ট্রীট, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ১৯৩১, পৃঃ ৭৪৪। মূল্যঃ পাঁচ টাকা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পাঠাগারে সংরক্ষিত।

১৯৩৪ঃ মোস্তফা কামাল (জীবনী)

প্রকাশকঃ আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ২২ অক্টোবর ১৯৩৪ খ্রিঃ, পৃঃ ১০৮। মূল্যঃ এক টাকা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩৪ খ্রিঃ, ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।

১৯৩৪ঃ ইছলামের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস)

প্রকাশকঃ আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ৩০ মার্চ ১৯৩৪ খ্রিঃ, পৃঃ ৩৩৪। মূল্যঃ দেড় টাকা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩৪ খ্রিঃ, ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৪৯। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৪ঃ দরবেশ জীবনী (জীবনী)

প্রকাশকঃ আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ২৮ অক্টোবর ১৯৩৪ খ্রিঃ, পৃঃ ২৯। মূল্যঃ আট আনা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩৪ খ্রিঃ, ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৯৫৭, পৃঃ ৪০। তৃতীয় সংস্করণঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ১৯৮৬, পৃঃ ৩৬, মূল্যঃ ১০.০০।

১৯৩৪ঃ দীনিয়াত (প্রথম ভাগ)

প্রকাশকঃ আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৩৪ খ্রিঃ, পৃঃ ৩৮।

১৯৩৪ঃ দীনিয়াত (দ্বিতীয় ভাগ)

প্রকাশকঃ আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৩৪ খ্রিঃ।

১৯৩৫ঃ এবনে ছউদ (জীবনী)

প্রকাশকঃ আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১ জুলাই ১৯৩৫ খ্রিঃ, পৃঃ ৭৩। মূল্যঃ আট আনা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩৫ খ্রিঃ ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬ঃ ভক্তের পত্র (তাসাওউফ)

প্রকাশকঃ মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ, বাবুবাজার, ঢাকা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৩৬। ৪র্থ সংস্করণঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ১৯৬৭। পঞ্চম সংস্করণঃ জয় পাবলিশার্স, ৫/৯ লালমাটিয়া, ব্লক-এ, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৪, পৃঃ ২১২। মূল্যঃ ৩৭। তথ্যনির্দেশঃ শামছুল হক সংকলিত বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৮।

১৯৩৬ঃ কোরানের সার (কোরআন)

প্রকাশকঃ মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। মূল্যঃ দেড় টাকা। তথ্যনির্দেশঃ গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল, ঢাকা, ইংরেজী মুদ্রিত ক্যাটালগ, ১৯৪০ খ্রিঃ, পৃঃ ১৩৯।

১৯৩৯ঃ মানবের পরম শত্রু (চিকিৎসা)

প্রকাশকঃ নজমুল ওলা, মখদুমী লাইব্রেরী ও প্রকাশকঃ আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ৩০ জুন ১৯৩৯ খ্রিঃ, পৃঃ ৭৯। মূল্যঃ চারি আনা। তথ্যনির্দেশঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯৩৯ খ্রিঃ, ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

১৯৪০ঃ তরিকত শিক্ষা (তাসাওউফ)

প্রকাশকঃ মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৪০ খ্রিঃ। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ঐ, ১৯৪৯, পৃঃ ১৮৫। মূল্যঃ চারি আনা। তৃতীয় সংস্করণঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন্স ট্রাস্ট ১৯৬২, পৃঃ ৩৫৯। মূল্যঃ আড়াই টাকা। তথ্যনির্দেশঃ শামসুল হক সংকলিত বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ঃ আমার জীবনধারা (জীবনী)

প্রকাশকঃ মখদুমী লাইব্রেরী কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৪৬ খ্রিঃ। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৯৪৯, তৃতীয় সংস্করণঃ ১৯৬৬ খ্রিঃ, 'জীবন স্মৃতি' নামে সংক্ষিপ্ত ও পুনর্বিন্যস্ত আকারে প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণঃ ১৯৭০ খ্রিঃ। পঞ্চম সংস্করণঃ নভেম্বর ১৯৮২। ষষ্ঠ সংস্করণঃ জয় পাবলিশার্স, ৫/৯ লালমাটিয়া, ব্লক-এ, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রিঃ, পৃঃ ১৪০। মূল্যঃ পঁচিশ টাকা।

১৯৪৭ঃ ছুফী (তাসাওউফ)

প্রকাশকঃ মুহম্মদ কাসেম, মখদুমী এন্ড আহ্ছানউল্লা লাইব্রেরী, বাবু বাজার, ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ জুন ১৯৪৭ খ্রিঃ, পৃঃ ১২৬। মূল্যঃ দেড় টাকা।

১৯৪৮ঃ বাঙ্গালা সাহিত্য ২য় ভাগ। (সাহিত্য)

প্রকাশকঃ মখদুমী এন্ড আহ্ছানউল্লা লাইব্রেরী, বাবু বাজার, ঢাকা। তৃতীয় সংস্করণঃ ১৯৪৮ খ্রিঃ।

১৯৪৮ঃ Child's Grammar

প্রকাশকঃ মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। মুদ্রকঃ জি.সি.দে.সি.টি. প্রিন্টার্স, ৩৫ সোটোওয়ালা গলি, কোলকাতা। ৬ষ্ঠ সংস্করণঃ জানুয়ারী ১৯৪৮, পৃঃ ১০০। মূল্যঃ এক টাকা চারি আনা।

১৯৪৯ঃ বিশ্ব শিক্ষক (জীবনী)

প্রকাশকঃ মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৪৯ খ্রিঃ, পৃঃ ৭০। মূল্যঃ দেড় টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ঃ সৃষ্টিতত্ত্ব (ধর্ম)

প্রকাশকঃ মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৪৯ খ্রিঃ, পৃঃ ৫৯। মূল্যঃ দেড় টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ নাজির আহ্মদ, নলতা, খুলনা, ১৯৬৩, পৃঃ ৭৪।

১৯৪৯ঃ দোয়া ও দরুদ (ধর্ম)

প্রকাশকঃ মোঃ রফিকুল হাসান, কোরান প্রচার কার্য্যালয়, ১৫ নং ম্যাকলিয়ড স্ট্রীট, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৪৯, পৃঃ ১০৪। মূল্যঃ এক টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ১৯৭৭খ্রিঃ, পৃঃ ৮৮। মূল্যঃ পাঁচ টাকা।

১৯৪৯ঃ প্রেমিকের পত্রাবলী (তাসাওউফ)

প্রকাশকঃ মুহাম্মদ কাসেম, মখদুমী এন্ড আহ্ছানউল্লা লাইব্রেরী, বাবু বাজার, ঢাকা। প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর ১৯৪৯ খ্রিঃ, পৃঃ ১৮৬। মূল্য ঃ দুই টাকা চারি আনা। তথ্যনির্দেশঃ পাবলিক লাইব্রেরী, কুমিল্লা টাউন হল। কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, বিশেষ ইউনিয়ন ক্যাটালগ সিলেট জেলা, ১ম খন্ড।

১৯৪৯ঃ ইছলামের মহতী শিক্ষা (ধর্ম)

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৪৯ খ্রিঃ, পৃঃ ২৭৬। তথ্যনির্দেশঃ কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ১৯৬৩ খ্রিঃ, পৃঃ ২৪০। মূল্যঃ তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ঃ মোছলেমের নিত্যজ্ঞাতব্য (ধর্ম)

প্রকাশকঃ মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৪৯ খ্রিঃ, পৃঃ ২৭৫। মূল্যঃ চারি টাকা।

১৯৪৯ঃ রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা ১ম খন্ড (জীবনী)

প্রকাশকঃ ডাঃ মুহাম্মদ সৈয়দ আলী, এল.এম.এফ. ভাঙ্গড় জেলা, ২৪ পরগণা, ভারত। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৪৯ খ্রিঃ, পৃঃ ২০০। মূল্যঃ দেড় টাকা।

১৯৪৯ঃ আমার শিক্ষা ও দীক্ষা (তাসাওউফ)

প্রকাশকঃ মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রিঃ, পৃঃ ৬০। মূল্যঃ এক টাকা। তৃতীয় সংস্করণঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ৪ সেগুন বাগিচা, ১৯৬৮, পৃঃ ৬০। মূল্যঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

১৯৫০ঃ কুতুবুল আকতাব হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ (জীবনী)

প্রকাশকঃ মুহম্মদ রফিকুল হাসান, ১৪ ম্যাকলিয়ড স্ট্রীট, কোলকাতা । দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫০ খ্রিঃ, পৃঃ ১৩৫। মূল্যঃ পাঁচ সিকা। তথ্যনির্দেশঃ বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা।

১৯৫০ ঃ মহাপুরুষদের অমীয় বাণী (ধর্মীয় উপদেশ)

প্রকাশকঃ দি ইন্ডাষ্ট্রিয়েল সিন্ডিকেট লিঃ, বক্সির হাট, চট্টগ্রাম। প্রথম প্রকাশ ১৯৫০, পৃঃ ২৭৯। মূল্যঃ চারি টাকা। তথ্যনির্দেশঃ বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১ঃ পাঁচ ছুরা (বঙ্গানুবাদসহ) (কোরআন)

প্রকাশকঃ মোঃ রফিকুল হাসান, ১৪নং ম্যাকলিয়ড স্ট্রীট, কোলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৯৫১, পৃঃ ১১৮। মূল্যঃ পাঁচ সিকা। তথ্যনির্দেশঃ বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা।

১৯৫১ঃ কোরআনের বাণী ও একত্ববাদ (ধর্ম)

প্রকাশকঃ আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, খুলনা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ এপ্রিল ১৯৫১, পৃঃ ৯৬। মূল্যঃ পাঁচ সিকা। তথ্যনির্দেশঃ বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ঢাকা।

১৯৫১ঃ ইছলাম ও জাকাত (ধর্ম)

প্রকাশকঃ আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, খুলনা। প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ১৯৫১ খ্রিঃ, পৃঃ ১৮। মূল্যঃ চারি আনা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এপ্রিল ১৯৮১, পৃঃ ১৬, মূল্যঃ ৬.০০।

১৯৫১ঃ ছেলেদের মহানবী (জীবনীঃ শিশু সাহিত্য)

প্রকাশকঃ আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, খুলনা। প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ১৯৫১, পৃঃ ৩২। মূল্যঃ আট আনা।

১৯৫২ঃ ইছলাম রবি হজরত মোহাম্মদ (জীবনী)

প্রকাশকঃ মোহাম্মদ শফিকুল হাসান, এনায়েত নগর, পোঃ চন্ডি, ভায়া, বেহালা, ২৪ পরগণা, ভারত। প্রথম প্রকাশঃ ১৩৫৯ সাল (১৯৫২ ইং), পৃঃ ১২৭। মূল্যঃ দেড় টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ঃ বাংলা হাদীছ শরীফ ১ম খন্ড (হাদীছ)

প্রকাশকঃ আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, খুলনা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৫২ খ্রিঃ, পৃঃ ৪৪। মূল্যঃ দশ আনা। তথ্যনির্দেশঃ শামসুল হক সংকলিত বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জি, ১ম খন্ড; পৃঃ ২০৮।

১৯৫৬ঃ হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ (জীবনী)

মুদ্রকঃ সুয়িস প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১২ কংগ্রেস একজিবিশন রোড, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ পৃঃ ১৬। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণঃ শেখ মোছলেম আহ্মদ, ফেভারিট বুকস, ৫১ ডি.আই.টি. মার্কেট, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, পৃঃ ১৮।

১৯৫৬ঃ ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি (ধর্ম)

প্রকাশকঃ আবদুর রশিদ মন্ডল, কোলকাতা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৫৬ খ্রিঃ, পৃঃ ৩৮। তথ্যনির্দেশঃ শামসুল হক সংকলিত বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জি, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৭।

১৯৫৬ঃ হাদীছ গ্রন্থ (হাদীছ)

প্রকাশকঃ আব্দুল বারি ওয়ার্ছি, ১০ মাহুতটুলী রোড, ঢাকা। প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর ১৯৫৬। পৃঃ ১৮৩। মূল্যঃ দুই টাকা।

১৯৫৭ঃ আউলিয়া চরিত্র (জীবনী)

প্রকাশকঃ আব্দুর রাজ্জাক, মরিচা, ভাঙ্গড়, ২৪ পরগণা, ভারত। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৫৭ খ্রিঃ, পৃঃ ১১৬। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, আগস্ট ১৯৮৪, পৃঃ ৮০। মুল্যঃ ১২.০০।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৮ঃ ইছলামের দান (ধর্ম)

প্রকাশকঃ মুহম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, সাং মরিচা, পোঃ ভাঙ্গড়, ২৪ পরগণা, ভারত। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৫৮ খ্রিঃ, পৃঃ ১৪৩। মূল্যঃ দেড় টাকা।

১৯৬২ঃ বাংলা মৌলুদ শরীফ (ধর্ম)

প্রকাশকঃ ফেভারিট বুকস, ৫১ ডি.আই.টি. মার্কেট, লক্ষীবাজার, ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৯৬২, পৃঃ ১৬৫। মূল্যঃ আড়াই টাকা। তথ্যনির্দেশঃ মুহাম্মদ শামসুল হক সংকলিত বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জি, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০৮।

১৯৬২ঃ আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ (বিবিধ)

প্রকাশকঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬২ খ্রিঃ, পৃঃ ৩৫। মূল্যঃ পাঁচ টাকা।

১৯৬২ঃ জীবন স্মৃতি (জীবনীঃস্মৃতিকথা)

প্রকাশকঃ মাহ্বুবা খাতুন, আহমেদ সন্স, ২ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন, লক্ষীবাজার, ঢাকা। তৃতীয় সংস্করণঃ নভেম্বর ১৯৬২, পৃঃ ২২৭। মূল্যঃ তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

১৯৬৩ঃ মুছলিম জাহান (ধর্মঃ ইতিহাস)

প্রকাশকঃ আব্দুল মজিদ সরকার, মজিদ পাবলিশিং হাউস, ১৪/১৫ পাটুয়াটুলী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ (পরিবর্তিত) ১৯৬৩ খ্রিঃ, পৃঃ ২৭৮। মূল্যঃ তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

১৯৬৪ঃ বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী (ধর্ম নীতিঃ উপদেশ)

প্রকাশকঃ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা। প্রথম প্রকাশঃ ১৯৬৪ খ্রিঃ, পৃঃ ৯০। মূল্যঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

Dhaka University Institutional Repository

নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত 'আহ্ছানিয়া মিশন ও ইহার কার্যধারা', ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত 'বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী'; ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'ইছলামের মহতী শিক্ষা' বইয়ের শেষাংশে মুদ্রিত এবং মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার বিজ্ঞাপনে হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর রচিত নিম্নোক্ত বইগুলির নাম পাওয়া যায়। বইগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

আহ্ছানিয়া মিশনের মূলনীতি, সংক্ষিপ্ত হাদিছ, ইছলাম নবী, পাকিস্তান, আমাদের ইতিহাস, বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ, মধ্যপ্রাচ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, তালিমী দীনিয়াত, ইছলামী তালিম, আল আয়াবেদ, দীনিয়াত শিক্ষা ১ম খন্ড, দীনিয়াত শিক্ষা ২য় খন্ড, দীনিয়াত শিক্ষা ৩য় খন্ড, দীনিয়াত শিক্ষা ৪র্থ খন্ড, ভারতের ইতিহাস, প্রথম পড়া, মক্তব সাহিত্য, Our Heritage, আনল যারা জীবন কাঠি, মোছলেম প্রাচীন ভূ-ভাগের মানচিত্র।

বিষয় ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নঃ

জীবনী বিষয়কঃ মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় চেতনার পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে রচিত হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থগুলির উপযোগিতা ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এ পর্যায়ে তিনি ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র, নবী করীম হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ও আউলিয়াদের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে হেজাজের অধিপতি এবনে ছউদ এবং তুর্কি সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ মোস্তফা কামালের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ 'এবনে ছউদ' এবং 'মোস্তফা কামাল' উল্লেখযোগ্য। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে 'ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ', 'হজরত মোহাম্মদ', 'পেয়ারা নবী', 'ইছলাম রবি হজরত মোহাম্মদ' প্রভৃতি গ্রন্থে। গ্রন্থগুলিতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীই শুধু উল্লিখিত হয়নি, ইছলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের সঠিক

Dhaka University Institutional Repository

ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। শুধু চরিত্র চিত্রণ এবং তথ্যাদির সন্নিবেশন এ সকল গ্রন্থের একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়, লেখকের দরদি মন এবং নবী করীম (দঃ)-এর প্রতি ভক্তমনের আবেগ অনুরাগ বিধৃত হয়ে গ্রন্থগুলির আকর্ষণ ও উপযোগিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। 'ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ' সম্পর্কে প্রফেসর মুহম্মদ আব্দুল হাই মন্তব্য করেছেনঃ

> '.....আহ্ছানুল্লাহ ভক্ত, সুতরাং ইসলাম প্রচারক আদর্শ মহাপুরুষ হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থে যে ভক্ত মনের পরিচয় তিনি দেবেন তা অবধারিত। এই বইটিতে প্রকৃতপক্ষে ঘটেছেও তাই। এ বইটিতে সুফীতত্ত্বের প্রভাব পড়েছে।'[১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) রচিত আউলিয়াদের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'কুতুবুল আকতাব হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ', 'দরবেশ জীবনী', 'আউলিয়া রচিত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আউলিয়াদের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর পাঠককে তরীকতের পথে অগ্রসর করাতে চান। 'দরবেশ জীবনী' গ্রন্থের সূচনায় লেখক তাই বলেছেনঃ

> 'মানবের একদিকে যেমন জাহেরী শরীয়ত শিক্ষা আবশ্যক, অন্যদিকে বাতেনী এলম শিক্ষা করত আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করাও ততোধিক আবশ্যক। যাবতীয় সৃষ্ট জীব স্রষ্টার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে মানুষ পার্থিব ব্যাপারে দুনিয়ার মোহে এরূপ মুগ্ধ যে, আল্লাহ প্রাপ্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খেয়াল। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ নফ্ছকে বশীভূত করিয়া খোদার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় এবং অলি আল্লাহ্গণের কৃপা লাভ করিতে পারে, তৎপ্রতি তাহাদের আদৌ চিন্তা নাই। আশা করি, এই পুস্তক

---

[১] মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্সান, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃঃ ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ ছূফী মতের অনুসন্ধান পাইবেন ও তরীকতের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবেন। তরীকত পন্থীগণের নিকট ইহা আদৃত হইলে সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।'[২]

এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আমার জীবনধারা'। গ্রন্থটিতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর জীবনের বিস্তৃত ঘটনা খন্ড চিত্র আকারে উল্লিখিত হয়েছে। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তে কাল করেন। তাঁকে জানার জন্য, তাঁর সময় ও কালকে বুঝবার জন্য, দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য উৎসর্গিত এই মনীষীর কর্মবহুল জীবনের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য এই জীবনী গ্রন্থটি একখানি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

১. কোরআন ও হাদীস বিষয়কঃ

এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে 'দোয়া ও দরুদ', 'কোরআনের বাণী ও একত্ববাদ', 'পাঁচ ছুরা', 'বাংলা হাদিছ শরীফ', 'হাদিছ গ্রন্থ' প্রভৃতি। কোরআন ও হাদীছের শিক্ষা ব্যতীত মুসলমানদের কোন শিক্ষাই পরিপূর্ণ হয়না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলে কোরআন ও হাদীছ বিষয়ক তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কোরআনের অমূল্য বাণীকে তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের উপযোগী করে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার যথাযথ মূল্যায়ন করে কোরআন ও কোরআনের একত্ববাদকে পাঠক মনে বদ্ধমূল করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর মতে 'ইছলাম বিজ্ঞানের অনুকূল, প্রতিকূল নহে'। কোরআন ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় তিনি বলেছেনঃ

---

[২] গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ২য় খন্ড, দরবেশ জীবনী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০২, পৃঃ সূচনা।

Dhaka University Institutional Repository

'বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়ম আবিষ্কার করে। রেলগাড়ী, টেলিফোন, এরোপ্লেন, রেডিও, মহাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বিজ্ঞানের আবিষ্কার। তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, শব্দ প্রভৃতির গতির নির্দিষ্ট নিয়ম বা বিধান আছে। ঐ সকল নিয়মের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির অনন্ত রহস্য ক্রমে উদ্‌ঘাটন করিতেছেন। উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে বিজ্ঞানের বাহাদুরী সেইখানেই শেষ হইত। কোরআন সাক্ষ্য দেয় যে, প্রকৃতি বিধিবদ্ধ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। মানুষের জ্ঞান যতই বর্ধিত হইবে, ততই নব নব তথ্য আবিষ্কৃত হইবে এবং মানব সৃষ্টির কৌশল অবগত হইয়া স্রষ্টার গুণবত্তা উপলব্ধি করিবে। বিজ্ঞান নিয়ম আবিষ্কার করে মাত্র কিন্তু উহা পয়দা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।'[৩]

২. ইতিহাস বিষয়কঃ

মুসলমান জাতির ইতিহাস চিরদিনই ঐতিহ্যের এবং গর্বের। একদিন এ জাতি পৃথিবীর অন্য সকল জাতির বিস্ময় হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। মুসলমানদের এই শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস অবলম্বনে হজরত খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (রঃ) যে সকল ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা', 'মুছলিম জাহান', 'ভারতের ইতিহাস', 'মধ্যপ্রাচ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ', 'আমাদের ইতিহাস', 'History of the Muslim World' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা' গ্রন্থে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের শাসন প্রণালী শুধু বর্ণনা করেননি, ধর্ম, শিক্ষা এবং কৃষ্টি সভ্যতায় তার দান

---

[৩] গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা রচনাবলী, ৩য় খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ১ম প্রকাশ-১৯৯০, সম্পাদকের ভূমিকা, পৃঃ ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

কতটুকু সে সম্পর্কেও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও বর্তমান যুগের শিক্ষা ও সভ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক আর্য যুগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, দিল্লির সুলতান ও মোগল আমলের ইতিহাস ও তৎসহ পাকিস্তানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখকের মতে:

> 'আওরঙ্গজেবকে বুঝিতে হইলে কেবল গজনীর সুলতান মাহ্মুদ বা দিল্লীর মোগল বাদশাহ আকবরের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। আর্য্যযুগ, মৌর্য্যযুগ ও গুপ্তযুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির তুলাদন্ডে তাহাকে ওজন করিতে হইবে। হিন্দু ও মোছলেম সভ্যতা যে পরস্পর পরিপূরক, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এমনকি আদিম যুগের মিসর ও আসিরিয়ার দানও গণনা করিতে হইবে। প্রাচীন মিসরের স্থাপত্য অনুশীলনের সহিত শাহজাহানের শিল্পানুরাগকে এবং উমাইয়া যুগের শিক্ষার সহিত বর্তমান যুগের শিক্ষাকে পাশাপাশি রাখিলে প্রমাণিত হইবে যে, History repeats itself। প্রাচীন যে বর্তমানের শিক্ষাগুরু, তাহা ভুলিলে চলিবে না। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জন্মদাতা স্পেনের মুর বংশ, ধর্ম্মে প্রেমের উন্মাদনা আসিয়াছিল চৈতন্য হইতে এবং শাসন প্রণালীর সুগঠন ও সুশৃঙ্খল সাধন করিয়াছিল মোগল যুগে। প্রত্যেক যুগের ঐতিহ্য লইয়া বর্তমান ইতিহাস গঠিত।[৪]

৩. বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা বিষয়কঃ

স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং ধর্ম সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) একটি স্বচ্ছ ও উদার মনোভাব পোষণ করতেন বলেই বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন, তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সংসারবিরাগী প্রেমিক ও প্রধান প্রধান অলি

---

[৪] গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ৩য় খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ১ম প্রকাশ-১৯৯০, সম্পাদকের ভূমিকা, পৃঃ ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহগণের উপদেশসমূহ ও মহাপুরুষগণের পরামর্শ বিষয়ক অমীয় বাণী সম্বলিত গ্রন্থ 'মহাপুরুষের অমীয়বাণী', 'কোরআনের কতিপয় বাণী এবং হজরত মোহাম্মদ (দঃ)', হজরত হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ, মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ধর্মগুরুর উক্তি সম্বলিত গ্রন্থ 'ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি' এবং বিভিন্ন ধর্ম, ধর্মগুরুদের জীবন ও উপদেশাবলী সম্বলিত গ্রন্থ 'বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী' প্রভৃতি। ঐশী প্রেমে উদ্বুদ্ধ কোন মানুষ দেখলে তিনি তাঁকে সমাদর করতেন-মানুষের জাত ধর্ম বা বংশ পরিচয় নিয়ে চিন্তা করতেন না। জীবনস্মৃতিতে তিনি উল্লেখ করেছেনঃ

> 'আমার হেডক্লার্ক ছিলেন চন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। জগৎপুর আশ্রমের পূর্ণনন্দ স্বামীজি ছিলেন তাঁহার গুরু। স্বামীজি ছিলেন বিনয়ের আধার। তাঁহারই আমন্ত্রনে একবার আশ্রমে যাইবার সুযোগ পাই।'[৫]

'বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী' গ্রন্থে লেখক হজরত নবীয়ে করীম, হজরত আকদাস, কুতুবুল আকতাব হজরত ওয়ারেছ আলী শাহ, যরথুস্ত্র, তীর্থঙ্কর মহাবীর, কনফুসিয়াস, বুদ্ধদেব, হিন্দুধর্ম, যীশুখৃষ্ট, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, গুরুনানক, শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী শ্রী সারদামণি দেবী প্রমুখ ধর্মগুরুদের জীবনী ও উপদেশাবলী এবং ইসলাম ধর্মের ব্যাপকতা, কোরআনের বাণী, সৃষ্টিকৌশল প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক বলেছেনঃ

> 'স্রষ্টা দয়ার সাগর রহমানুর রহিম। তিনি যুগে যুগে ভ্রান্ত মানবকুলের পথ নির্দ্দেশের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পথপ্রদর্শক প্রেরণ করেছেন। কাজেই কোন জাতিকে, কোন সম্প্রদায়কে, কোন ধর্মকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়। স্রষ্টার উদ্দেশ্য চিরকালের জন্য একই। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য কিরূপে মানব তাঁরই প্রতিনিধি হিসাবে জগতের বুকে তাঁরই মাহাত্ম্য প্রচার করবে।'[৬]

---

[৫] প্রাগুক্ত।
[৬] প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়কঃ

ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্যকে বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। লেখকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণার্থক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে গভীর ধর্মানুরাগ। এ পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ইছলামের মহতী শিক্ষা', 'ইছলামের দান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কোরআন হাদীস ও মহাপুরুষদের অমিয়বাণীর আলোকে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে 'ইসলামের মহতী শিক্ষা' গ্রন্থে। 'ইসলামের দান' গ্রন্থে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বলেছেনঃ

> 'কোরআনের সহিত বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। ছুরা ফাতেহার মাহাত্ম্য মানুষ সারা জীবন চিন্তা করিলেও পূর্ণ অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে না। আল্লাহ্ তায়ালার জ্ঞান অসীম এবং মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আল্লাহর অসীম জ্ঞানের বিন্দুমাত্র ধারণা সসীম মানবের পক্ষে সম্ভবপর নয়।
>
> সুরা ফাতেহা বজ্রনাদে ঘোষণা করে যে, আল্লাহতায়ালা 'রাব্বুল আলামীন' 'রহমানুর রহীম' এবং 'মালেক ইয়াওমেদ্দীন' সৃষ্টির মধ্যে তাঁর করুণা ও মাহাত্ম্যের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অগণিত আলম বা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রতিপালক। কোরআনের এই উক্তি বিজ্ঞানও সমর্থন করে। বিজ্ঞানের উক্তি শূন্যমন্ডলে ২০ লক্ষ জগৎ বিদ্যমান। .....বিজ্ঞান বলে, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঘুরিতেছে। সূর্য্য স্বীয় মেরুদন্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে এবং গ্রহগুলিও স্ব স্ব মেরুদন্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে। আবার সূর্য্য তাহার গ্রহ উপগ্রহসহ শূন্যমন্ডলে পরিভ্রমণ করে। কোরআন বলে, সূর্য্য একটি নির্দিষ্ট বিধান অনুসারে তাহার মেরুদন্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে, যে বিধান তাহার জন্য (আল্লাহ তায়ালা) নির্দেশ করিয়াছেন।'[৭]

---

[৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

'ইছলামের দান' গ্রন্থে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এভাবে পর্যায়ক্রমে ইসলাম ধর্মকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনায় তিনি বলেছেনঃ

> '.....ইসলাম বিজ্ঞানের পরিপন্থী নহে। ইছলামের নিয়ম কানুন বিজ্ঞানের যুক্তিসম্মত। সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল কেবল Energy বা শক্তি, পরে বিভিন্নমুখী শক্তি হইতে জড় পদার্থের সৃষ্টি হয়। জলের মধ্যে আছে দুইভাগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ অক্সিজেন। ইহারা উভয়েই গ্যাস ব্যতীত আর কিছুই না এবং ইহাদের সংমিশ্রণে জলের উৎপত্তি হয়। বৃষ্টিধারা জল সমষ্টি। জল শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শিলার সৃষ্টি করে। সুতরাং জল যাহা এক সময় গ্যাস ছিল তাহা ক্রমে তরল এবং কঠিন পদার্থে পরিণত হইল। এইরূপ বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে ঐশীশক্তি নিরাকার অবস্থায় বিদ্যমান ছিল এবং ক্রমে স্রষ্টার ইচ্ছানুসারে বিভিন্নমুখী শক্তির সংমিশ্রণে আকারীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়। যে বস্তুর আকার আছে, উহা সসীম। আল্লাহ নিরাকার এবং অসীম। তিনি শক্তিময়, তেজময়, দয়াময়, জ্ঞানময়। তিনি আকারবিহীন। আকারের মধ্যে আসিলে বস্তু সীমাবিশিষ্ট হয়। সমস্ত বস্তুর মধ্যে দুই প্রকার বিদ্যুৎ বর্ত্তমান। Positive & Negative। একটি অপরটিকে বেষ্টন করিয়া আকারের উৎপত্তি করে। পুরুষ-বিদ্যুতের ও স্ত্রী-বিদ্যুতের সংমিশ্রণে আকারধারী বস্তুর উৎপত্তি হয়, বস্তুর বিশ্লেষণ করিলে উভয় বিদ্যুতের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল ভিন্ন বাষ্প বা শক্তি। মহাশক্তিময় আত্মার ইঙ্গিতে বিভিন্নমুখী শক্তির সংমিশ্রণে প্রকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।'[৮]

---

[৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইসলামি বিধান বিষয়কঃ

ধর্মের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে। আবার ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন ছাড়া ধর্মের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করা এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও অনুরাগ সৃষ্টি করা সহজসাধ্য নয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এদু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে ইসলাম ধর্মের বিধিবিধান সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। গতানুগতিক ধর্ম পরিচিতি প্রদান করাই তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলনা, ধর্মের প্রতি, আল্লাহ্ ও রসূলের (সঃ) প্রতি গভীর বিশ্বাস ও অনুরাগ সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য আমরা লক্ষ্য করি, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিধি বিধানকে তিনি ঐতিহাসিক, সামাজিক, মানবিক এবং আধ্যাত্মিক আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর রচিত এ পর্যায়ের গ্রন্থগুলি পাঠ করলে মানুষের মনে ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে, একজন মুসলমান সত্যিকার মুসলমান হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবে। 'ইসলাম ও জাকাত' গ্রন্থে লেখক দেশ বিদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ও দেশের কম্যুনিজম সম্পর্কে ইসলামের মধ্যপথ অবলম্বনের ইতিহাস থেকে শুরু করে ইসলামের সম্পদ গ্রহণ ও বর্জনের কথা অত্যন্ত সুন্দর, সাবলীল ও যুক্তিযুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। তরীকতপন্থী মানুষের জন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) রচনা করেছেন তরীকত শিক্ষা। লেখক এ গ্রন্থে বলেছেনঃ

> 'শরীয়ত ও তরীকত ইছলামের দুইটি অঙ্গ। শরীয়ত বহিরঙ্গ, তরীকত অন্ত রঙ্গ। শরীরের সহিত রুহের যে সম্বন্ধ, শরীয়তের সহিত তরীকতের সেই সম্বন্ধ। মানব জীবনে উভয়ই আবশ্যক। শরীয়তের বিধান প্রত্যেকেরই পালনীয়। শরীয়ত বিনা তরীকত অসম্পূর্ণ।'
>
> 'রুহের উন্নতির জন্য তরীকত আবশ্যক। যিনি আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে চান, যিনি খোদা তায়ালার নৈকট্য লাভ করিতে চান, যিনি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে চান, ইহলোকে পরলোকের স্বাদ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করিতে চান, যিনি এবাদতে তন্ময়তা লাভ করিতে চান, তাহার জন্য তরীকত অপরিহার্য্য।'

'.....শুষ্ক শরীয়ত প্রেমিককে প্রেমময়ে লীন করিতে অক্ষম। যতক্ষণ দুনিয়াবী খেয়ালাত প্রবল থাকে, ততক্ষণ তরীকতে অগ্রসর হওয়া যায় না। যতই রুহ প্রবৃত্তিকে জয় করিতে সমর্থ হয়, ততই তরীকতের আনন্দ উপলব্ধি হয়।'[৯]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর এ পর্যায়ের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য', 'আমার শিক্ষা ও দীক্ষা', 'নামাজ শিক্ষা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৬. শিশু সাহিত্য বিষয়কঃ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) শিশু-কিশোর উপযোগী বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। শিশুদের লেখাপড়ার ধারাকে যতদূর সম্ভব সহজ সরল করে তুলে ধরার প্রচেষ্টা তাঁর লেখার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। চরিত্র গঠন, নীতি শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষার প্রতি তাঁর কঠোর দৃষ্টি ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, চরিত্রই মানব জীবনের একমাত্র মূল্যবান দিক। তিনি বলেনঃ

'চরিত্র মানবের অমূল্য সম্পদ। চরিত্রবান হতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সত্য কথন, মাতাপিতা ও গুরুজনে ভক্তি, আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ।'[১০]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) শিশু-কিশোর উপযোগী অধিকাংশ গ্রন্থের মধ্যে তাঁর এই মনোভাব ও মুল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিকতা বিধৃত হতে দেখা যায়। তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন। আজকের দিনে বাংলা ভাষায় শব্দ গঠন, শব্দের বানান ও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সরলীকরণের প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি তা পঞ্চাশের দশকে খানবাহাদুর

---

[৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।

[১০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সচেতন মনকে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর রচিত 'ছেলেদের মহানবী' গ্রন্থে এর উদাহরণ মেলে। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেনঃ

> 'যুক্তাক্ষর শিশু পাঠ্যের প্রধান অন্তরায়। দ্বিতীয় অন্তরায় ফলাযোগে অক্ষরের আকার পরিবর্তন। এই অন্তরায়কে অতিক্রম করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।'[১১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর শিশু-কিশোর উপযোগী গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'Our Heritage', 'আনল যারা জীবন কাঠি', 'মক্তব সাহিত্য', 'বাংলা সাহিত্য', 'Child's Grammar' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৭. ভাষা ও সাহিত্য বিষয়কঃ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক চিন্তা চেতনার উল্লেখযোগ্য ফসল 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' গ্রন্থ। তাঁর সাহিত্য বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। তবে এ জাতীয় গ্রন্থ রচনার কথা তিনি জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ

> 'গোপালপুর বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি স্বাস্থ্যনিবাস। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধেয় নওয়াব শামসুল হুদা মরহুম ছাহেবের একটি কৃষি ফার্ম সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল। সেইখানেই আড্ডা লইলাম পরিবারবর্গসহ। নিকটে Flag-station ছিল। ঝড়ের সূচনা হইলে নিশান উড়িত। মধ্যাহ্নে আমরা খুর আনন্দের সহিত Sea bath লইতাম।.....সমুদ্র স্নান বড়ই আমোদজনক ছিল। স্নানের পর ক্ষুধা বৃদ্ধি হইত। সামুদ্রিক মৎস্য আকণ্ঠ ভোজন করিতাম। এখানে অবস্থানকালে একটি সাহিত্য পুস্তক লিখিয়া প্রেসে পাঠাইয়াছিলাম।'[১২]

---

[১১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।
[১২] প্রাগুক্ত,পৃঃ ৪৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) মনে করতেন ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে দেশ জাতির একটি নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ভাষার উন্নতির জন্য সম্মিলিত জাতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার। ভাষাকে দেশ-কাল ও জাতির সঙ্কীর্ণ মতবিরোধ ও স্বার্থসিদ্ধির ঊর্ধ্বে রেখে ভাষার পরিচর্যা তথা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা দরকার। তাঁর এ সম্পর্কিত ভাবনার চমৎকার উদাহরণ মেলে তাঁর লেখাতেই। এখন থেকে প্রায় সত্তর বছর পূর্বে লেখা 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' গ্রন্থের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক উদার ও গঠনমূলক মনোভাব এবং জোরালো অভিব্যক্তির পরিচয় বহন করেঃ

> 'ভাষার সহিত সাহিত্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক। ভাষার উন্নতির সহিত সাহিত্যের উন্নতি সংঘটিত হয়। মনের ভাব ভাষায় পরিণত হয়। ভাব যাঁহার যত উচ্চ, তাঁহার ভাষাও তত প্রকৃষ্ট। ভাষা দ্বারা শিক্ষা ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে ভাষার পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা নহে; একই জাতির মধ্যে অনেক সময়ে ভাষার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শিক্ষাতে ভাব যত মার্জিত হয়, ভাষার তত পরিশুদ্ধি লক্ষিত হয়। অশিক্ষিত জাতির ভাষা অসম্পূর্ণ। ভাষা দ্বারা আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি ও আবশ্যকতা অনুসারে উক্ত ভাব লিপিবদ্ধ করি; এইরূপে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। যাঁহার ভাব যত উচ্চ, তাঁহার রচিত সাহিত্যও তত সুন্দর। রচনা কৌশলের উপরেও সাহিত্যের পারিপাট্য কতকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু ভাবের অভাব হইলে সাহিত্যের দারিদ্র্য আইসে। যে সমাজ বা যে জাতির মধ্যে উচ্চ ভাবাপন্ন ব্যক্তি যত অধিক, সে সমাজ বা জাতির সাহিত্যও তত উন্নত। যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতির অস্তিত্ব কোথায়?

Dhaka University Institutional Repository

> এতকাল পর্যন্ত মাতৃভাষার কুটতর্ক লইয়া সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। উর্দু আমাদের মাতৃভাষা মনে করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য কেহ অগ্রসর হন নাই। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সে তর্ক মিটাইয়া দিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে বঙ্গভাষায় সাহিত্য রচনা করা আবশ্যক। বঙ্গভাষা বলিতে একটি অবিচ্ছিন্ন ভাষা বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র বঙ্গভাষা, আবার কেহ কেহ বলেন পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গের জন্যও স্বতন্ত্র ভাষা হওয়া আবশ্যক। বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার ব্যবচ্ছেদ হয় নাই। জাতি ও বর্ণভেদ অনুসারে ভাষার ভেদ হওয়া অযৌক্তিক। ভাষার যতই ভেদ হইবে শ্রেণীগত পার্থক্য ততই বৃদ্ধি পাইবে, জাতীয় জীবনের ততই লোপ হইবে, সাহিত্যের ততই অবনতি ঘটিবে।'[১৩]

'যশোহর খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতির' একটি বিশেষ অধিবেশেনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সভাপতি হিসাবে উপস্থিত থাকেন এবং সভাপতির ভাষণে 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' শীর্ষক একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের রচনাকাল সম্ভবত ২১ এপ্রিল ১৯১৮। ঐ একই বছরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তৎকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের সীমাবদ্ধতা এবং মুসলমানদের কৃষ্টি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সপক্ষে কি ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান ধারা সম্পর্কেও এই গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন যে কোন সংস্কার সাধনে উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনেক সত্য উদঘাটনে একখানি নির্ভরযোগ্য ও ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

---

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ৪৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

৮. শিক্ষা বিষয়কঃ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর চাকরি জীবনের পুরোটাই শিক্ষা বিভাগে অতিবাহিত হয়েছে। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা এবং পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন। এর ফলে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকেন এবং এর যাবতীয় অন্তরায় দূরীকরণে সচেষ্ট হন। শিক্ষা, শিক্ষকতা ও শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কিত তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থ হলোঃ 'টীচারস ম্যানুয়েল' এবং 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান'। 'টীচারস ম্যানুয়েল' গ্রন্থে শিক্ষা দান প্রণালী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে একজন শিক্ষকের বিভিন্নমুখী দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে যেমন আলোকপাত করা হয়েছে তেমনি শিক্ষা তথা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষালয়ে পঠিত বিভিন্ন বিষয়ক পাঠ ও পাঠের রীতিনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক এ গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেনঃ

> 'মনুষ্যত্ব লাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক এই ত্রিবিধ বৃত্তির সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। শরীর, মন ও আত্মা প্রত্যেকেরই পুষ্টিসাধন হইলে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য হয়। উদ্ভিজ্জ বীজ যেমন বায়ু, জল ও সূর্য্যাতপ সাহায্যে ফলবান বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, শিশুও সেইরূপ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা বলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে।'[১৪]

অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কেও এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। 'শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক বলেছেনঃ

> 'বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা সমস্যার সহিত রাজনৈতিক সমস্যা জড়িত। জাতির প্রধান সম্প্রদায়গুলি সমভাবে উন্নত না হইলে জাতীয় জীবন সুগঠিত হইতে

---

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

পারে না। প্রধান সম্প্রদায়গুলিকে সমান সুবিধা দান করা এবং সমভাবে উন্নতির পথে চালনা করিয়া জাতীয় অভীষ্ট লাভে সহায়তা করা প্রত্যেক গভর্ণমেন্টের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। শরীরের অঙ্গ বিশেষের মাংসপেশীগুলির পরিচালনা করা এবং অবশিষ্টগুলিকে অকর্মণ্য করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নহে, কারণ প্রকৃত শক্তি লাভ মাত্র তখনই সম্ভব হয়, যখন ইচ্ছাবৃত্তির আজ্ঞাধীন হইয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একোদ্দিষ্ট হইয়া শ্রমলিপ্ত হয়। যে অঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল তাহাদের দিকেই অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং জাতির সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই জ্ঞানবিস্তার করা গভর্নমেন্টের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।[১৫]

'শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান' গ্রন্থটিতে অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা এবং তাদের শিক্ষার উন্নতির সপক্ষে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি এই গ্রন্থে মোছলেম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায় সমূহ নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করেছেনঃ

১. সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির দারিদ্র্য।
২. ধর্ম শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব।
৩. ভাষা-বাহুল্য।
৪. স্কুল কলেজের শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে মোছলমানের সংখ্যা স্বল্পতা।
৫. স্কুল এবং কলেজে হোষ্টেলের ব্যয়াধিক্য।
৬. শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদে মোছলমানদের অপ্রাচুর্য্য।
৭. বিশ্ববিদ্যালয় এবং তদসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানাদিতে মোছলমান প্রতিনিধির অভাব।
৮. ডিষ্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে উপযুক্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি গ্রহনের অভাব।[১৬]

---

[১৫] প্রাগুক্ত।

[১৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাবাহুল্য সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর যুক্তি ও পরামর্শ অত্যন্ত বাস্তবমুখী এবং সময়োপযোগী চিন্তার পরিচয় বহন করে এবং একই সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালবাসা ও আস্থার কথাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে এ সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ

> 'ভাষা বাহুল্য মোছলমান ছাত্রের পক্ষে এক জটিল সমস্যা এবং ইহার সম্যক সমাধানও প্রায় অসম্ভব। (ধর্মগ্রন্থ) কোরআনের ভাষা, মোছলমানের ইতিহাস এবং হাদিস তফছিরাদির ভাষা, সরকারী রাজভাষা এবং স্বীয় মাতৃভাষা, মোছলমান ছাত্রকে ইহার সবগুলিই শিক্ষা করিতে হয়। ধর্মগ্রন্থের ভাষা এবং মাতৃভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য্য। আবার ইংরেজি প্রায় পৃথিবীর সাধারণ ভাষা হইয়া পড়িয়াছে; বিশেষতঃ সামাজিক বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কারণে ইংরেজি শিক্ষা না করিলে চলে না। সুতরাং জাতীয় ইতিহাস ইত্যাদি বহুল পরিমানে মাতৃভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হইলে মোছলমান ছাত্রের গুরুভারের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে। বাঙ্গালার মোছলমানের মাতৃভাষা ভারতের অন্যান্য মোছলমানের মাতৃভাষা হইতে স্বতন্ত্র বিধায় তাহাদের পক্ষে এই ভাষা সমস্যা আরও জটিলতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পারস্য ভাষা উঠাইয়া দিলে এবং ক্রমে ক্রমে উর্দুর পরিবর্তে বাঙ্গালা প্রচলন হইলে ভাষা সমস্যা কিছু সরল হইয়া আসিবে।'[১৭]

৯. ভ্রমণ কাহিনীঃ

'হেজাজ ভ্রমণ' খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর উল্লেখযোগ্য একটি ভ্রমণ কাহিনী। তিনি যখন কোলকাতার প্রেসিডেন্সি বিভাগের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর পদে নিয়োজিত সে সময়ে হজ্জব্রত পালন করেন। হজ্জ পালনের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা এবং দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল সফর

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনী অবলম্বনে এই ভ্রমণ কাহিনী রচিত হয়েছে। হেজাজ ভ্রমণের দৈনিক ঘটনাবলীর একটি বিবরণ লেখক গ্রন্থটির শেষাংশে লিপিবদ্ধ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি হজ্জের দিনপঞ্জি মনে হতে পারে। কিন্তু গ্রন্থে সন্নিবেশিত বিভিন্ন তথ্যাদি গ্রন্থের মূল্যমান বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। ইংরেজ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'হেজাজ যাত্রী সম্পর্কীয় গাইড' অনুসরণে এবং স্বীয় হজ্জ পালনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যে সকল তথ্য উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে হজ্জ সংক্রান্ত বিভিন্ন খরচের বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যেমনঃ

> 'জাহাজ ভাড়া নির্দিষ্ট নাই, তবে টার্নার মরিসন কোং- এর বোম্বাই বা করাচী হইতে জিদ্দা পর্যন্ত যাতায়াত জাহাজ ভাড়া প্রথম শ্রেণীর জন্য ৫৫০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ৪৫০ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য যাতায়াত ভাড়া ২০৫ টাকা। রিটার্ন টিকিটের মেয়াদ ১৮ মাস। এক বৎসরের অধিক বয়স্ক শিশুর ভাড়া পূর্ণ হারে দিতে হয়।..... খোরাকী কোম্পানী সরবরাহ করিয়া থাকে। উহার জন্য টিকিটের সহিত ৩৫ টাকা করিয়া প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে আদায় করা হয়। ইহাতে যাত্রী-প্রতি দৈনিক তের আনা হিসাবে পড়ে।'[১৮]

একজন হজ্জযাত্রীর আবশ্যকীয় বিষয়াদি ছাড়াও গ্রন্থটিতে মক্কা মদিনা প্রভৃতি স্থানের সমাজ, রাষ্ট্র ও ইতিহাস বিষয়ক তথ্যাদির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মক্কা অধ্যায়ের আলোচনা তিনি শুরু করেছেন এভাবেঃ

> 'মক্কা হেজাজের প্রধান শহর এবং বিশ্ব মোছলেমের পবিত্র স্থান। পূর্ব্বে মক্কা মরুভূমির মধ্যস্থিত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল। উষ্ট্র পৃষ্ঠেই মালের আমদানী ও রপ্তানী। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মিসর তুর্কী সাম্রাজ্যের অধিকারভূক্ত হইলে ওছমানিয়া ছোলতানগণ মক্কার উন্নতিকল্পে ব্রতী হন এবং ষোড়শ শতাব্দীতে হারাম শরীফের বিশেষ সমৃদ্ধি সাধিত হয়। ক্রমে তুর্কী শক্তি

---

[১৮] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

> হীনবল হইয়া পড়ে এবং শরীফের ক্ষমতা বলবতী হয়। হেজাজ রেলওয়ে ছোলতানের ক্ষমতা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল। শরীফ হোছেন স্বীয় ক্ষতির আশঙ্কায় উক্ত রেলওয়ের মক্কা পর্যন্ত বিস্তৃতির প্রস্তাব প্রতিরোধ করেন এবং মহাযুদ্ধের সময় ইহা উৎপাটিত হয়। ১৯১৯ সন হইতে ১৯২৫ সন পর্যন্ত ওহাবীগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে এবং হাশেম বংশীয় গভর্নমেন্ট তিরোহিত হয়। তায়েফ যুদ্ধের পর এবনে ছউদ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিনা রক্তপাতে মক্কা অধিকার করেন।[১৯]

গ্রন্থটিতে মক্কা মদিনার অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের কথাও আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে সমাজ জীবনের বিভিন্ন খুটিনাটি দিক। মক্কা মদিনার ডাক ও তার ব্যবস্থা এবং ডাক তারের মাশুলও গ্রন্থটিতে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন বৈদেশিক টেলিগ্রাফের জন্য প্রতি শব্দ, জেদ্দা মক্কা ও তায়েফের মধ্যে ১/২ গোর্শ, তুরস্কের জন্য ১৯ গোর্শ, ভারত বর্ষ ও ব্রহ্মদেশের জন্য ১৮ গোর্শ, জাভার জন্য ২৫ গোর্শ, লন্ডনের জন্য ৭ গোর্শ ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, ১ গোর্শ= তৎকালীন এক আনার সমান। এভাবে হেজাজ ভ্রমণকে গতানুগতিক ভ্রমণ কাহিনী না বলে একখানি ঐতিহাসিক দলিল বলে চিহ্নিত করা যায়।

এ পর্যায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সূফীতত্ত্ব ও সূফী মতাদর্শ নিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর রচিত 'সুফী' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটিতে এক দিকে যেমন ছূফীতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি 'সূফী প্রেমাবলে কিরূপে পরমাত্মা জ্ঞান লাভ করে' সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। 'জ্ঞান বা কর্মমার্গের কথা' এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নয়। গ্রন্থটিতে আল্লাহর স্বরূপ এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক তথা স্রষ্টার সাথে মানবের সংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবশ্য করণীয় বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। লেখক সূফীর অন্তর্গত রূপের বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

---

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

'সকল ধর্মের ক্রমিক সংস্কার সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু তাছাওউফ আদিকাল হইতে বর্ত্তমান পর্যন্ত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, ছূফী সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিতে তৎপর, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ছূফীর শিক্ষা এই-সংসারের মধ্যে অবস্থিতি কর, কিন্তু সংসার-কীট সাজিও না; তোমার সমগ্র চিন্তাশক্তি আত্মার উন্নতি পথে নিয়োগ কর, তবেই জাগতিক কর্ত্তব্য প্রকৃতিরূপে প্রতিপালিত হইবে। আত্মিক শক্তি ধারণের জন্য দেহের সৃষ্টি। আত্মাতেই সকল প্রকার গুপ্ত শক্তি নিহিত, উহার ক্রমিক বিকাশই জীবনের উদ্দেশ্য। পরম শক্তির বীজ আত্মাতে উপ্ত, শরীরের সাহায্যে উক্ত শক্তির বিকাশই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।'[২০]

এই পর্যায়ের আর একটি গ্রন্থ 'মহর্ষি রুমী' যেখানে লেখক সূফী মতাদর্শের অনুসারী প্রেমিকপুরুষ মহর্ষি রুমির জীবন ও মতবাদের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা ইসলামীতত্ত্ব সম্বলিত গ্রন্থ 'সৃষ্টিতত্ত্ব' গ্রন্থে লেখক জীবন, জগৎ, সৃষ্টিরহস্য এবং স্বরূপ সম্পর্কে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্র হইতে উদ্ভূত ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল'-লেখকের এ ধারণা থেকে গ্রন্থটির সূচনা এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এর ব্যাপ্তি ঘটেছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) মাতৃভাষায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিমল অনুরাগের পরিচয় শুধু দেননি, তৎকালীন সাহিত্য সমাজ ও সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ১৯১৭-১৯১৮ সালের কার্যকরী পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুল করিম এবং সম্পাদক ছিলেন জনাব মোজাম্মেল হক। সমিতির দু'জন 'সহকারী সভাপতি' ছিলেন। খানবাহাদুর

---

[২০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্ছানউল্লা (রঃ) ছাড়া দ্বিতীয় সহকারী সভাপতি ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আকরাম খান।[২১] বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি তৎকালীন সাহিত্য আন্দেলনে যে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে তা অনেকেরই জানা আছে। সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতির উদ্দেশ্য নিম্নোক্তভাবে প্রচার করা হয়ঃ

১. 'বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও তাহার পরিপুষ্টি সাধন।

২. আরবী, পারসী ও উর্দ্দূ প্রভৃতি ভাষা হইতে ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাসাদির অনুবাদ প্রকাশ।

৩. প্রাচীন মুসলমান-বঙ্গ-সাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

৪. বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের পীর ও সাধুপুরুষদিগের (ওলীদিগের) জীবনী সংগ্রহ ও প্রকাশ।

৫. বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের প্রাচীন বংশাবলীর ও প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাসের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ।

৬. বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের মাসিক সাময়িকী, সাপ্তাহিক পত্রের বহুল প্রচার।

৭. সদগ্রন্থের প্রচারকল্পে সাহিত্যসেবীদিগকে উৎসাহ প্রদান।

৮. সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন।'[২২]

১৩২৫ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত এই সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় লক্ষ্য করা যায় যে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির উন্নতিকল্পে বারোজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী এককালীন বা মাসিক বা উভয়বিধ নির্দিষ্ট একটি অঙ্কের চাঁদা প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) মাসিক তিনশত টাকা চাঁদা প্রদানে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এখন থেকে সত্তর বছর আগে এই তিন টাকার ব্যবহারিক মূল্য

---

[২১] বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৫, পৃঃ ৭৪-৭৫।

[২২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

যে কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এককালীন বা মাসিক চাঁদা প্রদানে প্রতিশ্রুত ব্যক্তিদের নাম তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন খানবাহাদুর সৈয়দ আবদুল লতিফ, এস.ওয়াজেদ আলী, এলাহী বখশ মল্লিক, মৌলভী আবদুল করিম, মোঃ ইউসুফ খান প্রমুখ।[২৩]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর মনোজগৎ ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস কেন্দ্রিক হলেও তথাকথিত ধর্মপ্রচার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ধর্মের সত্যিকার নির্যাসকে তিনি মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি ইতিহাস আশ্রয়ী গ্রন্থ লিখেছেন; ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার জন্য নয়। ইতিহাসের অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসকে সত্যাশ্রয়ী করে পরিবেশন করার জন্য তিনি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও জীবন যাপনের বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ রূপের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করিয়েছেন। এর ফলে ঐতিহাসিক তথ্যের কোথাও বিলোপ ঘটেনি কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক বিকৃতির সংশোধন হয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ৮০টি গ্রন্থের কথা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এর বাইরেও তাঁর অনেক লেখা লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যথাযথ অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে তাঁর নতুন মূল্যায়ন হবে বলে আমার বিশ্বাস। ১৩৩০ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত সাম্যবাদী পত্রিকার ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় তাঁর এমন একটি লেখার সন্ধান পাওয়া গেছে। 'সান্দারদের প্রতি সমাজের অবিচার' শীর্ষক এই প্রবন্ধে সামাজিক আচার আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় কূপমন্ডুকতার শিকার সান্দারদের দুঃখ দুর্দশার করুণ চিত্র এবং তার সমাধানের যে ইঙ্গিত তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এ প্রবন্ধটির সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম এবং ফোকলোর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একখানি মূল্যবান দলিল। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলঃ

---

[২৩] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত 'খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ (রঃ) জীবন ও জীবন চেতনা' শীর্ষক অপ্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

'খুচরা মনোহারী জিনিসপাতির ব্যবসার দ্বারা সান্দাররা জীবিকা অর্জন করে। ইহা নিতান্ত হালাল রুজী। সান্দাররা পর্দা প্রথা মানে না; তাহা ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে ইহারা অন্যান্য সাধারণ মুসলমানের মত ইসলাম ধর্মের পায়রবী করে। ইহাদের মধ্যে মুনশী, মৌলভী ও হাজি বিরল নহেন। অথচ সাধারণ মুসলমান সমাজ ইহাদিগকে মুসলমান ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে ও তাহাদের সঙ্গে সমাজ-জামাত করিতে নারাজ। ইহা নিতান্ত এসলাম ধর্মের বিরুদ্ধ আচার ও দুঃখের বিষয়।

আমরা স্থানীয় মাতব্বর মুসলমান ভাইগণকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা কোন যোগ্য আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানুন, সান্দারদিগের নিকট উপযুক্ত দামেও জমি বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া তাহারা দীন এলেমের অপমান করতঃ পাপের কাজ করিতেছেন কি না। আরও ভাবিবার বিষয়, পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু সন্ন্যাসীরা বহু মুসলমানকে হিন্দু করিয়া লইতেছে। মুসলমানদের অনুদারতার জন্য এই সান্দারগণ যদি খোদা না করুন, হিন্দু হইয়া যায়, তবে মুসলমানগণই সাহায্য চাহিলে, আপনি সাধ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সে সাহায্য না করেন, তবে আপনি গুনাহ্গার হইবেন। অতএব, হে চন্দবাড়ী-ঝোপনার মুসলমান ভাইগণ, আপনারা আল্লাহ রছুলের দিকে চাহিয়া এই সান্দারগণকে সাহায্য ও সহানুভূতি করুন।'[২৪]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর রচনারীতি সহজেই পাঠককে আপ্লুত করে। তাঁর ভাষা সংযত এবং শান্ত। তাঁর লেখায় কোন ক্ষেত্রে উচ্ছাস প্রকাশ পেলেও সে উচ্ছাসের বন্যায় কখনো বক্তব্য ফিকে হয়ে যায়নি। তাঁর লেখায় শব্দনির্বাচনে, উপমা ও রূপকের ব্যবহারের

---

[২৪] সান্দারদের প্রতি সমাজের অবিচার, সাম্যবাদী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কোলকাতা ১৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে বাস্তবতার ছাপ সুস্পষ্ট। এ বাস্তবতার মধ্যে লেখকের অতি সূক্ষ্ম পর্যক্ষেণশক্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং নিগূঢ় রহস্যের স্পষ্টতা ত্বরান্বিত করেছে। আবার কোথাও এই বাস্তবতার সাথে অনুপম কবি প্রতিভা সংমিশ্রত হয়ে এক অভিনব ভাব পরিগ্রহ করেছে। বিশ্ব-প্রকৃতির মহিমার প্রতি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর দৃষ্টি চিরনিবদ্ধ ছিল এবং এদৃষ্টিকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রকৃতি স্রষ্টা, জীব স্রষ্টা, সকল সৃষ্টির স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। তাঁর লেখাপড়ার সময় তাঁর দৃষ্টির বিরাটত্ব বা ব্যাপকতা এবং অনন্যসাধারণ তীক্ষ্ণতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর গদ্যের একটি গতি আছে যা ছন্দোবদ্ধ বাক্যের গতির মত সুমধুর।

আদর্শবাদ এবং বস্তুতান্ত্রিকতা এ দু'টো সমভাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর লেখার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর 'বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতা' সমগ্র রচনারীতিকে পরিচালিত করেছে। ইসলামের চিরাচরিত বিষয়বস্তুকে বুদ্ধিনির্ভর অকাট্য যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) একটি বিশেষ সময়ে হৃতসর্বস্ব মুসলমান জাতির পুনর্জাগরণের জন্য লেখনী ধারন করেন। একটি রচনার প্রসাদগুণে এবং বিষয়বস্তুর স্বকীয় উৎকৃষ্টতায় তাঁর রচনা যুগের গন্ডি কাটিয়ে চিরন্তন এবং সাহিত্যের সম্মান লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

খানবাহাদুর আহছানউল্লা(রঃ)এর সাহিত্যে ইসলামের মর্ম পরিচয় ও মানবপ্রেম

'যে মেহথর, সে যে আমা অপেক্ষা বেহতর, আমি বুঝি কৈ? আমি যে বস্তু পেটের মধ্যে রাখিয়া স্পর্ধা করি, আর সেই বস্তু আমারই স্বাস্থ্যসাধন হেতু পরিত্যক্ত হইলে যে ব্যক্তি আমারই কার্য্যে সহায়তা করে, আমি তাহাকে বলি অস্পৃশ্য? আমি অবোধ, তাই নিজের মলধারী শরীরকে পূজা করি, আর আমার সাহায্যকারী মেথরকে ঘৃণা করি, ছি! আমার জ্ঞানের।'[১]

উল্লিখিত একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সর্বব্যাপী মানব প্রেম ও দিগন্তপ্রসারী মানসের স্বরূপ বুঝে নেয়া সম্ভব। বুঝে নেয়া সম্ভব আত্মনিবেদিত নৈষ্ঠিক কর্ম, দায়িত্বনিষ্ঠতা, মহানুভবতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, দাপ্তরিক বিচক্ষণতা ও উজ্জ্বল চরিত্রগুনে যিনি বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক খানাবাহাদুর খেতাবে ভূষিত হন, তিনি কি রকম মাপের মানুষ ছিলেন। ছিলেন কি রকম উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানব প্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক এবং কি রকম সমাজ মনস্ক, মানব হিতৈষী তাও প্রকৃত স্বধর্মনিষ্ঠ কোন ব্যক্তি যে পরধর্মে অসহিষ্ণু ও পরসম্প্রদায়ে বিদ্বেষী হতে পারেন না খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যক্তি জীবনে তিনি পরম ধর্মনিষ্ঠ, দরবেশপ্রতিম সাধক ও পীরের মত নিরাসক্ত জীবনাচরণে অভ্যস্ত। অথচ সংসার, সমাজ ও পৃথিবী বিমুখতার বিশ্বাসে তিনি বিশ্বাসী নন। নিজেকে বড় মনে করে, শ্রেষ্ঠ মনে করে সমগ্র পৃথিবীকে তিনি কখনই অবজ্ঞা করেন নি। বরং তাঁর সার্বক্ষনিক প্রার্থনা ছিলঃ

---

[১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, 'আমার জীবন ধারা', খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, জয় প্রকাশনা, ঢাকা, ২৬ মাঘ ১৩৯৪/১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃঃ ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

'হে খোদা! তুমি রাব্বুল আলামীন, আর আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমাকে তোমার নিকৃষ্টতম গোলামের গোলাম্‌তি করিবার ক্ষমতা দাও।আর তোমার বান্দার দপ্তরের হীনতম স্থানে নামটি লিখাইবার অধিকার দাও। ..... আর ক্ষুদ্র ও মহৎ, ধনী ও নির্ধন, অজ্ঞ ও জ্ঞানী সবাইকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারি।'[২]

মহৎপ্রাণ আহছানউল্লা (রঃ) শত্রুকেও পরম প্রীতিভরে স্পর্শ করে; নিষ্ঠুর নির্যাতকের দিকেও অবলীলাক্রমে তাঁর পরোপকারের হাত প্রসারিত হয় এবং অভিসম্পাতকারীকে পর্যন্ত ক্ষমার সুশীতল বারিধারায় পবিত্র করে তোলে।

বিনয়ী, অকপট নিরহঙ্কার আহ্‌ছানউল্লা (রঃ) নিজেকে যেমন সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে করেন তেমনি অন্যকেও পরামর্শ দেন, 'নিজেকে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে করিবে।'[৩] 'অহঙ্কার করিবে না।'[৪] 'কোনো ধর্মকে অশ্রদ্ধা করিবে না।'[৫] 'লোকের বাহবা লইবার উদ্দেশ্যে, কিংবা নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কোন কাজ করিবে না।'[৬] শুধু তাই নয়। তাঁর বিবেচনায় 'মানব প্রেম সকল ধর্মের প্রধান স্তম্ভ'[৭] এবং সৃষ্টিপ্রেম স্রষ্টা প্রাপ্তির রাজপথ। তাঁর সমাজ ভাবনার মূল কথাও ঐ একটিই; মানব প্রেম, সৃষ্টি প্রেম। আবার তাঁর মানবপ্রেমে যেমন নাই দেশকাল পাত্রের ভেদ, তেমনি নর-নারীর ক্ষেত্রেও নাই। পর্দা অবশ্যই পালন করতে হবে, তবে পর্দার নামে মানব প্রজাতির অর্ধাংশ নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে অবরোধবাসিনী করে রাখার তিনি ঘোরতর বিরোধী; 'পরপুরুষের পক্ষে অপর মহিলার সাক্ষাৎ জায়েজ কিনা?' এরূপ

---

[২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৮।
[৩] গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা রচনাবলী, ১স খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ১ম প্রকাশ-১৯৯০, পৃঃ ৩৪৪।
[৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৫।
[৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৫।
[৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৫।
[৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

একটি প্রশ্নের জবাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কতিপয় পাল্টা প্রশ্ন করেন এবং প্রসঙ্গত নারীশিক্ষা, প্রয়োজনে বহিরাঙ্গনে নারীর কর্মভার গ্রহণ, সমাজসেবা, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে তিনি বলেনঃ

> 'হজরত আয়েশা (রাঃ) হজরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করেছিলেন কিনা? তিনি কি সৈনিকদিগকে দেখতেন না? প্রত্যেক যুদ্ধে আঁ-হজরতের সঙ্গে এক এক বিবি শরীক হইতেন কিনা? ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য না, আঁ-হজরতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল দেখবার জন্য ও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার জন্য? আজকাল মদীনা শরীফের স্ত্রীলোক রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে দৃষ্ট হয় কিনা, তারা কি চোখ বুজে চলেন? তারা কি শরীয়ত মানেন না। বর্ত্তমান অর্ব্বাচীন লোকের নেতৃত্বে ফল হয়েছে শহরের ২/৩ অংশ মহিলা T.B. তে আক্রান্ত! একবার সিরিয়া, ইরাক, ইরান, তুরষ্ক, মেছের ঘুরে আসুন, দেখুন সেখানকার মহিলারা কত কার্যক্ষম, কেউবা কলেজে লেকচার দেন, কেউবা সৈন্য চালনা করেন, কেউবা air force এ যোগদান করেন, কেউবা রাজনীতি চালনা করেন আর কেউবা দেশের খাদ্য সম্ভারের দায়িত্ব লন। সূর্যালোকের ভয়ে যারা আপদমস্তক বস্ত্রাবৃত করে দিনপাত করেন, তাঁদের মধ্যে কি সচ্চরিত্রতা আবদ্ধ? ইছলামের কি এই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা? আঁ-হজরত (সাঃ) না বলেছেন পুরুষের জন্য শিক্ষা যেরূপ জরুরী (ফরজ) স্ত্রী লোকের জন্যও সেইরূপ। আমাদের মধ্যে ক'টি মহিলা শিক্ষিতা, ক'টি মহিলা স্বীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান রাখে.... ..?'[৮]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) নারীশিক্ষা, নারী অধিকার, নারীর কর্মক্ষেত্র এবং কর্মক্ষমতা বিষয়ে কথাগুলো বলেন ভারত-পাকিস্তান স্বাধিকার পূর্বকালে ২ জুলাই ১৯৪৬ সালে।

---

[৮] প্রাগুক্ত, 'প্রেমিকের পত্রাবলি, পত্র সংখ্যা ১২৯,খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, রচনাবলী ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ -৪৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

আজকের শিক্ষিত, অধিকার সচেতনাতার সময়কালে বসে সেদিনের তমসাচ্ছন্ন অনগ্রসর সামাজিক পরিবেশের শিকার নারীজাতির অবস্থা ও অবস্থান যথার্থ রূপে অনুধাবন করা সত্যি কঠিন। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তা ছিল করুণতম, ভয়াবহতম ঐতিহাসিক সত্য এবং এ তথ্যসূত্র অনুসারে এদেশে নারী জাগরণের ইতিহাসে পূরোধা পুরুষ হিসেবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর আসন নির্ধারণ করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে এতদবিষয়ে তাঁর কল্যাণকর বাস্তবভিত্তিক প্রাগ্রসর চিন্তার স্বরূপ বুঝে নেয়া যায়। প্রসঙ্গত একথাও স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে, শাস্ত্রপন্থী একশ্রেণীর লোকদের পর্দানশীলতার কথা বলে নারীদের ইসলাম শিক্ষা থেকে বিরত রাখার প্রেক্ষাপটে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর প্রাগুক্ত প্রশ্ন।

সমাজ বিষয়ে এ এক অকুতোভয় সত্যোদ্বোধন মনস্বতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) নিষ্ঠাবান ধার্মিক ও পীর প্রতিমও বটে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানের পীরত্ব বলতে তিনি শুধু তছবীহ, দাড়ি, পাগড়ি আর পাঁচবার নামাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ বোঝেন না। তিনি বোঝেন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে আল্লাহর অনুসন্ধান, সৃষ্টির প্রেম, সমাজসেবা, মানবসেবা। তিনি বলেনঃ

> 'কেবল দাড়ি রাখলে, লম্বা তছবী নিলে, টুপি পরলে, আর কুলুখ নিলে মোছলমান হয় না। সারা জগতের মোছলমানকে দেখে আসুন, এবনে ছউদের পুত্রকে দেখুন, ইরাকের বাদশাকে দেখুন, মেছেরের শিক্ষা-মন্ত্রীকে দেখুন, তুরস্কের রাষ্ট্রপতিকে দেখুন, ইছলামের প্রতি তাঁদের ত্যাগের পরিমাণ দেখুন, বিলাতের ৫১ টি রাজন্যবর্গের বক্তৃতা পাঠ করুন, তাঁদের সহৃদয়তা পরীক্ষা করুন, বুঝবেন ইছলাম কেবল কুলুখে আর গোঁফ দাড়িতে সীমাবদ্ধ নহে। ইছলাম বলতে আত্ম-সমর্পণ বুঝায়, ইছলাম বলতে তছদিক বা অনুভূতি

Dhaka University Institutional Repository

বুঝায়। পাঁচবার ড্রিল করায় ইছলামের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। খোদার সহিত যার যোগাযোগ নাই, সে আবার মোছলেম কিসের?'[৯]

আগেই উল্লেখিত হয়েছে খানাবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)এর মতে খোদার সহিত যোগাযোগের অর্থ হচ্ছে জাত-পাত বিচার না করে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, সৃষ্টির সেবা করে, স্রষ্টাকে চিনে নেয়া, জেনে নেয়া, বান্দার সেবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। তিনি বলেনঃ

'যে জাত বিচার, বর্ণবিচার, স্থান বিচার করে সে তো অভিমানী। যেখানে অভিমান আছে, সেখানে সেবা অর্থহীন। স্রষ্টার রাজ্যে সকল সৃষ্টির সম অধিকার, তবে মানুষ কি নিয়ে বড়াই করে জানিনা।'[১০]

এক হিন্দু ভদ্রলোককে লিখিত ৫.১০.৪২ তারিখের একটি চিঠিতে তিনি বলেনঃ

'আপনি জ্ঞানী, আমি অজ্ঞ, তাই আপনাকেই কিছু বলতে লজ্জা নাই। আমাকে ক্ষমা করবেন, আবার বলি, আশীর্ব্বাদ করবেন। আমাকে দোওয়া করবেন যেন প্রত্যেক সৃষ্টির আশীর্ব্বাদভাজন হতে পারি, প্রত্যেক সৃষ্টের সেবক হতে পারি, যেন ভগবানের নিকৃষ্টতমকেও বুক পেতে দিতে পারি। প্রত্যেক সৃষ্ট স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত। তাই প্রতি সৃষ্টের পদারবিন্দ সদৃশ ক্ষুদ্রতম জনের শিরোভূষণ স্বরূপ। জড় অজড় সবাই আমার প্রণম্য, সকল অস্তিত্বে স্রষ্টার বিভা বিদ্যমান, সুতরাং কাকে আমি হেয় মনে করবো'।[১১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে মনুষ্যত্বের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি অবগত হওয়া যায় তাঁর ভেদাভেদহীন মানব প্রেমের অযুত উৎসধারার। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, ধর্মীয় কোন্দল, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের হানাহানি, হিন্দু-মুসলমানের আত্মঘাতী সংঘাত প্রভৃতি হাজারো রকমের সামাজিক সমস্যার ভয়াবয়হতার কথা স্মরণ

---

[৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৭।
[১০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮০।
[১১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাখতে হবে, স্মরণ রাখতে হবে যেকালের অবক্ষয়িত অমানবিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম লিখতে বাধ্য হয়েছিলেনঃ

'নাই সে ভারত মানুষের দেশ
এ শুধু পশুর কতল গাহ',

এবং ছোঁয়াছুয়ির প্রশ্নে বর্ণবৈষম্যের ত্রাহি চিৎকারকে অভিহিত করেছিলেন, 'জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া' বলে, সেই কালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সর্বপ্রকার আত্মম্ভরিতা, কৌলীন্য, ধর্মীয় অহমিকা এবং আত্মগত অহঙ্কার ত্যাগের ঘোষণা দিলেনঃ

> 'আমি নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনে করি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্মা আছে। উহা পরমাত্মা হইতে নিঃসৃত। সুতরাং কোন মানুষকে ঘৃণা করিলে স্রষ্টাকে ঘৃণা করা হয়। পুত্রকে ঘৃণা করিলে যেমন পিতাকে ঘৃণা করা হয়, সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করিলে স্রষ্টাকেই ঘৃণা করা হয়। তা সে যে জাতি বা ধর্মেরই হউক না কেন।'[১২]

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেনঃ

'বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন সে জাত?
কোন ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ?
নারায়ণের জাত যদি নাই
তোদের কেন জাতের বালাই?'[১৩]

কি জবাব আছে তার? তবুও অন্ধ বিশ্বাস আর কৌলীন্যের দুর্জয় মোহে মানুষ মানুষকে ছোট করে দেখে, ঘৃণা করে এবং একই সঙ্গে দেবতা বা স্রষ্টার উদ্দেশ্যে অর্পণ করে নৈবেদ্য, শ্রদ্ধাঞ্জলি, পূজা। মানব আচরণের এ এক চরম অসঙ্গতি ও হাস্যরসিকতা। বিষয়টি নজরুলের দৃষ্টিতে গরু মেরে জুতো দানের মত। তাঁর ভাষায়ঃ

---

[১২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯১।
[১৩] কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিষের বাঁশী', 'জাতের বজ্জাতি',নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড, নতুন সংস্করণ, ১১জ্যৈষ্ঠ ১৪০০/২৫ মে ১৯৯৩, পৃঃ ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

'(তোরা)ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধুপের ধোঁয়া।'[১৪] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর অনুভবে 'পুত্রকে ঘৃণা করিলে যেমন পিতাকে ঘৃণা করা হয় সেইরূপ'। নজরুল আহ্ছানউল্লায় সখ্যতা মূলত সত্যানুভবের ফল। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মাস্টার মহাশয় 'ভগবত্তত্ত্ব' জানতে চেয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কে পত্র লিখেন, তিনি তার উত্তরে লেখেনঃ

> ''ভগবত্তত্ত্ব' জানবার জন্য আপনার ঐৎসুক্য দেখে খুশী হলেম। 'বিধর্মী' অর্থে আমি বুঝি বিগত হইয়াছে ধর্ম যাহার। আপনাকে বিধর্মী মনে করিনা, আপনিও আমাকে বিধর্মী মনে করিবেন না, আশা করি। কোনো ধর্মে আঘাত করা ইছলামের শিক্ষা নয়। সকল ধর্মের মূলে মহাপ্রভু, তবে সময় বিশেষ অন্যান্য ধর্মেও বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মূলধর্ম, যাহা মহাপ্রভূ হইতে আসে, তাহার প্রধান শিক্ষা স্রষ্টা এক এবং তিনিই সত্য। বেদের উক্তি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। অন্যত্র কথিত আছে, 'তিনিই তিনি'। ইছলামের মত তাহাই। 'ছুফী' মত ইছলামের নির্যাস, ইহার সহিত বেদের প্রভূত সামঞ্জস্য আছে। ইছলামের Conception of God অতি উচ্চ। ভগবান বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ। God is both Immanent and Transcendent ও বটে। তাহার সত্তা বিশ্বে সীমাবদ্ধ নহে। তিনি অসীম এবং বিশ্ব সসীম, লক্ষ বিশ্ব সৃষ্টি করিলেও তিনি স্ব-পূর্ণ থাকিবেন।
>
> Transcendent God নির্গুণ আর Immanent God গুণান্বিত। তাঁহার স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, তাঁহার গুণাবলী জ্ঞাত। এখানে বেদের সহিত ইছলামের পুর্ণ সাদৃশ্য। বেদ মহাপ্রভূ হইতে প্রসূত, সুতরাং আপনি তো আমাদের ভাই, বিধর্মী নন। আপনার ধর্মকে আমি শ্রদ্ধা করি, যদিও পুরাণের সহিত আমি একমত নই। সারা বিশ্ব আমার নমস্য, সুতরাং আপনিও তাহার

[১৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্ভুক্ত। আমি আপনাকে যাহা লিখি তাহা উপদেষ্টা স্বরূপ নহে, বন্ধু স্বরূপ। আমি যে মহাপ্রভুর দাস, আপনিও সেই মহাপ্রভুর সৃষ্ট। আমার প্রভুকে আপনি জানতে চান, ভালবাসতে চান, ইহাতে আমি গর্ব্বিত। আমি Orthodox নই আমি অতি Liberal আপনাকে Liberal হতে বলি।'[১৫]

উপরোক্ত বিভিন্ন আলোচনায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সমাজ ভাবনা, স্রষ্টা ও সৃষ্টি ভাবনা, মানবপ্রেম, পরোপকারী মনোভাব, অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা, শিক্ষা, নারী শিক্ষা ভাবনা, কর্মপ্রেরণা প্রভৃতি বিষয়ে যে পরিচয় পাওয়া যায় তা তাঁর জীবন চেতনার মূলে আল কোরআনের ও আল হাদীসের সার্বজনীন শিক্ষার প্রভাব কাজ করেছে। এবং বহু বিষয়ে ব্যাপকতর অধ্যয়নের ফলে বিভিন্ন ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় মহাপুরুষদের নির্দেশাবলীর মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন নানাবিধ মিল। এতে ক্রমাগত এ বিশ্বাস তাঁর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সব ধর্মের মূল শিক্ষা এক। বিভিন্ন ধর্মের এই মিল তাঁকে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রাতৃপ্রতিম অনুভবে উদ্বেলিত করেছে। এ বিষয়ে কোরআনের একটি আয়াত তাঁর মানস গঠনে প্রভূত সাহায্য করেছে। আয়াতটিকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন 'মহাপুরুষদের অমীয়বাণী' গ্রন্থের ৩৭৪নং চয়নিকায় এবং তাঁর পূর্বে তিনি জুড়ে দিয়েছেন নিজের একটি কথা, 'ইছলাম সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়'[১৬] আয়াতটির সংশোধিত অনুবাদঃ

'বল-আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং তারই আজ্ঞাবহ।'(আল কোরআন-২৯/৪৬)।

---

[১৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, 'প্রেমিকের পত্রাবলি', খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ১মখন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৬-৪৮৭।

[১৬] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, 'মহাপুরুষের অমিয়বাণী', খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ৬ষ্ঠখন্ড, ঢা.আ.মি প্রকাশনী ২৬ মাঘ ১৩৯৯/ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃঃ ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাত্ম তত্ত্ববিদ সূফীগণের অমীয় বাণী 'সকল মানুষ এক অখন্ড জাতি'[১৭] এই কথার আলোকে খানবাহাদুর (রঃ) মনে করতেন মানব মাত্রেই একক জাতিতত্ত্ব। কোরআনের উক্ত আয়াতেও তা সুস্পষ্ট। রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যেও তিনি সন্ধান পেয়েছেন একই রকম বিশ্বাস। তাঁর মতেও 'কোন ধর্ম্ম হেয় নহে, প্রত্যেক ধর্ম্ম অসীম শক্তি হইতে প্রসূত; বিভিন্নধর্ম্ম সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকরণ। প্রাচীন ও আধুনিক কালের সকল ধর্ম্মই বরণীয়।'[১৮]

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন,'এক ধর্ম্মের নেতা সকল ধর্ম্মের নেতা।'[১৯] স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে ধর্ম, ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে ইত্যাকার বিশ্বাস খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এরও। সঙ্গত কারণেই তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ক্রিয়াকর্ম ও দর্শনের প্রতিরূপ যে ধর্ম, ধর্মসম্প্রদায় বা মানুষের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন, তিনিই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। ফলে সে সব শিক্ষা ও জীবন দর্শন, কর্ম ও দৃষ্টান্ত, সেবা ও মানব প্রেম, সমাজভাবনা ও সৃষ্টিপ্রীতি তাঁর সাহিত্য চর্চার বিষয় রূপে ধরা দিয়েছে।

তাই হজরত মুহাম্মদ (সঃ), হজরত আলী (রাঃ), রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, গুরুনানক, যিশুখ্রিষ্ট, গৌতম বুদ্ধ, বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রঃ), তাপসী রাবেয়া, মওলানা রুমী, শেখ সাদী, আল্লামা ইকবাল, এবনে ছউদ, আওরঙ্গজেব প্রমুখ মনীষীদের কর্ম ও কর্মজীবন, অধ্যাত্ম চেতনা, মানব সেবা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সর্বত্রই তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টি, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন, বিচার, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বকীয় ভাব প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। যেমন দেশপ্রেমের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি যেহেতু ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী দেশ কাল ভেদে সার্বজনীন মানব কল্যাণ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী, সেহেতু ভৌগোলিক সীমারেখায় দেশপ্রেমে আস্থা রাখতে পারেন না। তাঁর দেশপ্রেম আন্ত র্জাতিকতার বলয়ে দৃশ্যমান; যেমন, তাঁর রচনায়ঃ

---

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।

[১৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, 'ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি', খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ৫ম খন্ড, জয় প্রকাশনা, মাঘ ১৩৯৯/ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃঃ ২৫৪।

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

অবারিতই হবার কথা এবং একান্তভাবেই বিশ্বাস করবার কথা। 'যে মানব জাতির প্রতি সদয় নহে, খোদা তাহার প্রতি সদয় নহেন।'[২৩] এবং তার এই বিশ্বাস যে অযৌক্তিক নয়, এ কথা সম্ভবত অকপট সত্যভাষণের খাতিরে সকলেই স্বীকার করবেন। তবুও তিনি বারবার নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টাকে গভীরভাবে, মানুষের মনে দেবার মহত্তর উদ্দেশ্যে মানবপ্রেম, সমাজপ্রেম, নারীশিক্ষা, নারীঅধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মহাপুরুষদের অমৃতময় বচন স্বীয় গ্রন্থমালায় চয়ন করে বিবেকের দায়বদ্ধতা থেকে নিস্কৃতি লাভের চেষ্টা করেছেন। দু'একটি দৃষ্টান্তঃ

১. 'পুত্রকে যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়, কন্যাকেও তদ্রুপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রী জাতিকে স্ব স্ব সমস্যা সমাধানের সুযোগ দেওয়া উচিত।'[২৪]

২. 'যে শিক্ষাতে সৃষ্টির প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা না জন্মে, সে শিক্ষা নামের অযোগ্য।'[২৫]

৩. 'আমাদের দেশ স্ত্রী জাতির প্রতি সম্মান দেখাইতে পশ্চাৎপদ, তাই আমাদের দুর্দ্দশা, যাহারা স্ত্রী-জাতিকে সম্মান করে, উহাদের প্রতি প্রভু সন্তুষ্ট। যাহারা উহাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, উহাদের সকল কাজ ব্যর্থ হয়।'[২৬]

৪. 'সৃষ্টির খেদমত প্রকৃতই স্রষ্টার খেদমত। প্রত্যেকটি পুরুষকে, প্রত্যেকটি মহিলাকে, প্রত্যেকটি শিশুকে খেদমত কর। সৃষ্টিকে সেবা করিয়াই স্রষ্টার অনুগ্রহ ভাজন হও, নিজের মনে কখনও স্পর্ধা আনিও না, মনে করিও তুমি তাহারই অনুগ্রহে সৃষ্টির সেবা করিতে সক্ষম। দুর্গত জনের উপকার সাধন করিয়া স্বীয় মুক্তি লাভে সমর্থ হও। উৎপীড়িতের দুঃখ মোচন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। তিনিই মহাপুরুষ, যাহার অন্তর

---

[২২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০।
[২৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০।
[২৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।
[২৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।
[২৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

'আজকাল দেশহিতৈষণ্য লইয়া সর্ব্বত্র হৈ চৈ পড়িয়াছে। দেশ সেবাকেই লোকে একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইছলাম কেবল দেশ লইয়াই সীমাবদ্ধ নহে। ইহার প্রসার তদপেক্ষা অতিবৃহৎ। জাতি নির্ব্বিশেষে, দেশ নির্ব্বিশেষে, কাল নির্ব্বিশেষে, স্থান নির্ব্বিশেষে, ধর্ম নির্ব্বিশেষে ইসলাম জগৎকে আপনার করিতে শিখায়। ইসলাম সমস্ত জগৎ লইয়া ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, ইসলাম সমস্ত প্রাণীজগৎকে প্রেম শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। ক্রমে প্রাণীজগৎ ছাড়িয়া ইছলাম জড় জগতে পৌঁছে। জড় ও অজড়কে এন্‌ছান ভালবাসিতে শিখে এবং প্রেমময়ের সৃষ্টি বলিয়া তাহাদের সহিত প্রেমভাবের আদান প্রদান করে।.....ইছলাম জড়জগতেও আত্মা আরোপ করে এবং সর্ব্বভূতে দয়া করিতে ও ভালবাসিতে শিখায়। প্রকৃতই যে 'জড় ও অজড় সকল পদার্থই প্রেমময় হইতে উৎপন্ন ও উহারা সকলেই প্রেমময়ে প্রত্যাগত হইবে' এই কোরআন-বাণী মহাসত্য। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জগতের সমস্ত বস্তুই অনুপ্রাণিত। সমস্ত বস্তুতেই আত্মা নিহিত এবং সমস্ত আত্মাতেই প্রেমবীজ উত্তপ্ত। এই প্রেমকেই বিজ্ঞান মহাকর্ষণ আখ্যা দিয়েছে। এমন বস্তু নাই, যাহা মহাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট নহে। পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্কমন্ডল এবং কঠিন, তরল, বায়বীয় সমস্ত পদার্থই মহাকর্ষণ দ্বারা সঞ্জীবিত। সকলেই অলক্ষ্যে ও অপ্রতিহতভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে।'[২০]

তাই তিনি বিশ্বাস করেন, 'সকল সৃষ্টজীব খোদা তায়ালার একই পরিবারভূক্ত'[২১] এবং 'তিনিই খোদার প্রিয়, যিনি খোদার সৃষ্টজীবকে ভালবাসেন'[২২] সেহেতু তাঁর দেশপ্রেমের সীমানা

---

[২০] খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা,'ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ', খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা রচনাবলী ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।

[২১] খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা, 'ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি' খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা রচনাবলী ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

অবারিতই হবার কথা এবং একান্তভাবেই বিশ্বাস করবার কথা। 'যে মানব জাতির প্রতি সদয় নহে, খোদা তাহার প্রতি সদয় নহেন।'[২৩] এবং তার এই বিশ্বাস যে অযৌক্তিক নয়, এ কথা সম্ভবত অকপট সত্যভাষণের খাতিরে সকলেই স্বীকার করবেন। তবুও তিনি বারবার নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টাকে গভীরভাবে, মানুষের মনে দেবার মহত্তর উদ্দেশ্যে মানবপ্রেম, সমাজপ্রেম, নারীশিক্ষা, নারীঅধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মহাপুরুষদের অমৃতময় বচন স্বীয় গ্রন্থমালায় চয়ন করে বিবেকের দায়বদ্ধতা থেকে নিস্কৃতি লাভের চেষ্টা করেছেন। দু'একটি দৃষ্টান্তঃ

১. 'পুত্রকে যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা দেওয়া হয়, কন্যাকেও তদ্রুপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রী জাতিকে স্ব স্ব সমস্যা সমাধানের সুযোগ দেওয়া উচিত।'[২৪]

২. 'যে শিক্ষাতে সৃষ্টির প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা না জন্মে, সে শিক্ষা নামের অযোগ্য।'[২৫]

৩. 'আমাদের দেশ স্ত্রী জাতির প্রতি সম্মান দেখাইতে পশ্চাৎপদ, তাই আমাদের দুর্দ্দশা, যাহারা স্ত্রী-জাতিকে সম্মান করে, উহাদের প্রতি প্রভু সন্তুষ্ট। যাহারা উহাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, উহাদের সকল কাজ ব্যর্থ হয়।'[২৬]

৪. 'সৃষ্টির খেদমত প্রকৃতই স্রষ্টার খেদমত। প্রত্যেকটি পুরুষকে, প্রত্যেকটি মহিলাকে, প্রত্যেকটি শিশুকে খেদমত কর। সৃষ্টিকে সেবা করিয়াই স্রষ্টার অনুগ্রহ ভাজন হও, নিজের মনে কখনও স্পর্ধা আনিও না, মনে করিও তুমি তাহারই অনুগ্রহে সৃষ্টির সেবা করিতে সক্ষম। দুর্গত জনের উপকার সাধন করিয়া স্বীয় মুক্তি লাভে সমর্থ হও। উৎপীড়িতের দুঃখ মোচন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। তিনিই মহাপুরুষ, যাহার অন্তর

---

[২২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০।
[২৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪০।
[২৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।
[২৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।
[২৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্যের জন্য ব্যথিত। তাহারাই প্রকৃত বিদ্রোহী, যাহারা প্রতিবেশীর ক্ষুধা তৃষ্ণার প্রতি উদাসীন। দরিদ্র, উৎপীড়িত, দুর্বল সবাই স্রষ্টার সৃষ্ট। তবে কেন তাহাদিগকে উপেক্ষা কর?'[২৭]

৫. 'তুমি নামের জন্য কেন এত ব্যস্ত? লোককে ভালবাস, স্বার্থপরতা ত্যাগ কর। ভীষণ শত্রুর প্রতিও কুবাক্য প্রয়োগ বা দুর্ব্যবহার করিও না। প্রেম জীবনী শক্তিকে প্রসার করে; যাহার প্রেম নাই, সে মৃত্যুকে বরণ করে। প্রেমই জীবনের মাপকাঠি, প্রেমশূণ্য ব্যক্তি জড়বৎ, প্রাণহীন। জীবনের উদ্দেশ্য পৃথিবীর সেবা, নাম খরিদ নহে।'[২৮]

৬. 'প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক স্ত্রীকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে স্বীয় দায়িত্বের উপলব্ধি হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রত্যেককে জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।'[২৯]

হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদর্শিত শাশ্বত জীবনাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর আত্মদর্শন। হজরতের অনুসৃত পথে জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে আহ্ছানউল্লা (রঃ) যাঁর কর্ম ও মর্ম, বাণী ও আদর্শের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর প্রতিই ব্যক্ত করেছেন নিঃশর্ত শ্রদ্ধা। রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর জীবনে এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি। তাঁদের উপদেশাবলীর মর্মব্যঞ্জনা ও তাৎপর্যের সঙ্গে খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)এর আত্মদর্শনের গভীরতর সাদৃশ্য আছে। এবং তাই বলেই তাঁদের উক্তিগুলো গ্রন্থবদ্ধ করেছেন নিষ্ঠাবান গ্রন্থাকার হিসাবে, সামাজিক দায়িত্ব মনে করে। 'যাহা নিজের জন্য ভালো মনে করো না তাহা অন্যের জন্য ভালো মনে করো না।'[৩০] হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এ বাণীকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) জীবন

---

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৬।
[২৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭।
[২৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪।
[৩০] খানবাহাদুর আহ্ছানউলা, 'মহাপুরুষের অমিয়বাণী', খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ৬ষ্ঠখন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

চলার পথের আলোকবর্তিকা স্বরূপ মনে করতেন। তদুপরি তাঁর দীক্ষাগুরু ছৈয়দ ওয়ারেছ আলী শাহের 'লোকের প্রতি যার প্রেম নাই, খোদার প্রতিও তার প্রেম নাই' কে তিনি করে তুলেছিলেন জীবন অনুজ্ঞা। ফলে পরমহংস, বিবেকানন্দ, এবনে ছউদ, মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক, আওরঙ্গজেব শুধু নয়-যে কোন খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তির কল্যাণানুগ মনীষার মানবহিতৈষণা মূলক শিক্ষা ও শিক্ষণীয় সকল কিছুকে তিনি সার্বজনীন মানব সম্পত্তি মনে করতেন। এ কারণেই 'ক্ষুধার্তকে আহার্য দিবে এবং পীড়িতকে সেবা করিবে। যে দাস অন্যায় ভাবে অবরুদ্ধ, তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে। উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য করিবে, সে মোছলমান হউক বা না হউক',[৩১] হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই হাদীসের প্রতি যেমন তিনি শ্রদ্ধাবান, তেমনি শ্রদ্ধাবান রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দের অনুরূপ এ বাণীর প্রতিও 'সকলকে ভালবাসো। হিন্দু-মুসলমান বা খ্রিস্টান বলে নাক সিটকে ঘৃণা করনা।'[৩২] এমন কি ইসলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি-একই সঙ্গে গ্রন্থ শিরোনামে মর্যাদা লাভ কল্লেছে তাঁর হাতে। এ থেকে মানবকল্যাণী, সমাজকল্যাণী আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর আত্মগত দর্শনের পবিত্রতা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অনন্য প্রতিভাধর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অমিত বিক্রমশালী সিংহ পুরুষ এবং নব্য আরবের প্রতিষ্ঠাতা এবনে ছউদ সম্পর্কে 'এবনে ছউদ' গ্রন্থের উপসংহারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বলেন, 'তিনি দরিদ্রের প্রতি দয়াশীল, অপরাধীর প্রতি কঠোর ও দুর্দ্দম, জন সাধারণের নিরাপদ শান্তির প্রতি উদগ্রীব।'[৩৩] তাঁর এই উক্তির মধ্য থেকে এবনে ছউদের প্রতি তাঁর মানস দুর্বলতার কারণ অনুমান করা যায়। 'ধর্ম্ম-বর্জ্জিত শিক্ষা সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ'[৩৪] যিনি করেন তিনি যে খানবাহাদুর (রঃ)এর প্রিয়তর ব্যক্তি হবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ঐটুকুই উভয়ের মানস ঐক্যের একমাত্র সূত্র নয়; কারণও আছে, সেটা হচ্ছে

---

[৩১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, মহাপুরুষদের অমিয় বাণী, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ,৬ষ্ঠ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪।

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩০।

[৩৩] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, 'এবনে ছউদ', খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ৭ম খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃঃ ৭৬।

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

এবনে ছউদের শিক্ষাপ্রেম, সমাজপ্রেম, মানবপ্রেম। তাঁর শাসনামলেই ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় 'বৈষয়িক ও শিল্পকলা শিক্ষাদান।'[৩৫]

কোরআন, হাদীস, বিজ্ঞান দর্শন, প্রযুক্তি জাগতিক উন্নতির পরিপন্থী নহে, এটা যেমন খানবাহাদুর (রঃ)এর ধারণা এবনে ছউদও তেমনি বলেন, 'কোরআন কিংবা হাদীছ উন্নতির অপক্ষপাতী নহে। জাগতিক অগ্রগতির সহিত নতুন উপকরণ অত্যাবশ্যক। বেতার, টেলিফোন, মোটর আধুনিক শাসনের প্রধান উপাদান।'[৩৬] আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সাথে এবনে ছউদের মানসিকতার মিল এই প্রাগ্রসর চিন্তার ফসল। 'যুথ-ছিন্ন যাযাবর আরব জনতাকে লুণ্ঠন বৃত্তি হইতে নিরত করিয়া এক স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান',[৩৭] করানোর কৃতিত্ব প্রদান করেছেন ইবনে ছউদকেই। তিনি বলেনঃ

> 'তাঁহার কঠোর শাসনফলে অত্যাচার ও অনাচার নিরস্ত হইয়াছে। উন্মুক্ত পথপ্রান্তে যে কোন ব্যক্তি মালআছ্বাব পরিত্যাগ করিয়া সপ্তাহ পরে প্রত্যাবর্ত্তন করত তাহা পুনঃ পাইবার আশা রাখিতে পারে। যেদেশে লুটতরাজের কেন্দ্রভূমি ছিল, আজ সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান।'[৩৮]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এবনে ছউদের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন ন্যায়পরায়ণতা-আড়ম্বরহীনতা যা তাঁর নিজের চরিত্রেরই অন্যতম ভূষণ। ঐতিহাসিক Armstrong তাঁর 'Lord of the Desert' নামক গ্রন্থেও এবনে ছউদকে 'ন্যায়বান, আড়ম্বর-বিহীন'[৩৯] বলে শনাক্ত করেছেন। 'শেখ বা গোলাম, ধনী বা নির্ধন সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ। তাঁহার দরবারে অভ্যাগত সর্ব্বদা গৃহীত ও সমাহত।'[৪০] বিষয়টি তখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে,

---

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।
[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪-৭৫।
[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।
[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।
[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।
[৪০] প্রাগুক্ত, ।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটেছে। এবনে ছউদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার এটিও একটি বড় কারণ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর। তদুপরি 'বড়ই নিষ্ঠাবান, যুগের কোন প্রকার দুর্নীতি ও অনাচার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।'[৪১] এমন কি এবনে ছউদ ছিলেন দরবেশের ন্যায় নিরাসক্ত। তিনি বলতেনঃ

> 'অর্থ সঞ্চিত রাখিবার জন্য নহে। আমার পূর্বপুরুষের এবং আমার নিজের কখনও কোন সিন্দুক ছিলনা কিংবা এখনও নাই। সঞ্চিত অর্থের কোন মূল্য নাই। আব্দুল হামিদের ক্রোড়াধিক মুদ্রা তাঁহার কোন কাজে আসে নাই।'[৪২]

গোত্রে গোত্রে একতা বন্ধন এবনে ছউদের মূলমন্ত্র। তিনি কোরআনের অনুশাসন প্রতি পদক্ষেপে অনুসরণ করতে প্রয়াসী। কোরআনেরই উক্তি, 'আল্লাহ্ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়তার সহিত ধারণ কর এবং পরস্পর বিভক্ত হইও না।'(আল কোরআন-৩/১০৩) মানুষে মানুষে প্রীতি ও একতা বন্ধনের ক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর বিশ্বাসও একই রকম। তাঁর নিজের দর্শনের প্রতিরূপ তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এবনে ছউদের জীবন দর্শনের মধ্যে। তিনি আশা করেছিলেন, ইবনে ছউদের শাসনের মাধ্যমে মুসলিম জাতি পুনরায় তার ঐতিহ্য খুঁজে পাবে। একত্রিত হতে পারবে। এ আশাই ফুটে উঠেছে তার লেখনীতে এবনে ছউদ সম্পর্কে ব্যক্ত তাঁর মন্তব্যে। তিনি বলেনঃ

> 'যে আরববাসী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিল, সেই আরববাসী আজ পরাক্রান্ত।এবনে ছউদের কঠোর শাসনাধীনে লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা পরিহার করিয়া দেশে নতুন যুগের সৃষ্টি করিয়াছে। এবনে ছউদের অলোক-সামান্য ব্যক্তিত্ব ব্যতীত আরবের দুর্ধর্ষ সম্প্রদায় কখনও একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ইছলামের গৌরব পুনরুদ্ধার

---

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬।
[৪২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

করিতে সমর্থ হইত না। দুর্দ্দান্ত যাযাবর বেদুঈনকে স্থায়ী সৈনিকে পরিণত করত দূরদর্শী এবনে ছউদ আরবশক্তিকে স্বাধীনতার উচ্চশিখরে উন্নীত করিয়াছেন। যে আরব কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সেই আরব আজ মোছলেম জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। শিক্ষার ক্রমিক বিস্তারে আরব চরিত্রের কঠোরতা মন্দীভূত হইলে, আরব শক্তি অন্যান্য মোছলেম শক্তির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া এক অজেয় শক্তির সৃষ্টি করিবে, পুনরায় ইছলাম ভেরী জগতের সর্ব্বত্র নিনাদিত হইবে। সত্যের দীপ্তি অসত্যের অন্ধকারকে চিরতরে অস্তমিত করিবে, এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ইছলামের পুণ্যবাণী ধ্বনিত হইবে। স্বাধীন তুরস্ক, স্বাধীন আফগানিস্থান, স্বাধীন পারস্য ও স্বাধীন আরব সাম্য-সূত্রে প্রথিত হইলে, এক অভাবনীয় শক্তির সৃষ্টি হইবে; সাম্য-মৈত্রী ও শৃঙ্খলা সমগ্র জগতকে জয় করিবে; মহাপ্রভুর নাম, স্থান ও জাতি নির্ব্বিশেষে কীর্ত্তিত হইবে।'[৪৩]

অন্যদিকে ইউরোপের 'রুগ্নদেহ' বলে কথিত তুরস্কে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের আবির্ভাব যদিও ইসলামের প্রভূত ক্ষতি সাধনের কারণ হিসাবে পরিগণিত, তথাপি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) তৎকালীন তুরস্কের অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং তার কিছু সমাজ সেবা মূলক কাজের প্রশংসায় বলেছেনঃ

'পণ্যজাত দ্রব্যের ক্রমিক হ্রাসহেতু জনসাধারণের অবস্থা হীনতর হইতে চলিয়াছিল। সুলতানগণ বৈদেশিক আক্রমণের ফলে জন সাধারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই। ভূ-সম্পত্তি হইতে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহা জনসাধারণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কৃষকশ্রেণী খাদ্যাভাবে হীনবল হইতেছিল। আমদানী রপ্তানীর সুব্যবস্থা না থাকায় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ক্রমে-

[৪৩] প্রাগুক্ত, 'মোস্তফা আতাতুর্ক', খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। উষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোন বাহন ছিল না। রেলপথ না থাকায় বাণিজ্যের দুর্গতি সংঘটিত হইয়াছিল। জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকায় ভূমির উর্বরা শক্তি বিনষ্ট হইয়াছিল। দারিদ্র্যহেতু জনশক্তি খর্ব্বীভূত হইয়াছিল ও তৎসহ দেশে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্যপক্ষে যাজকশ্রেণী স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর ছিল। নিরক্ষর জনসাধারণের উপর তাঁহারা প্রভূত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। দুঃখ দারিদ্রের অপনোদন হেতু তাঁহারা করুণাময়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ভান করিয়া ফতোয়া দিতেন এবং নানা অবৈধ উপায়ে স্ব স্ব উপার্জনে ব্রতী থাকিতেন। দরিদ্র নিরক্ষর প্রজাগণ যাজক শ্রেণীর সন্তুষ্টির জন্য স্ব স্ব উৎপন্ন বস্তুর বিনিময় করিত। ইহাতে দেশের আর্থিক অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতে চলিয়াছিল। একদিকে যাজক শ্রেণীর উৎপীড়ন, অন্যদিকে রাজ-প্রাসাদের বিলাস-ব্যসন তুরস্ককে অন্তঃসারশূণ্য করিয়াছিল।'[৪৪]

ভারতীয় উপমহাদেশে আওরঙ্গজেব দরবেশপ্রতিম, জনদরদি, ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। যদিও হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই, এমনকি কতিপয় ঐতিহাসিকও তাঁকে হিন্দু বিদ্বেষী নিষ্ঠুরহৃদয় সাম্প্রদায়িক শাসক হিসেবে অভিযুক্ত করে থাকেন। তাঁর বিরূদ্ধে পিতৃপীড়ন ও ভ্রাতৃঘাতকতার অভিযোগ আনা হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) স্বীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মাফিক আওরঙ্গজেবের বিরূদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ নিরাবেগ ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র অনুসারে খতিয়ে দেখেছেন এবং প্রকৃত সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা' (১ম প্রকাশ ১৯৪৯) গ্রন্থের ১ম খন্ডের 'অবতরণিকায়' তিনি বলেনঃ

---

[৪৪] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

'মোগল বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব যে সম্রাট শ্রেষ্ঠ ছিলেন, ইহাই প্রমাণ করা এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিহাস কেবল শাসন-প্রণালীর বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হয় না। 'ধম্মার্থ কাম মোহের উপদেশসহ ইতিবৃত্ত' ইতিহাস নামে পরিচিত । সুতরাং আওরঙ্গজেবকে জানিতে হইলে কেবল তাঁহার শাসন-প্রণালী অনুসরণ করিলে চলিবে না, ধর্ম্মে, শিক্ষায় এবং কৃষ্টি ও সভ্যতায় তাঁহার দান কি ছিল তাহাও জানা আবশ্যক। আধুনিক কৃষ্টি বা সভ্যতায় জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় না, যে পর্যন্ত উহাকে পূর্ব্ববর্তী কৃষ্টি বা সভ্যতার সহিত তুলনা করা যায়।.. .. .. আওরঙ্গজেবকে বুঝিতে হইলে কেবল গজনীর সুলতান মাহমুদ বা দিল্লীর মোগল বাদশা আকবরের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। আর্য্যযুগ, মৌর্য্যযুগ ও গুপ্তযুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির তুলাদন্ডে তাঁহাকে ওজন করিতে হইবে। হিন্দু ও মোছলেম সভ্যতা যে পরস্পর পরিপূরক, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এমন কি আদিম যুগের মিশর ও অ্যাসিরিয়ার দানও গণনা করিতে হইবে। প্রাচীন মিশরের স্থাপত্য অনুশীলনের সহিত শাহজাহানের শিল্পানুরাগকে এবং উমাইয়া যুগের শিক্ষার সহিত বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাকে পাশাপাশি রাখিলে প্রমাণিত হইবে যে 'History repeats itself' । প্রাচীণ যে বর্ত্তমানের শিক্ষাগুরু, তাহা ভুলিলে চলিবে না। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জন্মদাতা স্পেনের মূল বংশ, ধর্ম্মে প্রেমের উন্মাদনা আসিয়াছিল চৈতন্য হইতে এবং শাসন প্রণালীর সুগঠন ও সুশৃঙ্খল সাধন হইয়াছিল মোগলযুগে। প্রত্যেক যুগের ঐতিহ্য লইয়া বর্ত্তমান ইতিহাস গঠিত। এই ইতিহাসে আওরঙ্গজেবের স্থান কত উচ্চ, তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্রে সংমিশ্রণ ছিল বৈদিক ধর্ম্মের একত্ব জ্ঞান, মগধরাজ অশোকের বৈরাগ্য ভাব, বিক্রমাদিত্যের বিদ্যানুরাগ, রাজপুত

Dhaka University Institutional Repository

জাতির যুদ্ধকুশলতা ও আকবরের শাসন সংস্কার স্পৃহা। এতদুপরি আওরঙ্গজেব ছিলেন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রকৃত অনুবর্ত্তী, ইছলামের খাঁটি সাধক।

কতিপয় ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবের চরিত্রে বিদ্বেষমূলক ঘটনার আরোপ করিয়া হিন্দু-মোছলমানের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পুস্তকের উদ্দেশ্য অপ্রীতি বর্দ্ধন নহে বরং সম্প্রীতি গঠন। ইহার দ্বারা যদি জাতীয় মনোমালিন্য কিয়ৎ পরিমাণেও দূরীভূত হয় এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতি যথাযথ ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, তবেই সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।'[৪৫]

উক্ত বক্তব্য থেকে আওরঙ্গজেবের জীবনী রচনার কারণ প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 'অপ্রীতি বর্দ্ধন নহে বরং সম্প্রীতি গঠন'-ই যে প্রকৃত পক্ষে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর মুখ্য উদ্দেশ্য, সেটা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। পুঞ্জীভূত অসত্যের মধ্য থেকে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার তাঁর প্রেরণার উৎস মূলে কাজ করেছে এবং আবিষ্কৃত সত্য তিনি সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে; যাতে করে গালাগালি নয়, গলাগলিতে রূপান্তরিত হয় জাতিগত-সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ। প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যে পরধর্মে বা পর সম্প্রদায়ে বিদ্বেষী হতে পারেন না 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোসলেম সভ্যতা' গ্রন্থ রচনা করে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন তিনি। এবং এ ব্যাপারে তাঁকে পথ দেখিয়েছে তাঁর নিজের পক্ষপাতহীন প্রজ্ঞা ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিচার বোধ। মানব প্রজন্মের অন্তর্ভূক্ত সকলেই যে পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রতিম এই চেতনায় প্রণোদিত ছিলেন বলেই আওরঙ্গজেবের মানবহিতৈষণার স্বরূপ অন্বেষণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমান, খ্রিষ্টান সকল ঐতিহাসিকের প্রতি-ই তাঁর সমান

---

[৪৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৫-১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরতা, সমান শ্রদ্ধা। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তি বিচারের কষ্টিপাথর সযত্নে ব্যবহার করেছেন। 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেনঃ

> 'এই পুস্তক প্রণয়নে হিন্দু ঐতিহাসিকদিগের যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং তাঁহাদের প্রণীত ইতিহাস হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।
>
> 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ জহির উদ্দিন সাহেবের 'Aurengzeb and His times' পুস্তক অবলম্বনে সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবনী লিখিত হইয়াছে। রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রণীত 'আলমগীর' এবং ঐতিহাসিক শামসুল উলামা শিবলী নোমানী প্রণীত উর্দ্দু গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লেনপুল প্রমূখ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের উক্তি হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মাআসার-ই-আলমগীরী হইতেও বহু প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।'[৪৬]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) আওরঙ্গজেব সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণিক করে তোলার লক্ষ্যে নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং নানা তত্ত্বগত বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি বস্তুনিষ্ঠ নিরাবেগ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আওরঙ্গজেবের চরিত্র প্রসঙ্গে উদ্ধৃত 'ভারতের ইতিকথা' গ্রন্থের লেখক ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেনঃ

> 'আওরঙ্গজেব প্রায় ৫০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজত্ব সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল। শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে আওরঙ্গজেবই যোগ্যতম ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার চরিত্রে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অদম্য সাহসের অপূর্ব্ব সম্মিলন ছিল। তাঁহার ন্যায় শ্রমশীল এবং

---

[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শাসক মধ্যযুগের ইতিহাসে বিরল। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নিজে শাসন সংক্রান্ত সকল কাজ তত্ত্বাবধান করিতেন। কোনো মন্ত্রী বা কর্মচারীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার বিলাস বর্জ্জন করিয়া ফকিরের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। ইছলাম ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। মুছলমান প্রজাগণ তাঁহাকে জীবন্ত বীররূপে গণ্য করিত। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি দৈনন্দিন উপাসনা কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও তিনি অবসরকালে কোরআন নকল করিতেন এবং টুপি প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার পান্ডিত্য গভীর ছিল। তাঁহার লিখিত পত্রসমূহ পাঠ করিলে বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ফতোয়া-ই-আলমগীরী নামক মুছলমান আইন সম্বন্ধীয় বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধর্ম্মানুরাগে, নৈতিক চরিত্রে, শ্রমশীলতায় এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় আওরঙ্গজেব মুছলমান রাজধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই বিষয়ে আকবরও সর্ব্বাংশে তাঁহার সহিত তুলনীয় নহে।'[৪৭]

Bernier আওরঙ্গজেবকে অসাধারণ প্রতিভাশালী এবং প্রধান রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৪৮] তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার, বিদ্বেষহীনতা এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি নিরপেক্ষতা, কল্যাণকামিতা এবং অন্যায় প্রতিরোধার্থে গৃহীত কতিপয় সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়ঃ

১. 'আলমগীরের পূর্বপর্যন্ত এক সাধারণ নিয়ম ছিল যে, রাজ দরবারের কোনো বড় কর্মচারী মারা গেলে তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া রাজকোষে লওয়া হইত। আলমগীর ইহাকে একেবারে বন্ধ করিয়া দেন।'[৪৯]

---

[৪৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১।
[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২।
[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

২. 'সমস্ত রাজাদের সময়ে জমির মালগুজারী বা খাজনা ব্যতীত অনেক প্রকারের ট্যাক্স আদায় হইত, যথা-ভুঙ্গ, পান্দারা, সারগুমারী, বারগুমারী, বারগাদী, তুগাসা, জস্বার্সা, শুকরানা ইত্যাদি। এগুলির পরিমান খাজনার সমান হইত। খাঁফী খাঁর মতে ইহার আমদানী কোটি কোটি টাকার অধিক ছিল। আলমগীর (আওরঙ্গজেব) এই সমস্ত একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন।'[৫০]

৩. 'একদা আলমগীর সফরে এক বাগানে অবস্থান করেন। প্রাচীরের পার্শ্বে এক বুড়ির বাড়ি ছিল। বাগান হইতে বুড়ির বাড়ির পানি আসিবার একটা পয়:প্রণালী ছিল। সরকারী লোক পানি বন্ধ করিয়া দেয়। রাত্রে যখন তিনি খাস মহলে বসিলেন, তখন পনেরটি আসরফি শেখ আবদুল খায়েরের মারফতে পাঠাইয়া দেন এবং বলেন যে বুড়িকে এগুলি দিয়া আমার পক্ষ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা জানাইবে।'[৫১]

৪. 'পূর্ব্বকালে কোনো প্রজা যদি রাজার বিরুদ্ধে কিছু দাবী করিত, তাহা হইলে তাহার অভিযোগ শুনিবার কেহ থাকিত না। বাদশাহ আলমগীর ১০৮২ হিজরীতে এক ফরমান জারী করেন যে, প্রত্যেক জেলায় একজন সরকারী উকিল নিযুক্ত করা হইবে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে যে, বাদশাহের উপর যদি কাহারো কোনো দাবী থাকে, তবে স্থানীয় সরকারী উকিলের কাছে তাহা পেশ করিতে পারিবে। তাহার হক প্রমাণিত হইলে তাহা সরকারি উকিলের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবে (খাঁফী খাঁ ১৯৫০)।'[৫২]

৫. 'আলমগীরের রাজত্বকালে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু হইতেছে তাহার সুবিচার। তিনি আপন-পর, ধনী-নির্ধন, শত্রু-মিত্র, কাহারো কোনো ভেদাভেদ করেন নাই। এক পত্রে

---

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২।
[৫১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৪।
[৫২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নিজে লিখিয়াছেন যে, 'বিচার স্থলে শাহজাদাদিগকে তিনি সাধারণ লোকের সমান মনে করেন।'[৫৩]

৬. 'রাজ্যে এক সাধারণ রায়তের অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য 'অকেয়া নেগারী' বিভাগ খুলিয়া দেওয়া হয়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সংবাদ রাজদরবারে লিখিয়া প্রেরণ করা হইত। আলমগীর অতি সাবধানতার সহিত এই বিভাগ পরিচালনা করিতেন। তাঁহার সময়ে যেরূপ রায়তের প্রকৃত অবস্থা লিপিবদ্ধ হইত, তদ্রূপও তাহাদের আরামের সুব্যবস্থা করা হইত। এই কালের পত্রগুলি পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, রাজ্যের সকলের প্রতিই দৃষ্টি রাখিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইত। শাহজাদা, সুবাদার, আলেম প্রত্যেককে সংবাদ লিখিতে হইত এবং তাহার মধ্যে লেখকের নাম উল্লেখ থাকিত। যদি শতক্রোশ দুরে একজন পথিকের কোনো বস্তু হারাইয়া যাইত, তখনই সে সংবাদ তাঁহার নিকট পৌছিত এবং তাহার জওয়াবদিহি আদায় করিয়া লইতেন।'[৫৪]

৭. 'এশিয়া মহাদেশের রাজাদের একটি দুর্ণাম আছে যে, তাঁহাদের কর্মচারীবৃন্দ অধিকাংশই উৎকোচ গ্রহণ করেন। এই উৎকোচের প্রধান কারণ এই যে, তাঁহাদিগকে রাজদরবারে বড় বড় নজরানা দিতে হইত বাদশাহের মনোতুষ্টির জন্য। ইহা শত শত অনর্থের মূল ছিল। আলমগীর এই অশুভ বিষয়টিকে একেবারে বন্ধ করিয়া দেন।'[৫৫]

উক্ত প্রমাণগুলো থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র মাহাত্ম্য, উদারতা, জনকল্যাণ মনস্কতা, পক্ষপাতহীন ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, নিষ্ঠাচার এবং দরবেশ সুলভ কর্তব্য পরায়ণতা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এবং এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ঠিক বলেছেন,

---

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৩।
[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২-২১৩।
[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

শত্রুপক্ষ আলমগীরের যে ছবি আঁকিয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই শত্রুতা ও পক্ষপাত মূলক। এমন কি তাঁর ভ্রাতৃ বিরোধ ও হিন্দু বিদ্বেষ সম্পর্কে কথিত অভিযোগও সত্যাশ্রয়ী নয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বলেনঃ

> 'ভারতীয় মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে আওরঙ্গজেব অতিশয় বিচক্ষণ, ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ অন্যান্য সম্রাটদিগের মধ্যে বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণতঃ প্রচলিত ইতিহাসে তাহার গুণগুলিকে বিকৃতরূপে প্রদর্শিত হওয়ায় পাঠকের মনে স্বত:ই তাঁহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু অনুধাবন করিলে প্রতীয়মান হয় যে, আওরঙ্গজেব অপেক্ষা দারা ও মোরাদ অধিকতর দায়ী। শাহজাহান রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেই দারা সিংহাসনে আসীন হইয়া চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রদানের পথ বন্ধ করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য যে, অন্য পুত্রগণের নিকট যেন রাজধানীর সংবাদ না পৌছিতে পারে। আবার আওরঙ্গজেব পিতৃদর্শন হেতু আগ্রায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে দারার সৈন্য পথরোধ করিল, সুতরাং ভ্রাতৃবিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। দারার পরাজয়ের পর মোরাদ মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারই প্রতাপে দারা পরাভূত, কাজেই তিনি সিংহাসনের অধিকারী। সুতরাং সিংহাসন লাভের পর মোরাদের শত্রুতা হইতে বাঁচিবার জন্য তাহাকে কারারুদ্ধ করা আওরঙ্গজেবের স্বীয় নির্বিঘ্নতার জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।'[৫৬]

শুধু তাই নয়, আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হিন্দু-বিদ্বেষ ও হিন্দু পীড়ন সম্পর্কিত অভিযোগও নিরপেক্ষ বিচার বিবেচনার পর আর ধোপে টেকেনা। বরং তাঁর অসাম্প্রদায়িক

---

[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

উদার মনোবৃত্তিই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে 'হিন্দু-বিদ্বেষহীনতা' উপ-শিরোনামে আহছানউল্লা (রঃ) বলেনঃ

> 'প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেব হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। বেনারসের প্রসিদ্ধ ফরমান তাহার পরিচায়ক। আমাদের সম্মিলিত দরবারে সংবাদ আসিয়াছে যে কতিপয় ব্যক্তি অসূয়া ও হিংসা পরবশ হইয়া বেনারস শহরের হিন্দু অধিপতিদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে এবং প্রাচীন মন্দিরগুলির অধিকারী ব্রাহ্মণদিগকে স্ব স্ব স্থান হইতে সরাইবার ইচ্ছা করিয়াছে। সেই জন্য আমরা রাজকীয় আদেশ প্রদান করিতেছি যে, আমাদের হুকুম পৌছিবার পর কোনো ব্যক্তি বেআইনী মতে ব্রাহ্মণদিগকে কিম্বা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত অন্যান্য হিন্দুগণকে বাধা দিতে বা তাঁহাদের শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবে না। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় স্ব স্ব কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন এবং শান্তির সহিত প্রার্থনা করিবেন যেন আমাদের রাজত্ব স্থায়ী ও অক্ষুন্ন থাকে। ১০৬৯ হিজরীর ১৫ই জমাদিউস সানি (১৬৫৯)।'[৫৭]
>
> 'একদা আওরঙ্গজেবের দরবারে কতিপয় হিন্দু কর্মচারীকে তাহাদের পদ হইতে দুরীভূত করিবার জন্য একটি দরখাস্ত পড়িয়াছিল। তদুত্তরে তিনি আদেশ দিয়াছিলেন- বৈষয়িক ব্যাপারে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই এবং এ বিষয়ে গোঁড়ামির স্থান নাই। যদি দরখাস্তকারীর ইচ্ছা পূরণ করিতে হয়, তবে প্রত্যেক রাজা ও তাঁহার প্রজাবৃন্দকে বিনাশ করিতে হইবে। প্রত্যেক রাজা ও তাঁহার ধর্ম তাঁহাদের নিকট, আমাদের ধর্ম আমাদের নিকট।'[৫৮]

উক্ত ফরমানে আওরঙ্গজেবের অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজর্ষি সুলভ বিচার বোধকেই উচ্চকিত করে তোলে; ভ্রাতৃবিরোধ, হিন্দু-বিদ্বেষ বা প্রজাপীড়ন নয়। বইটির উপর

---

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩১-২৩২।
[৫৮] প্রাগুক্ত, ৩২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনান্তে উপলব্ধি করা যায়, সত্যানুসন্ধানী লেখক হিসেবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সত্য ঘটনার প্রকাশ ভাবনা। মানুষের জন্য শুভ বোধের সন্ধান যেখানে যে ব্যক্তিত্বের মধ্যেই তিনি পেয়েছেন, তাঁর প্রতিই ব্যক্ত করেছেন অসীম শ্রদ্ধা, অপরিমেয় ভালবাসা এবং সেই সঙ্গে এরকম মহৎ মহাপ্রাণ মানুষের সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্তবিশ্বাস ও অযৌক্তিক অমূলক অভিযোগ সমুহের যুক্তিপূর্ণ খন্ডন করা নৈতিক দায়িত্ব মনে করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা ও সাহিত্যে বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সুদীর্ঘ ৩২ বছর যাবৎ শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তিনি যে মুসলমানদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে গেছেন তা অকপটে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকলের প্রতি তাঁর যে দায়িত্ব তা তিনি অবহেলা করেননি। এই জন্য তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব, দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা স্বজন প্রীতির অভিযোগ কোন মহল থেকেই উত্থাপিত হয়নি। তিনি যর্থাথই লিখেছেন যে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তিনি জনসাধারণকে সাহায্য করতেন। এই জন্য হিন্দু-মুসলিম সকলেই তাঁর প্রতি প্রীত ছিলেন। আবার শিক্ষা বিভাগও তাঁর প্রতি সর্বদা সহানুভূতিশীল ছিল। শিক্ষা বিভাগ তাঁর কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা, সততা ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল।

১৯০৭ সাল থেকে ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) চট্টগ্রাম বিভাগের ইনসপেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে চট্টগ্রাম জেলায় মুসলিম শিক্ষার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়ছে। এই ধারা পরবর্তী দশকগুলোতে অব্যাহত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলে যাওয়ার বয়সী মুসলমানদের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির হারঃ ১৯২১-২২ এবং ১৯২৪-২৫

	১৯২১-২২		১৯২৪-২৫	
জেলা	ছাত্র সংখ্যা	হার	ছাত্র সংখ্যা	হার
ঢাকা	৬৯,২০৩	২২.৫	৮২,৪১৭	২৬.৯+০৪.৪
চট্টগ্রাম	৫৭,৭৩৭	৩২.৮	৮১,৬৮৬	৪৬.৮+১৩.৬
নোয়াখালী	৫৪,৭৭৮	৩১.৯	৭০,৭৬৫	৪১.২+০৯.৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২২৫	২০.৭	৩২৪	২৯.২+০৮.৫
যশোহর	৩১,৩৩১	১৯.৬	৩২,৫৭২	২০.৪+০.৮
পাবনা	৩৬,০৫২	১২.৬	৩৫,৫৪৪	১২.৫+০.১
বর্ধমান	১২,০০৯	১৬.৭	১৩,২৯৪	১৮.৫+০১.৭
মুর্শিদাবাদ	১৬,২৫৭	১৬.০০	১৬,৯৯৬	১৬.৭+০.৭

সূত্র ঃ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, বি ভলিউম, স্টাটিসটিকস, জেলাঃ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম, যশোহর, পাবনা, বর্ধমান।

১৯২৪ সালের জুন পর্যন্ত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) চট্টগ্রাম বিভাগের পরিদর্শকের দায়িত্বে ছিলেন। এই সময়ে তাঁর অধীনস্থ বিভাগের প্রায় প্রতিটি জেলায় মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ও স্কুলে যাওয়ার উপযোগী বয়সের মুসলমান পরিবারের সন্তানদের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষণীয়। চট্টগ্রাম বিভাগের- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার এই হার পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের জেলাসমূহের চেয়ে অধিক ছিল। এতে দেখা যায় সব ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আলোচ্য সময়ে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে। অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯২১-২২ থেকে ১৯২৪-২৫ সালের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে চট্টগ্রামে ২৮,৩৬৯ জন,

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলে যাওয়ার বয়সী মুসলমানদের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির হারঃ ১৯২১-২২ এবং ১৯২৪-২৫

	১৯২১-২২		১৯২৪-২৫	
জেলা	ছাত্র সংখ্যা	হার	ছাত্র সংখ্যা	হার
ঢাকা	৬৯,২০৩	২২.৫	৮২,৪১৭	২৬.৯+০৪.৪
চট্টগ্রাম	৫৭,৭৩৭	৩২.৮	৮১,৬৮৬	৪৬.৮+১৩.৬
নোয়াখালী	৫৪,৭৭৮	৩১.৯	৭০,৭৬৫	৪১.২+০৯.৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২২৫	২০.৭	৩২৪	২৯.২+০৮.৫
যশোহর	৩১,৩৩১	১৯.৬	৩২,৫৭২	২০.৪+০.৮
পাবনা	৩৬,০৫২	১২.৬	৩৫,৫৪৪	১২.৫+০.১
বর্ধমান	১২,০০৯	১৬.৭	১৩,২৯৪	১৮.৫+০১.৭
মুর্শিদাবাদ	১৬,২৫৭	১৬.০০	১৬,৯৯৬	১৬.৭+০.৭

সূত্র ঃ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, বি ভলিউম, স্টাটিসটিকস, জেলাঃ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম, যশোহর, পাবনা, বর্ধমান।

১৯২৪ সালের জুন পর্যন্ত খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) চট্টগ্রাম বিভাগের পরিদর্শকের দায়িত্বে ছিলেন। এই সময়ে তাঁর অধীনস্থ বিভাগের প্রায় প্রতিটি জেলায় মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ও স্কুলে যাওয়ার উপযোগী বয়সের মুসলমান পরিবারের সন্তানদের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষণীয়। চট্টগ্রাম বিভাগের- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার এই হার পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের জেলাসমূহের চেয়ে অধিক ছিল। এতে দেখা যায় সব ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আলোচ্য সময়ে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে। অন্য এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯২১-২২ থেকে ১৯২৪-২৫ সালের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে চট্টগ্রামে ২৮,৩৬৯ জন,

Dhaka University Institutional Repository

> requires radical improvement in both organisation and efficiency. During the last year the inspectorate lost the services of two experienced officers Mr Stapleton and Khanbahadur Molvi Ahsnullah.'[3]

সহকারী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহনের ফলে তাঁর কাজের চাপ বহুগুন বেড়ে যায়। নীতি নির্ধারণী বিভাগীয় মিটিং ছাড়াও তাঁকে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৩০৯টি Case মীমাংসা করতে হত। এর উপরে ছিল নিয়মিত সাক্ষাৎকার প্রদান। গোটা বাংলার মুসলিম শিক্ষার দায়িত্বভার তাঁর উপরে ছিল এবং তিনি তার দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করেন। তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়ঃ

> 'As a temopary expedient the Assistant Director of Public Instruction for Muhammadan Education has been, with the permission of the Government entrusted in adition to his own work with a portion of duties of the Assistant Director of Public Instruction. This arrangement was made on the tentative basis when Khanbahadur Ahsanullah Joined his office in July last year.....to relieve the Assistant Director of Public Instruction of the overhelming mass or file word which to his lot.'[4]

এই মনীষীর মুসলিম শিক্ষার সহকারী পরিচালক হিসাবে যোগদানকে বাংলায় মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের এক মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। মুসলিম শিক্ষার উন্নতি বিধানে তাঁর উপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব তিনি সফলতার সঙ্গে পালন করেন। উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারনী

---

[3] Proceedings of Govt. of Bengal, Education Department, August, 1926.

[৪] ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মিটিং সমুহে প্রভাব খাটিয়ে তিনি মুসলিম শিক্ষার অনুকুলে বহু প্রস্তাব এবং scheme পাশ করান। নতুন দায়িত্ব পাবার পরপরই তিনি স্থগিত scheme সমুহ বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেন। কোলকাতায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল দীর্ঘ দিনের। সরকার নীতিগতভাবে এই দাবী মেনে নেয়ার পরও নানা অজুহাতে এই প্রকল্প বাস্ত বায়নে গড়িমসি করতে থাকে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে পুনঃ পুনঃ দাবি পেশ করার পরও এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়নি। তিনি নতুন দায়িত্ব গ্রহনের এক মাসের মধ্যে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহন করেন। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করার যৌক্তিকতা দেখিয়ে তিনি তাঁর দপ্তর থেকে তথ্যভিত্তিক দীর্ঘ প্রতিবেদন বের করেন। মুসলিম ছাত্রদের ভর্তি সমস্যা, আবাসিক সমস্যা, পাঠ্যক্রম সমস্যা সহ নানা বিষয় এই প্রতিবেদনে স্থান পায়। প্রতিবেদনে বলা হয়ঃ

> '2. Proposal for the establishment of such a college in Calcutta was first made in 1881, and intermediate classes were opened in Calcutta Madrasa in 1883. The Classes however were abolished in 1919. And since then a certain number of Moslem students have been allowed to read in the Presidency College in the payment of reduced fees.
>
> 3. On account of the increase of Muslim students Govt. expressed desire to establish in 1913. And again in 1914 Calcutta University Commission also recommended for such college.'[5]

---

[৫] ঐ, সেপ্টেম্বর, ১৯২৬।

Dhaka University Institutional Repository

এই কলেজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসের ৩০ তারিখে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রস্তাবিত কলেজের নাম 'ইসলামীয়া কলেজ' রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ছিলেনঃ

১। খানবাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (সভাপতি)

২। খানবাহাদুর শামসুল ওলেমা হেদায়েত হোছাইন

৩। খানবাহাদুর মৌলভী আব্দুস সালাম, এম.এল.সি.

৪। খানবাহাদুর কাজী জহীরুল হক, এম.এল.সি.

৫। খানবাহাদুর মোশারফ হোসেন, এম.এল.সি.

৬। মিঃ আলতাফ আলী, এম.এল.সি.

৭। মিঃ জে.এ. বটমলী (সেক্রেটারী)

খানবাহাদুর সুজাত আলী অসুস্থতার কারণে সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি।[৬]

আলোচ্য প্রতিবেদনে সেই সময়ে মুসলিম উচ্চ শিক্ষার অবস্থা সর্ম্পকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়। ১৯২১-২২ সাল থেকে ১৯২৩-২৪ সাল পর্যন্ত তিন বছরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট ক্লাশে মুসলিম ছাত্র ছিলঃ কলা অনুষদে ২১১ জন এবং বিজ্ঞান অনুষদে ৮জন। একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট ক্লাশে ছাত্র ছিল, কলা অনুষদে ৮৬১ জন ও বিজ্ঞানে ২১৭ জন। ১৯২৩ সালে কোলকাতাস্থ বিভিন্ন কলেজে আই.এ. ও বি.এ. ক্লাশে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ছিল-কলা বিভাগে ৬০৭ জন ও বিজ্ঞান বিভাগে ২১৪ জন।

---

[৬] ঐ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা মফস্বল ও কোলকাতায় অধ্যয়নরত মুসলিম কলেজ ছাত্র সংখ্যাঃ ১৯২০-১৯২৩।

	আই.এ.	আই. এস.সি.	বি.এ.	বি. এস.সি.	এম.এ.	এম. এম.সি.
ঢাকা	৮৬১	২৫৭	-	-	-	-
কোলকাতা	১০৩৫	৪৩৫	৭৭৯	৬৩	২১১	৮
মফস্বল	২৯৯১	৪৫৬	৫৯	-	-	-

সূত্রঃ Education Proceedings, Bengal Govt. Sept. 1929.

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর ১৯২৭ সাল থেকে এই কলেজে ক্লাশ নেয়া শুরু হয়। ১৯২৭-২৮ সালে তিনি এই কলেজের পরিচালনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।[৭] ফলে তাঁর পক্ষে এই কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে সহায়তা করার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

এই কলেজ প্রতিষ্ঠা সর্ম্পকে তিনি লিখেনঃ

> 'কলিকাতায় মোছলেম ছাত্রদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। হিন্দু সদস্যগণ ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উপস্থাপন করেন। আমি বলিলাম হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজের যদি আবশ্যকতা থাকে তবে মোছলেম কলেজের আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। ব্যয় গভর্ণমেন্ট বহন কবিবেন, সুতরাং আপত্তির কারণ আগ্রাহ্য। প্রস্তাবিত মোছলেম কলেজে আরবি, ফারসি, ও উর্দ্দু শিক্ষার বৈশিষ্ট্য থাকিবে। এই প্রস্তাবে কেহ আপত্তি করিতে পারে নাই। তবে অন্যপক্ষ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পর্যন্ত মোছলেম শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশানুরূপ না হইবে, ততদিন হিন্দু ছাত্র ইচ্ছা করিলে মোছলেম কলেজে ভর্তি হইতে পারিবে। ফলে কিছুদিনের মধ্যে

[৭] Syndicate Resolution Calcutta University, 1929.

Dhaka University Institutional Repository

স্বতন্ত্র ইসলামীয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল Mr Harley এই কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন। কলেজ খুলিতেই প্রচুর মুসলিম ছাত্রের সমাবেশ হয়, সুতরাং হিন্দু ছাত্রের জন্য কোন বিশেষ গ্রহনের আবশ্যক হয় নাই।'[৮]

ইসলামিয়া কলেজ ছাড়াও তিনি তাঁর কর্মজীবনের শুরু থেকে বহু স্কুল, কলেজ, হোস্টেল প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষতায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি যখন চট্টগ্রাম বিভাগের পরিদর্শকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন তখন পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। তখন নতুন সৃষ্ট প্রদেশের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রতি বছর তাঁর মাধ্যমে এক লক্ষেরও অধিক টাকা শিক্ষা খাতে এই বিভাগে ব্যয় করা হত। তাঁর সময়ে হাইস্কুলগুলির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। ফেনী, চাঁদপুর, বাম্রণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উচ্চ বিদ্যালয়সমুহ তাঁর সহায়তায় মজবুত ভিত্তি লাভ করে। তিনি স্থানে স্থানে মুসলিম ও হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র হোস্টেল নির্মাণ করেন। সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি ৪০টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদার হস্তে সাহায্য প্রদান করেন। এই স্কুলগুলোর অধিকাংশই ছিল মুসলিম প্রধান এলাকায়। সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, মোসলেম হাই স্কুল, আর্মানিটোলা সরকারী হাই স্কুল, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, বরিশাল জেলা স্কুল, নোয়াখালী জেলা স্কুল, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্রগ্রাম মুসলিম হাই স্কুল প্রভৃতি।[৯] চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুল তার সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলটি ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম মাদ্রাসার integral part হিসাবে ছিল। ক্রমান্বয়ে এটি অ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগে রূপান্তরিত হয়। ১৯০৯ সালে এটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯১৬ সালে এটি হাই

---

[৮] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, জয় পাবলিশার্স, আমার জীবন ধারা, পৃঃ ১০৭।

[9] Proceedings of Govt. of Bengal, Education Department, September, 1927

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলের মর্যাদা লাভ করে। এছাড়াও ঢাকা মাদ্রাসার উন্নয়ন কোলকাতা মাদ্রাসার এ্যাংলো-ফার্সি বিভাগের উন্নয়ন ও প্রসার, মহসীন তহবিলের সঠিক ব্যবহারে তার গুরুত্বপূর্ন অবদান রয়েছে।[১০]

চট্টগ্রাম মাদ্রাসা ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এটি নানা অসুবিধার মধ্যে ছিল। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) চট্টগ্রামের বিভাগীয় ইনসপেক্টরের দায়িত্ব পালনকালে এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য সাহায্য প্রদান করেন।

পরবর্তীকালে তাঁরই সহযোগিতায় এখানে ইন্টারমিডিয়েট সেকশন চালু করা হয়। ১৯২৬ সালে স্যার আবদুর রহীম এই মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং ইন্টারমিডিয়েট সেকশন চালু করার পক্ষে দৃঢ় মত প্রকাশ করেছিলেন। ক্রমে এই সেকশন ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত হয়।[১১]

১৯২৮ সালে কোলকাতাস্থ মোসলেম এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল।[১২] এতদ্ব্যতীত কোলকাতা মাদ্রাসা সংস্কার ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং কোলকাতায় মুসলিম ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বেকার হোস্টেল, টেলয় হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় তাঁর সহযোগিতা ছিল।[১৩]

তৎকালে মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। কোন কোন বিষয় দুরূহ, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর, ইসলামি ভাবধারার পরিপন্থী বলে অভিযোগ করা হয়। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশের দর্শন ও ইতিহাসের

---

[১০] ঐ, সেপ্টেম্বর, ১৯২৮।

[11] Letter of DPI to Education Secretary, 19th Feb, 1926, File, I-M-8(I)

[12] Education Proceedings, op. Cit, April, 1929.

[১৩] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, প্রগুক্ত, পৃঃ ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত রূপে উত্থাপন করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। চলতি শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচার আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ১৯৩৬ সালে মাসিক মোহাম্মদী কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে একটি সম্পূর্ন সংখ্যা প্রকাশ করে। এতে বুদ্ধিজীবীবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ নীতি ও সিলেবাসের তীব্র সমালোচনা করেন।

মাসিক মোহাম্মদীর এক সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত হয়ঃ

> 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইতে মুসলমানকে এবং মুসলমানের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সম্পূর্ন অস্পৃশ্যরূপে বর্জন করিয়া রাখা হয়েছে।..... মুসলমান যুবক যাহা পাঠ করিয়া মুসলমান হিসাবে একটু আনন্দ, গৌরব বা জ্ঞানলাভ করিতে পারে, স্কুল ও কলেজ স্তরের কোন পাঠ্যপুস্তকে তাহার সামান্য একটু আভাস ইঙ্গিতও খুজিয়া পাওয়া যায় না।'[১৪]

স্যার আজিজুল হক ভর্তি সমস্যাকে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে ভর্তির সুযোগ পাওয়া গেলেও পছন্দনীয় বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়া যেত না। তাই অনেক মুসলিম ছাত্রকে বাধ্য হয়ে পালি, সংস্কৃতি পড়তে হয়। সিলেবাসের সমালোচনা করে তিনি বলেনঃ

> '....পাঠ্যপুস্তসমূহ প্রায়ই সংস্কৃত উদ্ধৃতিযুক্ত হিন্দু পুরাণ কাহিনীতে এবং কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ। এমন কয়েকটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মুসলমান ছাত্ররা সকল বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ন নম্বর পেয়েছে, অথচ তাদের দুর্ভাগ্য কেবল মাতৃভাষার পরীক্ষাতেই তারা অকৃতকার্য হয়েছে।'[১৫]

---

[১৪] মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩।

[১৫] মোহাম্মদ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬-৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকারী পর্ষদসমূহে মুসলমানদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব না থাকায় তাদের স্বার্থ নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৫৮ জন। এদের মধ্যে মাত্র ১২ জন ছিলেন মুসলিম। বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট মুসলিম কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৮ জন, পক্ষান্তরে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৫৪৭ জন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি মাসে সর্বসাকুল্যে হিন্দুরা বেতন পেতেন ১১,৬৫৯.০০ টাকা এবং মুসলমানরা বেতন পেতেন ৩,৫২৫.০০ টাকা।[১৬] এই সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। পন্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রয়ী কর্তৃক ১৯১০ সালে মুঃ শহীদুল্লাহকে (পরে ডঃ মুঃ শহীদুল্লাহ) বেদ পড়াতে অস্বীকৃতি জানালে মুসলিম সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। পরে আবদুল মজিদ ও আবদুল আজিজ নামে আরো দু'জন ছাত্র সংস্কৃতে এম.এ পড়তে এসে ব্যর্থ হয়। খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) মুসলিম শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ও সজাগ ছিলেন। খুঁটিনাটি বিষয়ও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। বাঙালী মুসলিম জাতির সৌভাগ্য যে, তিনি ১৯২৪ সালে মুসলিম শিক্ষা বিষয়ক সহকারী ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। একই সময় তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি কলা অনুষদের ফেলোও মনোনীত হয়েছিলেন। ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে সুবর্ণ সুযোগ এসে যায়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

---

[১৬] মাসিক মোহম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ .The majority our Muslim Witness do not hesitate to attribute to this lack of Muslim representation in the University (and on the governing bodies of the several Colleges) .....stress is also also laid on the necessity for securing for The Muslim Conumnity its fair share in the appointment of University examiners.....some of the leading Muslim leaders contended that the jurisdiction of the Calcutta University should be curtailed'. Calcutta University Commisstion. Op. Csit. P. 175-76.

Dhaka University Institutional Repository

'ইতিপূর্বে কোন মুছলিম Syndicate এর সভ্য মনোনীত হন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার Syndicate এর হস্তে ন্যস্ত। তাই এই পদের গুরুত্ব অত্যধিক।.....যাহা হউক এখানকার সভ্য নির্বাচিত হইয়া বহু হিতকর কার্য্য সমাধানে কৃতকার্য হইয়াছিলাম।'[১৭]

শিক্ষা বিভাগের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে তিনি বাঙালি মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই অবদান ও কৃতিত্বপূর্ণ কর্মের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি তাঁর সংস্কারমূলক কার্যাবলিকে ২৮ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এতে তৎকালে বাংলায় মুসলিম শিক্ষার সঠিক অবস্থার পরিস্কার ছবি পাওয়া যায়। বাংলায় মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক ও গবেষকগণ এর থেকে যথেষ্ট উপকৃত হবেন। নিম্নে তাঁর দ্বারা সাধিত সংস্কার সমুহের বিবরণ দেয়া হলঃ

১. তৎকালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার পদ্ধতি চালু ছিল। এতে মুসলিম ছাত্ররা বৈষম্যের স্বীকার হত বলে ধারণা করা হত। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নামের পরিবর্তে ক্রমিক নম্বর লেখার রীতি প্রচলন করা হয়।

২. হাই মাদ্রাসা ও ইন্টারমিডিয়েট মাদ্রাসা সমুহের মান উন্নতি করা হয় যাতে করে মাদ্রাসার ছাত্ররা গ্রাজুয়েট ক্লাশে ভর্তির সুযোগ পায়।

৩. স্কুল-কলেজের মৌলবীর নতুন পদ সৃষ্টি করেন এবং পন্ডিত ও মৌলবীদের বেতনের মধ্যে সমতা বিধান করেন।

৪. নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর সহযোগিতায় উর্দুকে ক্লাসিক্যাল ল্যাংগুয়েজের মর্যাদা প্রদানে সফল হন।

---

[১৭] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সিনেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া প্রস্তাবের স্বপক্ষে জোরালো সমর্থন প্রদান করেন।

৬. ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

৭. মুসলিম শিক্ষার সহকারী পরিচালক হিসাবে বহু মক্তব-মাদ্রাসা,স্কুল-কলেজ তাঁর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে অধিক হারে মুসলিম শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়াও পাঠ্যসূচিতে বহু মুসলিম লেখকদের রচিত বই অন্তর্ভূক্ত করেন। মুসলমান লেখকদের বই প্রকাশের সুবিধার্থে তিনি 'মখদুমী লাইব্রেরী', 'প্রভিন্সীয়াল লাইব্রেরী' ও 'ইছলামিয়া লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন।

৮. মুসলিম ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তি ও যথাযথভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়।

৯. মুসলিম লেখকদিগকে পাঠ্যপুস্তক রচনার সুযোগ প্রদান করা হয় যার ফলে অল্প সময়ে বহু লেখক ও প্রকাশকের সৃষ্টি হয়।

১০.পরীক্ষকদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা নির্ধারন করা হয় এবং মুসলিম বৃত্তি ও পরিমান বাড়ানো হয়।

১১.মুসলিম ছাত্রদের জন্য কোলকাতায় বেকার হোস্টেল, টেলর হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, মুসলিম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১২.তাঁর প্রয়াসের ফলে মুসলিম সাহিত্যে প্রসার ঘটে।

১৩.মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশে অধ্যায়নের জন্য সরকারি সাহায্যের নিয়ম নির্ধারিত হয়।

১৪.টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলিম সদস্য অন্তর্ভূক্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

১৫.নিউ স্কিম মাদ্রাসা সৃষ্টি ও আরবি শিক্ষার মধ্যস্থতায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

১৬.হাই স্কুলসমূহে অধিক হারে আরবী দ্বিতীয় ভাষারূপে চালু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৭.স্কুল-কলেজের মুসলিম ছাত্রদের বৃত্তির আনুপাতিক হার নির্দিষ্ট করা হয় এবং অধিক হারে মুসলিম ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

১৮.মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি সাহায্যে মুসলিম শিক্ষার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

১৯.তিনি মফঃস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করে মোসলেম শিক্ষার নানা অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবগত হন এবং তা দুরীকরণের প্রয়াস গ্রহণ করেন।

২০.বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পর্ষদে অধিকহারে মুসলিম সভ্য নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেন।

২১.পরিদর্শন কর্মচারীদের সংখ্যা নির্ধারিত হয়।

২২.ট্রেনিং কলেজে মুসলিম ছাত্রদের জন্য কোটা নির্ধারিত হয়।

২৩.মোসলেম মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৪.নিউ স্কিম মাদ্রাসার জন্য বিশেষ বোর্ড গঠিত হয়।

২৫.সব শ্রেণীর পরীক্ষকদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা নির্ধারিত হয়।

২৬.স্কুল কলেজের পরিচালনা কমিটিতে ন্যুনতম মুসলিম সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়।

২৭.তাঁর প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষা ও শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

২৮.বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়।[১৮]

মুসলিম শিক্ষার সহকারী পরিচালক হিসাবে তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। সরকারি রিপোর্টে দেখা যায়ঃ ১৯২৬-২৭ সালে বাংলায় মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১১,৩৯,৯৪৯ জন। এক বছরের মধ্যে ১৯২৭-২৮ সালে তা বেড়ে গিয়ে ১২,৩৫,৭০৬ জনে উন্নীত হয়। শুধু প্রেসিডেন্সী বিভাগে মাদ্রাসা সমূহে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১০০০ জন বৃদ্ধি পায়। মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ে ১২৭টি। মক্তব শিক্ষা সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়ঃ

---

[১৮] ঐ, পৃঃ ১০৬-১১০।

Dhaka University Institutional Repository

'The number of Maktabs or Primary Schools for Moslems rose form 20,723 in 1926-27 to 22,892 in 1927-28; of these 14,599 were boys and 8,293 were girls. The number of the pupils enrolled in Makatabs increased during the year under review from 6,28,446 to 70,439 of whom 5,07,736 were boys and 1,97,703 were girls. The total direct expenditure of the Maktabs rose from Rs. 17,71,586 in 1926-27 to Rs. 20,77,941 in 1927-28.'[19]

১৯২৯ সালে 'মখদুমী লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর মুসলিম শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিহারের খ্যাতনামা পীর হযরত মখদুমূল মূলকের নামানুসারে তিনি এর নামকরণ করেন। তাঁর পুত্র বদরুদ্দোজাকে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি 'এম্পায়ার লাইব্রেরী' নামে আরেকটি লাইব্রেরী স্থাপন করেন। ১৯৩৬ সালে উক্ত দুটি লাইব্রেরী 'মখদুমী লাইব্রেরী এ্যান্ড আহছানিয়া বুক হাউস' নামে একীভূত হয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্য বহু বই প্রকাশ করা হয় এবং সর্বত্র এই প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অনেক মুসলিম লেখকের এই প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ প্রদান করা হয়। 'বিষাদসিন্ধু' ও এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়। সুতরাং শুধুমাত্র মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, মুসলিম সাহিত্যের বিকাশেও তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।[২০]

---

[19] Report on the public Instriction Bengal, 1927-28

[২০] দেখুন, খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৩-১১৬। খানবাহাদুর আহছানউল্লা ছিলেন মনে প্রাণে সাহিত্যানুরাগী। সাহিত্য চর্চায় তিনি নিজে শুধু অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নি, তৎকালীন অন্যান্য মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশের এবং প্রচারের মাধ্যম হিসাবে তিনি এই লাইব্রেরীকে ব্যবহার করেন। ব্যবসায়িক মানসিকতা নয় একান্ত আন্তরিকতা ও দরদ দিয়ে এখান থেকে নিয়মিতভাবে মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশ করা হত।..... ১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে এক সরকারী নির্দেশ বলে মুসলমান লেখকদের প্রণীত পুস্তক মক্তব মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পাঠকদের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ সালের ৩ অক্টোবর কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সমিতির সাধারণ সভায় তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১৭ সালে তিনি এই সমিতির সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি নিজেও একজন প্রভাবশালী লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত প্রায় ৮০টি পুস্তক পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। জীবনী, ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, ইতিহাস, শিশু সাহিত্য, ভ্রমন কাহিনী প্রভৃতি বিষয়ে লেখা তাঁর এই সমস্ত গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ঠ সমৃদ্ধ করেছে।

অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কর্মজীবন শেষ করে ৬০ বছর পর তিনি নিজগ্রাম সাতক্ষীরা জেলার নলতায় ফিরে আসেন এবং সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। নলতায় তিনি একটি ধর্মীয় ও সমাজ কল্যাণমূলক মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে অন্যান্য গ্রামেও বেশ ক'টি মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। আহ্ছানিয়া মিশন নামে পরিচিত এই মিশনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল মুসলিম যুবকদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। তিনি বলেনঃ

> 'মহব্বত পয়দা করাই মিশনের প্রধান লক্ষ্য। শরীয়ত যাহা শত বৎসরে সাধিত করিতে পারে, তরীকত এক মহব্বতের ফলে তা এক অত্যল্প সময়ের মধ্যে সংসাধিত করিতে পারে। .....
>
> মিশনের মেম্বারগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পল্লী উন্নয়নের জন্য, রাস্তাঘাট নির্মানের জন্য, দুস্থকে সাহায্যের জন্য, মৃতদের সৎকারের জন্য ও মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনের জন্য।.....
>
> শিক্ষা দেওয়াই মিশনের লক্ষ্য। ঈর্ষা, দ্বেষ, অহংকার, হিংসা বৃত্তিকে দমন করিয়া রূহের শক্তির প্রসার করাই মিশনের অন্যতম লক্ষ্য।'[২১]

হিসাবে ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়।....মুসলমান লেখকদের লেখা পাঠ্যপুস্তক বিপুল পরিমাণে মুদ্রণ ও প্রকাশ করার দায়িত্ব ও ঝুকি একমাত্র মখদুমী লাইব্রেরীই গ্রহণ করেছিল। সূত্রঃ গোলাম মঈনউদ্দিন কর্তৃক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা জীবন ও জীবন চেতনা শীর্ষক অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৭০।

[২১] খানবাহাদুর আহছানউল্লা, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

'আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ' পুস্তিকায় মিশনের লক্ষ্য ও কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। এইগুলোর মধ্যে সমাজকল্যাণ ও শিক্ষামূলক উপদেশ ছিল নিম্নরূপঃ

'(ক) এতিমদের প্রতি হামদরদি প্রকাশ ও তাদের হক রক্ষা করা;

(খ) সত্য কথা বলা, সত্য প্রচার করা, সৎগ্রন্থ পাঠ ও সৎসঙ্গ লাভ;

(গ) সব ধরনের নেশা বর্জন ও ত্যাগ করা;

(ঘ) কথা ও কর্ম দ্বারা পরোপকার করা;

(ঙ) কুকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করা;

(চ) আত্মাভিমান বর্জন করা;

(ছ) নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করা এবং কাকেও ঘৃনা না করা;

(জ) সুকর্ম সুকথা দ্বারা লোকের সন্তুষ্টি সাধন করা।'[২২]

বাহ্যিক ও আক্ষরিক শিক্ষার ফলে মানুষের অন্তর প্রসারিত ও হিংসা, দ্বেষ দুর হয় না। এই ধরনের শিক্ষা অন্তর স্পর্শ করে না। তাই তিনি জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি মুসলিম সমাজকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন; এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। সমাজের মানুষকে তিনি উভয় কালের জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। বাংলার মুসলিম সমাজকে পরিপূর্ণ রূপে শিক্ষিত করে তুলতে এবং তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পলাশী যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌল্লার পরাজয়ের পর থেকে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ফলে অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের অধঃপতন শুরু হয়। এই অবস্থা উনিশ শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত চলে। ক্ষমতাচ্যুত হয়ে বাংলার মুসলমানেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তারা অবস্থার বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারেননি। ফলে জাতির এক সংকটকালে তাঁরা সঠিক নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থতার পরিচয় দেন।

---

[২২] খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৫৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

সিপাহী বিপ্লবের পর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোলকাতাস্থ কতিপয় মুসলিম বুদ্ধিজীবীর বোধোদয় হয়। তাঁরা দরিদ্র ও কুসংস্কারাছন্ন মুসলিম সমাজকে অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে উদ্ধারের প্রয়াস গ্রহণ করেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে বৃটিশ সরকারের ভিত্তি খুবই মজবুত। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা ও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব হবে না। নবাব আব্দুল লতীফ, মৌলভী আব্দুর রউফ (কোলকাতা মাদ্রাসার শিক্ষক), মৌলভী মোহাম্মদ মাযহার, সৈয়দ আমীর আলী, আমির হোসেন প্রমুখ মনীষীগণ এই বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজে নবজাগরণ আনয়নে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। মূলতঃ এদের প্রয়াস এবং সরকারের মুসলিম সমাজের উন্নতির প্রতি ইতিবাচক নীতি গ্রহণের ফলে বাংলার মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বৃটিশ শাসনের সূচনালগ্ন থেকে বাংলার মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহা দেখিয়েছেন। ১৯৫১ সালের সেন্সর রিপোর্টে বলা হয়ঃ

> 'During the earlier period of British rule the Muslims apathy towards English education and indifference of business. They gradually became showed the poorer community while the Hindus seized the opportunity and quickly took to education establishing themselves securely in business, protessions and services.'[23]

সুতরাং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া ব্যতীত বৃটিশ প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা লাভ করা সম্ভব ছিল না। তাই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলিম সমাজকে পরামর্শ দেন। এতে মুসলিম সমাজে আগ্রহ লক্ষ্য করা গেলেও কিছু বাস্তব সমস্যা অন্তরায় সৃষ্টি করে। সরকারের গৃহীত

---

[23] Census of East Pakistan, 1951

Dhaka University Institutional Repository

পদক্ষেপ বাস্তবায়নে দীর্ঘ সূত্রিতা, আমলাদের অসহযোগিতা, দারিদ্র্য, ভর্তি সমস্যা প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে দেখা দেয়।

বিশ শতকের প্রথম পাদে বেশ ক'জন মুসলিম মনীষী মুসলিম শিক্ষার সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে এই সব দূরীকরণে আন্তরিক প্রয়াস চালান। তাঁদের মধ্যে খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) ছিলেন অন্যতম। তিনি তাঁর বত্রিশ বছরের কর্মজীবনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলার মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি বাংলার মুসলিম মানসকে আধুনিক শিক্ষা উপযোগী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন এবং মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টিকারী বহু বাধা দুর করতে সক্ষম হন।

চিন্তা ও কর্মে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল। যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষার দক্ষতা অর্জন ব্যতীত বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়ন যে সম্ভব নয় তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে সম্পূর্ন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মুসলিম কটাক্ষ না করে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্ম শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন। ভাষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তব ও উদার। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের চিন্তা যে অর্থহীন তা তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষনা করেন। তাই তিনি উর্দু ও ফার্সী তুলে দিয়ে তদস্থলে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

বাঙালি মুসলমানদের ভাষা সমস্যা দীর্ঘদিনের। মাতৃভাষা প্রশ্নের বিতর্কের অবসানের পর শুরু হয় জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্র ভাষা সমস্যা। মুসলিম সমাজের অনেক নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করলেও জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাষ্ট্র ভাষা নিয়ে নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। ভাষার রূপ ও প্রকৃতি নিয়েও বিতর্কের সূত্রপাত হয়। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রবেশ ঘটে। মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে একদল বাংলা ভাষাকে মুসলমানি ভাষা বানাতে সচেষ্ট হন। অন্যদিকে হিন্দু সাহিত্যিকদের মধ্যেও একদল বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাকে সংস্কৃত বাংলায় রূপান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সৌভাগ্যবশত হিন্দু ও মুসলমান লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে[২৪] অধিকাংশই এই নীতির বিরোধীতা করেন। প্রমথ চৌধুরী লিখেনঃ

> 'ফার্সী ও আরবী শব্দ ছেঁটে দিলে বাংলা ভাষা বলতে কোন ভাষাই থাকে না। এই দেখুন না কেন, বাংলার জমি-জমার প্রতি কথাটি ফার্সী, সুতরাং সেসব কথা বাঙলা থেকে বাদ দিলে আমাদের মুখের কথাও বন্ধ হয়, লেখাও বন্ধ হয়।'[২৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিতর্কে অংশ নিয়ে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে 'ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকুলতা ভাব প্রকাশের বাহনকে অকর্মন্য করা হয়।'[২৬]

মুসলিম সমাজে অনেকেই অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন যে, প্রয়োজন মত আরবি-ফারসি বাংলায় ব্যবহার করা যেতে পারে।তবে তা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও সৌন্দর্যবোধ যেন মাপকাঠি হয়। বাঙালি মুসলমানদের ভাষার প্রশ্নে যাবতীয় বিতর্কের সমাধান পাওয়া যায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর বঙ্গ-ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য গ্রন্থে। বাঙালি মুসলিম মানসের দ্বিধা দূর করার জন্য তিনি লিখেনঃ

> 'একাল পর্যন্ত মাতৃভাষার কূটতর্ক লইয়া সকলেই ব্যস্ত ছিলাম। উর্দু আমাদের মাতৃভাষা মনে করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য কেহ অগ্রসর হন নাই। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ সে তর্ক মিটাইয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে বঙ্গ-ভাষায় সাহিত্য রচনা করা

---

[২৪] ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী ঃ চিন্তা ও কর্ম বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃঃ ৬০-৬৫।

[২৫] প্রমথ চৌধুরী, 'বাঙালা ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ' বুলবুল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩।

[২৬] উদ্ধৃত, ইমরান হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

আবশ্যক।[২৭] হিন্দু-মুসলমানী দ্বন্দ্ব আজ হইতে ভুলিয়া যাও; 'হিন্দু-বাঙ্গালা' 'মুসলামানী বাঙ্গালা' এই পার্থক্য বোধক শব্দগুলি অভিধান হইতে উঠাইয়া দাও; উভয়ের সাহায্যে বঙ্গ ভাষার আয়ত্ত বৃদ্ধি কর এবং ভাষার উত্তরোত্তর উন্নতির দ্বারা দেশের মঙ্গল সাধন কর।'[২৮]

মুসলমানদের মধ্যে একদল 'বাংলা সাহিত্য হিন্দুদের সৃষ্টি' এই ধারনাবশত বাংলা সাহিত্য চর্চা থেকে দুরে সরে ছিলেন। আবার হিন্দু সাহিত্যিকদের অনেকে মুসলিম রচিত সাহিত্যকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তিনি তাঁদের এই মানসিকতার সমালোচনা করেন। তিনি হিন্দু মুসলমানদের মিলন ও যৌথ সাহিত্য চর্চার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি লিখেনঃ

'বঙ্গ ভাষা হিন্দু ও মুসলমানের নিকট সমভাবে আদরণীয়।.....যে পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান পরস্পরের কুৎসা হইতে বিরত না হইবে, যে পর্যন্ত বঙ্গ ভাষায় সংস্কৃত ও মুসলমানী শব্দের সমবায় না হইবে; যে পর্যন্ত উভয় ভাষায় জাতির মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত না হইবে, সে পর্যন্ত বঙ্গ দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত।.....জাতি ও বর্ণের ভেদ অনুসারে ভাষার ভেদ হওয়া অযৌক্তিক। ভাষার যত ভেদ হইবে, শ্রেণীগত পার্থক্য ততই বৃদ্ধি পাইবে, জাতীয় জীবনের ততই লোপ হইবে, সাহিত্যের ততই অবনতি ঘটিবে।'[২৯]

তিনি একজন মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। নিজের ধর্মের প্রতি প্রচন্ড রকমের অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও পরধর্ম দ্বেষ তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না । সমাজের সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব গড়ে উঠুক তিনি তা একান্তভাবে চেয়েছিলেন। দেশ ও জাতির

---

[২৭] *খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী*, ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ৩০।

[২৮] ঐ পৃঃ ৪০।

[২৯] ঐ পৃঃ ৩৮, ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

সার্বিক উন্নয়নের জন্য তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মিলনের আহবান জানান। তাঁর অসাম্প্রদায়িক মানসের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'মহাপুরুষের অমীয়বাণী' পুস্তকে। এই পুস্তকে হাদীস ও মুসলিম সূফী সাধকদের বাণীর সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণীও উদ্ধৃত করেন।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া ছিল তাঁর একান্ত বাসনা। তাই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজে যুগোপযোগী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাঁদেরকে জীবন সংগ্রামের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা তাই তিনি নারী শিক্ষা, কৃষি ও কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিজীবী ছাত্রদেরকে কৃষি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি সুপারিশ করেছিলেন। বাংলার মুসলমানদের সিংহভাগ কৃষিজীবী। সুতরাং কৃষি বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টিতে তিনি অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেনঃ

> 'সর্ব্বজন বিদিত দারিদ্র্যবশত মুসলমান সন্তানগণ অধিক দুর অগ্রসর হইতে পারে না; ফলে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বেই মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির জন্য উচ্চতর শিক্ষা প্রয়োজনীয় নহে, সর্ব্বসাধারণের জন্য মোটামুটি প্রাথমিক শিক্ষা যত আবশ্যক। .....ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, অধিবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করিতে হইলে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায় ও শিল্প শিক্ষা আব্যশ্যক।'[৩০]

---

[৩০] খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, ৮ম খন্ড, ঢা.আ.মি.পা. ট্রাষ্ট, প্রাগুক্ত পৃঃ ৭২৮।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, উনিশ শতকের শেষার্ধে 'আঞ্জুমানে ইসলামী'[৩১] এর নেতৃবৃন্দ এবং পরবর্তী পর্যায়ে নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, মওলানা ওবায়দুল্লাহ ওবেদী প্রমুখ বাংলায় রেনেসাঁর সূচনা করেন। তাঁদের অসমাপ্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য যে সকল নিঃস্বার্থ নিবেদিত প্রাণ মনীষী এগিয়ে এসেছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (রঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম।

তাঁদের কাজ মোটেই সহজ ছিল না। তাঁদের সামনে ছিল পর্বত প্রমাণ সমস্যা। ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রশ্নে বাংলার মুসলিম সমাজ আলোচ্য সময়ে দ্বিধা বিভক্ত ছিলেন। আত্মপরিচয়ের সন্ধানে তাঁরা ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। জাতির এই সংকটকালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এবং আরো বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী জাতিকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে এক অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

প্রয়োজনীয় মুহূর্তে স্বীয় পশ্চাৎপদ সমাজকে শিক্ষিত সচেতন ও জীবন সংগ্রামে প্রতিযোগিতার জন্য যোগ্য করে তাঁরা গোটা বাঙালি মুসলিম জাতিকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের এই অমূল্য অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া উচিত; বিশেষ করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর বর্তমান প্রয়াস তারই স্মারক।

---

[৩১] এই সংগঠনের নেতাদের মধ্যে ছিলেন মৌলভী আব্দুর রউফ, মৌলভী মোহাম্মদ মাযহার, নবাব আব্দুল লতীফ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) এর সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

১৮৩৫ সালে ভারতবর্ষে ফার্সীর পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা রূপে ইংরেজি চালু হবার পর ভাষা সমস্যার সূত্রপাত হয় (বিশেষত বাংলার)। পূর্বে রাষ্ট্রভাষা ফার্সী থাকার সময় শাসক গোষ্ঠীর কৃপা-আনুকূল্য ও চাকুরি-বাকুরি লাভের আশায় উপমহাদেশের মানুষ তখন রাজভাষা ফার্সী শিখত, সাথে আরবীও শিখত। ব্যুৎপত্তি ও পান্ডিত্য অর্জনের চেষ্টা করত এ দু'ভাষায়। সঙ্গত কারণেই রাষ্ট্রভাষা পরিবর্তনের ফলে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে সারা মুসলিম কবিদের উপর। মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলো এর প্রকৃষ্ট নজির।

> 'কিন্তু এদেশে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর ১৮৩৫ খ্রিঃ এ ফার্সির পরিবর্তে সরকারী কার্যকান্ডের সকল পর্যায়ে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ফলে আর্বি-ফার্সি শিক্ষিত এক বিপুল জনগোষ্ঠী চাকুরি-বাকুরি ও রাজকার্যে তাঁদের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে পরিবর্তিত নতুন পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে নব্য শাসক শ্রেণীর কৃপা-অনুকূল্য লাভের আশায় অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। ইয়ংবেঙ্গল সোসাইটির আমলে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, মুল্যবোধ ও যুক্তি বিচার আত্মীকরনের প্রয়াস প্রবল আকার ধারণ করে।'[১]

---

[১] ডঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ, *নজরুলের কবিতা ও গানে আর্বি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, সাহিত্য পত্রিকা (নজরুল জন্ম শত বার্ষিকী সংখ্যা), বিয়াল্লিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০৫, পৃঃ ২৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান সম্প্রদায় প্রথমে সাম্রাজ্য হারানোর শোকে, অভিমানে ও পরদেশ লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনী শক্তির প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণাবশত ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয় প্রবল অর্থনৈতিক দুরবস্থা। তদুপরি গোদের উপর বিঁষফোড়ার মত ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি উদ্গত হয়ে বিষয়টাকে আরো গুলিয়ে তোলে। ধর্মীয় নেতা ও ধর্মতত্ত্ববিদেরা বিদেশাগত মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর ভাষা ফার্সী ও কোরআনের ভাষা আরবীকে আল্লাহর ভাষা মনে করে দু'ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার তাগিদ অনুভব করেন এবং ইংরেজিকে নাছারাদের কুফুরি ভাষা জ্ঞান করে সে ভাষা শিক্ষা না করার জন্য জোর প্রচারণা চালান, ধর্মবিশ্বাসী, অশিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে। ফলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। তারা যে শুধু ইংরেজি ভাষা শিক্ষা গ্রহন থেকে বিরত থাকে তা নয়, মাতৃভাষা বাংলাকেও তারা মনে করতে থাকে হিন্দুয়ানী ভাষা, কুফুরি কালাম। অবশ্য এটা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মনোভাবেরই প্রভাব। এবিষয়ে দু'একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। যেমনঃ 'নজরুল সাহিত্যে ধর্ম' গ্রন্থে ড.মোঃ হারুন অর রশীদ উল্লেখ করেনঃ

> 'পুরোহিত তন্ত্রীদের কাছে দেবভাষা সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে মাতৃভাষা বাংলায় জীবন বিধান রচনা, ব্যাখ্যা ও অনুশীলন শুধু অন্যায়ই নয়, নারকীয় ব্যাপারও ছিল বটে।'[২]

এবং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে দীনেশ চন্দ্র সেন উল্লেখ করেনঃ

> 'অষ্টাদশ পুরাণানী রামস্য চরিতানি চ ভাষায়াং মানব শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।'[৩]
>
> 'বাংলা ভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা বা অনুবাদ করা অন্যায়, নিন্দনীয় ও নারকীয়।'[৪]

---

[২] ডঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ, *নজরুলের সাহিত্যে ধর্ম*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আশ্বিন, ১৪০৩/অক্টোবর ১৯৯৬, পৃঃ ২।

[৩] দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ১১৪।

[৪] ডঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২।

Dhaka University Institutional Repository

এর সঙ্গে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের ইংরেজি শিক্ষা বর্জন এবং হিন্দুয়ানি ভাষা জ্ঞান করে বাংলা ভাষার চর্চা নিরুৎসাহিত করা একই রকম হঠকারি ব্যাপার। তবে এ প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা জরুরী যে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চর্যাকার ও মুসলিম কবিদের সমস্যা একরূপ ছিল না। হিন্দু কবি বা বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থীদের বিষয়টা ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করা ছাড়া অন্য কোন লেখায় বাংলা ভাষা চর্চা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের আর কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। কিন্তু মুসলিম কবিদের ব্যাপারটা ছিল প্রধানত সামাজিক। সেদিনের অভিজাত মুসলিম সমাজে আরবী-ফার্সী ও ক্ষেত্রবিশেষে উর্দু ছাড়া অন্যকোনো ভাষায় এবং বাংলা ভাষায়ও সাহিত্য চর্চা আভিজাত্য হানিকর ও নিন্দনীয় ছিল এবং একারণেই কেউ বাংলায় গ্রন্থ রচনা করলে সেটা মুসলিম সমাজে অপরাধ বলে গণ্য হত। এর সঙ্গে কবিদের বিরুদ্ধপক্ষ, সম্ভবত যারা ধর্মের বিশারদ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তারা যুক্ত করেছিলেন ধর্মীয় কিতাবের কথা। তাদের মতে, বাংলায় ধর্মমূলক গ্রন্থ রচনার জন্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সম্ভ্রমহানি ঘটছে। কোরআন কিতাব হিন্দুয়ানি দোষে দুষ্ট হচ্ছে। এটা আপত্তিজনক। অতএব পরিত্যাজ্য। অভিযুক্ত কবিদের তাই বাধ্য হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে জবাব দিতে হয় ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। ১৫৮৪ সালে সৈয়দ সুলতান 'নবী বংশ' নামক গ্রন্থ মাতৃভাষা বাংলায় রচনা করেন এবং তাতে তিনি বলেনঃ

'মুনাফিকে বোলে আম্মি কিতাবেতু কাড়ি
কিতাবের কথা দিলু হিন্দুয়ানী করি।'[৫]

কিন্তু কবির মতে, দলটি কপট বিশ্বাসী 'মুনাফিক' এবং তাঁদের অভিযোগ ভিত্তিহীন, তাঁর ভাষায়ঃ

'আল্লাহ্ বুলিছে- মুঞি যে দেশে যো ভাষ,
সে দেশে সে ভাষে কৈলু রসুল প্রকাশ।'[৬]

---

[৫] প্রাগুক্ত।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের আর এক কবি আবদুল হাকিমকেও 'নুরনামায়' (আনুমানিক ১৬২০-১৬৯০খ্রিঃ) বলতে হয়ঃ

'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী ।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায় ।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায় ।'[৭]

উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, বাঙালি মুসলমানের ভাষা সমস্যা প্রধানত রাষ্ট্রভাষা রূপে ইংরেজি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রকটাকারে শুরু হলেও পরোক্ষভাবে তার শিকড় অন্য জায়গায় । এমন কি এদেশে ইংরেজ আগমনের বহুপূর্ব থেকেই তা বিদ্যমান ছিল এবং ছিল তা মূলত ধর্মগত পরিশুদ্ধির খোঁড়া অজুহাতে; অজুহাত বলছি একারণে যে, মাতৃভাষার চর্চা কোন ক্রমেই ধর্ম বিরোধী কোন বিষয় নয় । বিষয় যে নয়, সে কথা তো সৈয়দ সুলতান আল-কোরআনের বরাতে স্পষ্ট করে বলেছেন । 'আল্লাহ প্রত্যেক গোত্রে নবী প্রেরণ করেছেন তাদের নিজ ভাষায় ।'(আল-কোরআন ১৪/৪) ভাষা সাহিত্য চর্চা বিষয়ে মুসলমানের অযৌক্তিক চিন্তার ফল এই যে, তারা আসলে আত্ম-সচেতন পশ্চাৎপদ মানসিকতার পরিচয় দিল । খোলা চোখে, সাদামাঠা দৃষ্টিতে কোন কিছুর বিচার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন করার মত স্থির চরিত্রের বড় বেশী অভাব ছিল তাদের । এ কথা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর পূর্বকালে যেমন সত্য ছিল, তার সময়েও তেমনি মিথ্যা ছিলনা । সুখের বিষয় এই যে, তাঁর প্রবল একনিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন ধার্মিকতা তাঁকে পূর্বসূরিদের মত বিভ্রান্ত করেনি । উচ্চ শিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে বাঙালি জাতির অন্য সকল সমস্যার মত মাতৃভাষা চর্চা সমস্যাকেও তিনি আবেগহীন সত্য দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।

---

[৭] বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, আহছানউল্লার ভাষা সাহিত্য চিন্তার প্রতিবেশ ও গতি প্রকৃতি,উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমী, পৃঃ ২৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। জন্মেছিলেন সাতক্ষীরা জেলার নলতা গ্রামে ১৮৭৩ সালে। বিচিত্র কর্মলীলার মাধ্যমে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন উনিশ শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি কালসীমা। ১৯৬৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁর ভাষা-সাহিত্য বিষয়ে চিন্তা-চেতনা, চর্চা ও লক্ষ্য ছিল স্থির নির্দ্দিষ্ট-কেন্দ্রানুগ। নিজ শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ডের মধ্যে তাঁর যে বিস্তার, তা অবশ্যই তৎকালীন আত্মসচেতন বাঙালি মুসলমানের প্যান-ইসলামিক আদর্শযুক্ত হয়েও জাতীয়তাবাদের আবহকে ধারণ করেছিল এবং বাঙালি মুসলমানের রক্ষণশীল ধারার বহির্ভূত যে উদার নৈতিক সামঞ্জস্যবাদের চেতনাটি ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিল-তিনি ছিলেন তারই অন্তর্গত। এ সম্পর্কে তৎকালিন মুসলিম শিক্ষিত সমাজে পরিচ্ছন্ন ধারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে ১৯২০-এর দিক থেকে, এরকম একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি 'ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক-সম্মেলন' এ প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ থেকে পাওয়া যায়,

> 'বাংলার মুসলমান এক সম্পূর্ণ নুতন পরিবেষ্টনে এখন উপস্থিত। সেই পরিবেষ্টনে আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্য নতুন আয়োজন তার চাই কিন্তু সেই আয়োজনের উপকরণ সে যে তার চারিদিকে সন্দিগ্ধ ও অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাবে না, পাবে শান্ত ও সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই, এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাটি সে বুঝছেনা।'[৮]

কিন্তু খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বুঝেছিলেন। এটিই তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা প্রবণতার ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। তাঁর আত্মগত মহিমা। তিনি ছিলেন স্থির প্রাজ্ঞতার প্রতীক পুরুষ। বেগম আকতার কামাল মনে করেন,

---

[৮] ঢাকা মুসলিম সমাজের বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতি তস্দুক আহমদের অভিভাষণ, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬ এবং বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

'তদুপরি ভারতীয় সুফীতত্ত্বের ঐতিহ্যবাহী ভাবনার দ্বারাও সংক্রমিত-
বিশেষত যোগসাধন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্বন্ধ ছিল গভীর।'[৯]

কথাটা যে মিথ্যা নয় বরং সত্যবিদ্ধ; খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর এতদসম্পর্কিত অভিমত থেকেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেনঃ

'কেবল মানসিক জ্ঞান মানবকে পূর্ণত্ব দিতে পারেনা। মানুষ দেহ, মন ও আত্মার সমষ্টি, যে জ্ঞান দ্বারা মন ও আত্মা পুষ্ট হয়, সেই প্রকৃত জ্ঞান। যে জ্ঞান স্রষ্টা ও সৃষ্টির দুরত্ব নষ্ট করিয়া যোগ সাধনের সহায়তা করে সেই জ্ঞানই জ্ঞান।'[১০]

অবশ্য সে কালের মুসলিম সমাজ মনস্কতার একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ, ধর্মীয় উপাখ্যানের নৈতিক তাৎপর্য বিচার ও মূল্যায়ন, ঐতিহাসিক সত্য তত্ত্বের ব্যবহার এবং পীর, দরবেশ, সাধক আওলিয়ার জীবন মাহাত্ম্য সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবহার। এসবের উদ্দেশ্যও ছিল স্পষ্টতর আকাঙ্ক্ষা সিক্ত। অর্থাৎ সমাজ গঠনের সূত্রই ধর্মকে ব্যবহার করতে চেয়েছে। এই শর্তেই 'আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর মনোজগতে নীতিজ্ঞান ও ধর্ম দুয়েরই অবস্থান ছিল পারস্পরিক।'[১১] এর সাথে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত ছিল সমাজহিতৈষণা ও মানবকল্যাণ কামনা। সমাজ-পরিবেশ, পারিপার্শ্ব, প্রকৃতি ও প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অংশ মানুষকে উপেক্ষা করে যে আধ্যাত্মিকতা, তাতে তাঁর বিন্দু মাত্রও আগ্রহ ছিলনা। তিনি বিশ্বাসও করতেন না যে, সে রকম আধ্যাত্মিকতায় আত্মতুষ্টি ও আত্মার মুক্তি আদৌ সম্ভব। তাঁর উচ্চকিত সমাজ ও শিক্ষা চিন্তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মেলে তাঁর নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যেঃ

---

[৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, আমার জীবনধার, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৬, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৫২, এবং বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

[১০] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

[১১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান, ঢাকা, পৃঃ ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

'ম্যালেরিয়া অতীব মারাত্মক ব্যাধি সন্দেহ নাই। মূর্খতা ম্যালেরিয়া অপেক্ষাও ভীষণ। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এবং সম্পদ জনসাধারনের জ্ঞান। শিক্ষা ব্যতীত বর্তমান যুগের জটিলতার মধ্যে জীবন সংগ্রামে মোটামুটিভাবে সাফল্য লাভ করাও সম্ভব নহে।'[১২]

তাঁর সমাজ মনস্কতা অবহেলিত, অজ্ঞাত, লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষ সম্পর্কেও, এতদসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি বেগম আকতার কামাল আলোচিত মূল্যায়িত সাহিত্য-চিন্তা বিষয়ে একটি প্রাজ্ঞ মন্তব্যঃ

'উনিশ শতকীয় ভাবাবহে সমাজতন্ত্রের একটি অস্ফুট ইঙ্গিত লক্ষ্য যোগ্য হয়ে উঠেছিল রেনেসার প্রতিবিম্বে এবং এটি ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্মবাহী সাম্যবাদের যাত্রার সঙ্গে আত্মভূত হচ্ছিল। প্রসঙ্গত রামমোহনের সঙ্গে রবার্ট ওয়েনের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক তর্কের তথ্য মনে করা যেতে পারে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে (১৯১৯) ভারতে তার প্রভাব সৃষ্ট কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, মূলগত এই সাম্রাজ্যবাদী ভাবটি মুসলমান বাঙালির চিত্তকেও প্রভাবিত করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ায় মানুষ ক্রমেই বস্তুমুখী, আন্দোলন প্রিয় ও যুক্তিবাদী হয়ে উঠছিল। তারা আধুনিক সাম্যবাদের উৎস হিসাবে মুসলমান বাঙালির চিত্তকেও প্রভাবিত করেছে। তারা আধুনিক সাম্যবাদের উৎস হিসেবে ইসলাম ধর্মের সাম্যবাদী ধারনাকে বিবেচনা করতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে সচেতন আহছানউল্লা (রঃ) ১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'সাম্যবাদী' পত্রিকার ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশ করেন 'সান্দারদের প্রতি সমাজের অবিচার' শীর্ষক রচনা। প্রবন্ধটিতে সমাজচিত্রের একটি বস্তুনিষ্ঠ রুপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। বস্তুত সমাজ প্রতিবেশের ইতিবাচক সূত্রগুলো তার

---

[১২] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, আমার জীবনধারা, পৃঃ ১১০ এবং আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিপ্রতিভা ও মেধায় প্রবিষ্ট হয়েছে, যার মূল ভিতটাই ছিল শিক্ষালব্ধ মনোবিশ্বের সঙ্গে পারমার্থিক প্রজ্ঞার সংযোগে একটা প্রক্রিয়াকে জীবন সম্মত রূপ দেওয়া। তাতেই তিনি সাধনবাদী হয়েও জীবনের বাস্তব উপযোগকে স্বীকার করেন, স্বীকার করেন শিক্ষার প্রয়োজনকে, রাজনীতির তাৎপর্যকে, ভাষাগত চর্চা তথা সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনকে। 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুছলমান' (১৯১৮) শীর্ষক রচনায় তাঁর ভাষ্য 'বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা সমস্যার সহিত রাজনৈতিক সমস্যা জড়িত।' অথবা 'আমার জীবন ধারায়' বলেন 'ভ্রাতৃত্ব বিস্তার ও তৎসহ শান্তির সৃষ্টি মদীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।' আঁ-হজরতে (সাঃ)এর শিক্ষার অনুকরণের জীবন প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করাই আমার প্রচেষ্টা। কেবল বক্তৃতার দ্বারা ইহা সাধিত হয়না। কার্য্যের দ্বারা সাধন করিতে হয়।'[১৩]

শিক্ষাকে রাজনীতির সমস্যায় জড়িত করে দেখবার বোধ থেকেই তিনি অনুভব করেন হিন্দু-মুসলমানদের অসমবিকাশজনিত বাস্তব তথ্যটি। সমাজের দারিদ্র, শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একাধিক ভাষা বাহুল্য-এসবই তাঁর চিন্তায় প্রাথমিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি আরো ভেবেছেন চেতনার আলোক বিস্তারের আগে পারিপার্শ্বিকতা তৈরী করা দরকার। যে পারিপার্শ্বিকতা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একটি বাস্তব বিষয় হবে। এ কারণেই তিনি 'শহর থেকে দূরে সরিয়া মানবের খেদমত করাকেই' শেষ জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহন করেছিলেন। কর্মযোগী এই ব্যক্তিটির একটি পূর্বাপর স্থিরকৃত প্রত্যয়েই আমরা অনুধাবন করি। হয়তো বস্তু, দেশকাল তাতে বিমিশ্র আকারে সমস্যা ও রূপায়নকে আত্মভূত করে নিয়েছে। কিন্তু তার চিন্তা চেতনার অনুশীলনকে তিনি যে ভাবে বাস্তবায়নের উপযোগী করেছিলেন, সে দৃষ্টান্তটি অনুকরণ যোগ্য।

---

[১৩] বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

'তার ভাষা-সাহিত্য চর্চার সেই সব সংবেদন আকীন যে সব সংবেদন জড়িত রয়েছে তার আত্মবিহ্বল বিশ্ব রহস্যবোধ ও সৌন্দর্য চেতনা মুগ্ধতায়।'[১৪]

বাঙালি মুসলমানের ভাষা সমস্যার মুলে আছে আত্মগত শুদ্ধি ও জাতিগত শুদ্ধি রক্ষার্থে ধর্মীয় পবিত্রতা বা পারিবারিক আভিজাত্য-ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার আবেগী অবিবেচনাপ্রসূত বুদ্ধিভ্রষ্টতা যা ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। কোন ভাষাই নিকৃষ্ট নয়, অস্পৃশ্য নয়। নয় একারণে যে, পৃথিবীর তাবৎ ভাষার স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ। ভাষা আল্লাহ প্রদত্ত বড় নেয়ামত মানব জীবনে। অতএব আরবী, ফার্সী, উর্দু পাক জবান এবং সংস্কৃত, ইংরেজী, ল্যাটিন, হিব্রু, ফ্রেঞ্চ সহ অন্য সকল ভাষা অপবিত্রতার দোষে দুষ্ট অথবা কুফরী বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট এমন ভাবনা অযৌক্তিক। আরবী ভাষায় সাহিত্যের চর্চা যেন আরবী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর 'হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান' এর নমুনা তথা দেশপ্রেমের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তেমনি মাতৃভাষা বাংলার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে জাতীয় ভাষা সাহিত্যের উন্নয়ন প্রচেষ্টা একজন বাঙালির গৌরবদীপ্ত স্বদেশ প্রেমের অংশ। এবং প্রকৃত আভিজাত্যের নমুনা হতে পারে। মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার কোন বিকল্প হয়না। তদুপরি একথা সত্য যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের পূর্বে এবং রাষ্ট্রভাষা রূপে ইংরেজির প্রতিষ্ঠার পরও এমন কি বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও গৌরবোজ্জ্বল অর্জন ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের প্রাক্কালে এবং রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি অর্জিত হওয়ার পূর্বাহ্নেও বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মমোহতাড়িত বুদ্ধিজীবীগণের একটি বৃহত্তম অংশ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জোর ওকালতি শুরু করেন। এদের অনেকে আবার বিপুল উৎসাহে আরবী হরফে বাংলা লিখে ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করার মত আত্মঘাতী প্রস্তাব করতেও আদৌ কুণ্ঠিত হননা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) একজন নিবেদিত আশেকে রাসূল। আশেকে খোদা এবং একনিষ্ঠ ধর্মপ্রেমিক মানুষ হয়েও অতিউৎসাহী ধর্মশাস্ত্রবিদদের বিভ্রান্তিকর চিন্তার চোরাবালিতে

---

[১৪] বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

পা তো দেননি উপরন্তু মাতৃভাষার স্বপক্ষে নির্দ্বন্দ্ব বলিষ্ঠ ও জোরালো মনোভাব গড়ে তুলতে থাকেন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বিপক্ষে। এদিক থেকেও ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (রঃ) প্রমুখ ভাষাপ্রেমী মনীষীর মত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বাঙালি জাতির হৃদয়ে প্রাতঃ-স্মরনীয় ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার এবং প্রকৃত ধর্ম অনুরাগী ব্যক্তিরূপে অনুসৃত হবার যোগ্য। তিনি বলেন,

> 'এতকাল পর্যন্ত মাতৃভাষার কুটতর্ক লইয়া সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। উর্দু আমাদের মাতৃভাষা মনে করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য কেহ অগ্রসর হন নাই। বঙ্গব্যবচ্ছেদ সে তর্ক মিটাইয়া দিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে বঙ্গ ভাষায় সাহিত্য রচনা করা আবশ্যক। বঙ্গভাষা বলিলে একটি অবিচ্ছিন্ন ভাষা বুঝিতে হইবে।'[১৫]

অবিচ্ছিন্ন ভাষা মানে সংস্কৃত যুক্ত, সংস্কৃত সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা। ভাষা বিষয়ে এটিও তার একটি দুঃসাহসিক দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি মনে করেন,

> 'বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার ব্যবচ্ছেদ হয় নাই। জাতি ও বর্ণভেদ অনুসারে ভাষার ভেদ হওয়া অযৌক্তিক। ভাষার যতই ভেদ হইবে, শ্রেনীগত পার্থক্য ততই বৃদ্ধি পাইবে, জাতীয় জীবনে ততই লোপ হইবে, সাহিত্যের ততই অবনতি ঘটিবে।'[১৬]

তিনি আরো বলেনঃ

> 'মাতৃভাষাকে জাতীয়ভাবে ভাবাপন্ন করিতে হইবে। কারণ ভাষার সঙ্গে জাতির অস্তিত্ব জড়িত।'[১৭]

---

[১৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬ এবং বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২।

[১৬] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, বঙ্গভাষা ও মোছলমান সাহিত্য, পৃঃ ১৯।

[১৭] প্রাগুক্ত,পৃঃ ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

এসব আলোচনায় একথা বুঝা যায় যে, তিনি একটি শুভবোধের আলোকেই ভাষাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন জীবন দর্শনের প্রজ্ঞায়। এই সূত্রেই তিনি উক্তি করেন যে,

> 'বাংলা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি তখনই ঘটবে যখন বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ও মুসলমানী শব্দের সমন্বয় ঘটবে।'[১৮]

তিনি এও মনে করেন যেঃ

> 'ধর্মগ্রন্থের ভাষা ও মাতৃভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য। আবার ইংরেজি প্রায় পৃথিবীর সাধারণ ভাষা হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ সামাজিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কারণে ইংরেজী শিক্ষা না করিলে চলেনা; সুতরাং জাতীয় ইতিহাস ইত্যাদি বহুল পরিমানে মাতৃভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হইলে মুসলমান ছাত্রের গুরুভারের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে। বাংলা মুসলমানের মাতৃভাষা ভারতের অন্যান্য মুসলমানের মাতৃভাষা হইতে স্বতন্ত্র বিধায় তাহাদের পক্ষে ভাষা উঠাইয়া দিলে এবং ক্রমে উর্দূর পরিবর্তে বাঙ্গালা প্রচলন হইলে ভাষা সমস্যা কিছুটা সরল হইয়া আসিবে।'[১৯]

এখানে লক্ষণীয় যে, যেখানে আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর পূর্বসূরি এবং সমসাময়িক মুসলিম মনীষীবৃন্দের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল লেখালেখি, আন্দোলন-অভিভাষণের মাধ্যমে সমাজে আরবী, ফার্সী, উর্দুর চর্চা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি ও চর্চা করার, সেখানে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ভাষা সমস্যা সরল করে তোলার জন্য ক্রমান্বয়ে ফার্সী এবং উর্দু পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেবার মত বলিষ্ঠ পরামর্শ দেন। এবং মাতৃভাষা অনুশীলনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। একই সাথে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব যেমন তার চিন্তা-

---

[১৮] বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩।

[১৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

চেতনায় স্বীকৃত হয়েছে, তেমনি বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য ভাবে আলোচিত হয়েছে। আবার কোরআন-হাদীস ও ইসলাম, আকাইদ প্রভৃতি শিক্ষার প্রয়োজনে আরবী ভাষা শিক্ষাকে মুসলিম সমাজের জন্য জরুরী মনে করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে, মাতৃভাষাকে ছোট ভেবে নয়; বরং দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষা রূপে শিক্ষণীয় বিষয় হবে আরবী অথবা ইংরেজি। মাতৃভাষা বাংলার স্থান সবার ঊর্ধ্বে। এ বিষয়ে একটি নজীর উল্লেখ করা যায় ১৯১৮ সালে খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতির অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য'। বেগম আকতার কামাল বলেনঃ

> 'তার বক্তব্য ছিল, মুসলমান লেখকদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে, তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতা সাপেক্ষ সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে এবং পাশাপাশি অবস্থানরত হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের সম্প্রীতি-সহযোগিতায় আকাঙ্খামূলক।'[২০]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সাহিত্য চিন্তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে সেবা। তাঁর মতে সাহিত্য একটি আদর্শবাদকে মুখ্যত ধারন করবে, বিশ্বাস ও তত্ত্বকে সঞ্চারিত করবে এবং লেখার মধ্য দিয়ে সমাজের মঙ্গল সাধন করবে। বস্তুত সমকালীন যুগপরিবেশের ধারণাই এই চেতনার পেছনে প্রভাব ফেলেছে। তবে তিনি আদর্শবাদের প্রশ্নে ইসলাম ধর্মকে অবলম্বন করলেও এর ঐতিহ্যিক উপাদান ও তথ্য ব্যবহারে প্রকাশ্যে মাতৃভাষার চর্চা করতে বলেছেন, নইলে মাতৃভাষা মুসলমানের আপন ভাষা মনে হবেনা।

> 'যত অধিক ভাবে ইসলামিক উপাদান বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হবে তত অধিক ভাষা, জাতি উন্নত হবে।'[২১]

---

[২০] বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫।

[২১] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬, এবং বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

এক কথায় তাঁর সাহিত্যচর্চা কল্যানকামী। ভাবনির্ভর ভাষা এবং ভাষানির্ভর বিষয় নির্বাচনের মাধ্যমে সাহিত্য অনুশীলনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে ঃ

> 'আহ্ছানউল্লার সাহিত্যবোধ রূপদক্ষ শিল্পীর পরিচর্যায় গঠিত নয়, বরং তা দায়িত্ব প্রবণ অথচ আত্মমুগ্ধ ভাবুক চিত্তের স্পর্শাক্রান্ত।'[২২]

তাঁর প্রত্যয় ছিল সাহিত্য অনুশীলনে উচ্চভাবের চর্চা করে সমাজ মানসকে প্রভাবিত করা সম্ভব এবং সম্ভব সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধন। এ সম্পর্কে তিনি লেখেন,

> 'যে সমাজ বা জাতির মধ্যে উচ্চভাবাপন্ন ব্যক্তি যত অধিক সে সমাজ বা জাতির সাহিত্যও তত উন্নত।'[২৩]

তাঁর সাহিত্য চিন্তার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে শিশু চিত্তের বিকাশ ও চরিত্র গঠন মূলক বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ। যেন সাহিত্য রুচির মাধ্যমে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে শিশু মনে রুচিসম্মত ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারনা, কর্মপ্রেরণা, ত্যাগ, তিতিক্ষা বোধ এবং সেবা, প্রেম-ভালবাসার প্রবণতা, লোক হিতৈষণা।

তাঁর ভাষা সাহিত্য চর্চার অন্য একটি বৈশিষ্ট্যও স্পষ্ট ভাবে গোচর হয়। তা হচ্ছে সাহিত্য বা ইতিহাসে লোক প্রচলিত বিভ্রান্তি মূলক বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত ও অযৌক্তিক বিষয়ের বিরুদ্ধাচরণ করে সত্য উদঘাটন এষনা। বিবেকী তাগিদ থেকেই তিনি মনে করতেন, অসত্যের বাতাবরণ ভেদ করে সত্যকরোজ্জ্বল দীপ্তি পাঠকের চেতনায় সঞ্চারিত করে দেয়া একজন সৎ ও আদর্শবাদী লেখকের অবশ্য করনীয় কাজ। এ পর্যায়ে তিনি রচনা করেন 'মহর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা'-র মত সত্যদীপ্ত গবেষণা সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

ইতিহাস বোধ

---

[২২] বেগম আকতার কামাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৭।
[২৩] নির্বাচিত প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬, এবং স্মারক গ্রন্থ পৃঃ ২৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) দীর্ঘ মহৎ জীবনের অধিকারী ছিলেন। শুধু ৯১ বছর আয়ুর কারণে নয়; কর্ম-সাধনা, দর্শন এবং নজির সৃষ্টির জন্যই তাঁকে মহৎ জীবনের অধিকারী বলে চিহ্নিত করতে হয়। তাঁর অনুপুঙ্খ জীবনী উপস্থাপনা বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। এত সংক্ষেপে তা করাও সম্ভব নয়। পরন্তু একথাও যথার্থ যে, খানবাহাদুর (রঃ)এর কর্মময় জীবনের নানা দিগন্ত এবং বহুমাত্রিক চেতনার সমগ্রতা স্পর্শও এক বিপুল গবেষণার কাজ। তাঁর ইতিহাস জ্ঞান এবং ইতিহাস চেতনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল।

তিনি ছিলেন দর্শনের ছাত্র; অথচ ভাষা সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, তাসাওউফ ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য এবং নিরলস সাধনা আমাদের বিস্মিত করে। ইতিহাস সম্পর্কে তার ধারনা অনেক বিদগ্ধ ঐতিহাসিকদের চেয়ে সমৃদ্ধ নয়। তিনি বলেছেনঃ

> 'ইতিহাস জাতীয় জীবনের প্রধানতম উৎস এবং ইতিহাস আলোচনা জাতীয় উন্নতির প্রশস্ত সোপান। ইতিহাস অতীতের আবরন উন্মোচন করিয়া তাহাদের পূর্বপুরুষগনের জীবন যুদ্ধের ধারনা সন্ধান বলিয়া দেয় এবং তাহাদের গুণ গরিমায় এবং বীরত্ব ও মহত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদিগকে সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিবার শক্তি প্রদান করে।'[২৪]

আহ্ছানউল্লা (রঃ) ছিলেন বহুমাত্রিক লেখক। তাঁর রচিত গ্রন্থসংখ্যা প্রায় আশিটি। ইতোমধ্যে তাঁর রচনাবলী সংগৃহীত, সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হচ্ছে, যার ১৪টি বৃহৎ কলেবর খন্ড আমাদের হাতে এসেছে। এই রচনাবলীর আলোকে তাঁর প্রতিভার বিচার করা যাবে। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইতিহাস গ্রন্থের সংখ্যা কমপক্ষে ১০ খানা। সংখ্যা বড় কথা নয়, ইতিহাস প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা কতটা উন্নত, কতটা তাৎপর্যপূর্ণ মূল্য তা গবেষণার দাবী রাখে।

---

[২৪] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, 'মুসলিম জাহান' খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ৭ম খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃঃ ৩৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ইতিহাস গ্রন্থগুলোকে প্রধানত (১) তাত্ত্বিক ইতিহাস (২) জীবনী এবং (৩) ইতিহাসের আলোকদীপ্ত ধর্মগ্রন্থ পর্যায়ে বিবেচ্য, সর্বোপরি তাঁর প্রায় সমগ্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে আছে ইতিহাসের আলো। যে দর্শন ও প্রজ্ঞার আলোকে তাঁর সৃষ্টিকর্ম উদ্ভাসিত তার মধ্যে প্রধানত ইতিহাসের উপাদান অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

তাঁর ইতিহাস জ্ঞান যেমন গভীর তেমনি ইতিহাস সাধনাও ব্যাপক। আরব, ভারত, স্পেন, তুরস্ক, আফগানিস্থান, পারস্য, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের প্রাচীন মধ্যযুগ এবং আধুনিক কালের ইতিহাস পরিচয় তিনি বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন। আরবী এবং ইংরেজি ভাষায় পান্ডিত্যের কারনে তিনি ব্যাপক অনুসন্ধান করতে পেরেছেন। ইতিহাসের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণের পর তাঁর যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ

> 'মুসলমানেরাই জগতে ইতিহাস শাস্ত্রের জন্মদাতা ও মন্ত্রগুরু। সুপ্রাচীনকাল হইতেই তাহাদের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ধারাবাহিক ইতিহাস বিদ্যমান আছে জগতের আর কোন জাতির সেরূপ ইতিহাস নাই। ইসলামের সভ্যতা ইহার বিরাট বিস্তৃতির প্রধান হেতু। ইসলামের অভ্যুদয়কালে ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্ম ইহার প্রবল গতিরোধ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য হইতে পারে নাই।'[২৫]

কিন্তু তথাকথিত মহল এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ধারকগন এ ধারণাকে মৌলবাদীও বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। তাছাড়া কোন জাতি, কোন ধর্ম, কোন জাতির সভ্যতা এবং ইতিহাসকে খাটো করে দেখবার কোন প্রবণতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। নির্মোহ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষনে তাঁর বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত।

---

[২৫] প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বিশাল রচনাবলী ইতিহাসের উপাদান এবং রহস্যে ভরা। যে কোন জাতির ইতিহাস আলোচনায় তাঁর আগ্রহ এবং নিরপেক্ষতা অবিচ্ছিন্ন রয়েছে। তাঁর কাছে ইতিহাস নিরেট তথ্যমাত্র নয়, তা মানবজাতির জীবন প্রবাহের প্রাণময় রূপ। ইতিহাসের সঙ্গে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির যে গভীর সম্পর্ক আছে তা খানবাহাদুর (রঃ)এর বক্তব্যে অত্যন্ত স্পষ্ট।

জাতীয় ইতিহাসকে অকলঙ্কভাবে প্রকাশ করবার জন্য তাঁর বাসনা ঐকান্তিক। জাতীয় অতীত ঐশ্বর্য তাঁর কাছে এক অসাধারণ আকর্ষনের বিষয়। তিনি মনে করেন মুসলমানের পূর্ব ইতিহাস পৌরুষ ও প্রতিভার জ্বলন্ত নিদর্শন। সমকালের দূর্বল মুসলমান সমাজ তাঁর মনে বেদনা জাগায়। তাদের মুক্তির উপায় চিন্তা করে তিনি বলেনঃ

> 'পূর্ব্ব ইতিহাস একবার মনে জাগাইয়া দিতে পারিলে মুসলমান যে পূর্ব্ব মহিমা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আক্ষেপের বিষয় এই যে, বঙ্গভাষায় মুসলমান ইতিহাসকে কলুষিত হইতে দেখিয়াও কোন মুসলমান ঐতিহাসিক ইহার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। পৃথিবীতে যে সকল উন্নত জাতি আছে, সকলেরই ইতিহাস সাহিত্যের প্রধান অঙ্গস্বরূপ।'[২৬]

ইতিহাস ও সাহিত্যের এই মিলনকামনা আমাদের অন্য কোন লেখক, শিল্পী করেছেন কিনা আমরা বলতে পারি না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর এই অনুভূতি মৌলিক। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর উন্নত জাতির ইতিহাস সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ বা উপাদান। মাতৃভাষার দ্বারা শৈশবকাল থেকে পূর্বপুরুষদিগের গৌরবকাহিনী শিক্ষা দিতে পারলে জাতীয় মানসে তার বিরাট প্রভাব পড়ে। খানবাহাদুর উল্লেখ করেনঃ

> 'হযরত ওসমানের ন্যায়পরায়ণতা, শিশুশ্রেষ্ঠ হযরত মহীউদ্দীনের সত্যপ্রিয়তা, হজরত ইমাম হোসেনের ধৈর্য্য ও প্রতিজ্ঞা, হযরত ওয়ায়েস করনীর গুরুভক্তি,

---

[২৬] প্রাগুক্ত, বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত গাজ্জালির পান্ডিত্য, হযরত রাবেয়ার ঐশী-প্রেম যদি পাঠক মনে মাতৃভাষায় সঞ্চারিত করা যেত তবে আমাদের শিক্ষা পূর্নত্ব লাভ করতো।'[২৭]

জাতীয় জাগরণের মহান উপকরণ হিসেবে খানবাহাদুর (রঃ) ইতিহাসকে বিবেচনা করেছেন। পাঠ্যপুস্তক রচনা কার্যে আত্মনিয়োগ বা শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় নিমগ্ন হওয়া সম্ভবতঃ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ১৯৩৫ সালে রচিত এবনে ছউদ, ১৯৩৪ সালে রচিত মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এই উদ্দেশ্যের ফসল। প্রাক-ইসলামী আরবে যে তমসাচ্ছন্নতা ছিল ইসলামের আবির্ভাবে তা দূরীভূত হয়। শুধু তাই নয়, ইসলামের প্রভাবে জিব্রাল্টার থেকে সিন্ধু পর্যন্ত এবং মধ্য-আফ্রিকা থেকে পারস্যোপকুল পর্যন্ত আলোকোজ্জ্বল করে তোলে কিন্তু কালের আবর্তনচক্রে আরবভূমি পুনরায় অজ্ঞান ও কলহের লালনভূমিতে পরিণত হয়। এবনে ছউদ (জন্ম ১৮৮০) আরবের নব্যকলহ, অনৈক্য, হত্যা, সাম্প্রাদায়িকতা, শত্রুতা উৎপাটিত করে অপ্রত্যাশিত শান্তিধারা প্রবাহিত করেছেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বলে সমগ্র আরবদেশকে করায়ত্ব করে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এই কৃতী ব্যক্তির জীবন ও ধর্মের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা উপহার দিয়েছেন।

সম্রাট আলমগীর সম্পর্কে তাঁর লেখা 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব এবং মুসলিম সভ্যতা' (১ম ও ২য়) দু'খন্ডে বিভক্ত। এ গ্রন্থে আওরঙ্গজেব প্রসঙ্গে তাঁর যে বিশ্লেষণ তাতে তাঁর ইতিহাস জ্ঞানের অভিনব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। যখন আধুনিক ভারতবর্ষের জীবনে সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রবল, আওরঙ্গজেব সম্পর্কে অপপ্রচার এবং তার জবাব প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে তখন খানবাহাদুর তাঁর 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মুসলিম সভ্যতা' (১৯৪৯) রচনা করেন। গ্রন্থের শুরুতে তিনি বলেছেনঃ

'আওরঙ্গজেবকে বুঝিতে হইলে কেবল গজনীর সুলতান মাহমুদ বা দিল্লীর মোগল বাদশাহ আকবরের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না। আর্য্যযুগ,

---

[২৭] প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

মৌর্য্যযুগ ও গুপ্তযুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির তুলাদন্ডে তাহাকে ওজন করিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতা যে পরস্পর পরিপূরক তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এমন কি আদিম যুগের মিসর ও আসিরিয়ার দানও গণনা করিতে হইবে। প্রাচীন মিসরের স্থাপত্য অনুশীলনের সহিত শাহজাহানের শিল্পানুরাগকে এবং উমাইয়া যুগের শিক্ষার সহিত বর্তমান যুগের শিক্ষাকে পাশাপাশি রাখিলে প্রমাণিত হইবে যে History repeats itself। প্রাচীন যে বর্তমানের শিক্ষাগুরু তাহা ভুলিলে চলিবে না। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জন্মদাতা ছিল স্পেনের মূর বংশ, ধর্মে প্রেমের উন্মাদনা আসিয়াছিল চৈতন্য হইতে এবং শাসন প্রনালীর সুগঠন এবং সুশৃঙ্খল সাধন করিয়াছিল মোগল যুগে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র সংমিশ্রণ ছিল বৈদেশিক ধর্মের এককত্ব জ্ঞান মগধরাজ শোকের বৈরাগ্যভাব বিক্রমাদিত্যের বিদ্যানুরাগ রাজপুত জাতির যুদ্ধ কুশলতা ও আকবরের শাসন সংস্কার স্পৃহা। এতদুপরি আওরঙ্গজেব ছিলেন হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রকৃত অনূবর্তী ইসলামের খাঁটি সাধক।'[২৮]

অনেক ঐতিহাসিক বিদ্বেষবশত আওরঙ্গজেব চরিত্রে মসি লেপন করেছে। ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছিল। এই অপ্রীতি দূর করবার জন্যই তিনি নিরপেক্ষ সাধনা করে 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা' গ্রন্থে সত্য উপস্থাপন করেছেন।

এ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে আছে ৯টি অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায়ে আছে হিন্দুশাসন ও হিন্দুধর্ম শীর্ষক দু'টি বিষয়। এখানে লেখক সংক্ষেপে ভারতে হিন্দু শাসন (খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) এবং হিন্দু ধর্মের সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক রূপরেখা দান করেছেন। এ গ্রন্থে ইতিহাসের পঙতি বা তথ্যের যেমন পরিচয় আছে তেমনি আছে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত। ভারত

---

[২৮] প্রাগুক্ত, 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ১৮৫-১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

শাসনের ইতিহাসকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) হিন্দু শাসন, মোছলেম শাসন এবং ইংরেজ শাসন এ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট পর্যায় বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মোছলেম শাসনের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আখলাক বর্ণনা করেছেন। ভারতের ইতিহাস বলতে গিয়ে হজরত (দঃ) প্রসঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও এধরনের প্রয়াস নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। আবার তৃতীয় অধ্যায়ে বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের চরিত্র বর্ণনার পর সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। এই পটভূমিও তাৎপর্যহীন নয়। পরবর্তী ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম অধ্যায়ে আওরঙ্গজেবের চরিত্র, শাসন, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ এবং মোগল কীর্তি আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'বঙ্গদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' এবং বাংলার বারো ভূঞাগণ। শেষ অধ্যায়টি কাল এবং প্রশাসনিক গুরুত্বের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

মোটকথা এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সভ্যতার পরিচয় দান খানবাহাদুরের ইতিহাস ভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি আওরঙ্গজেবকে বলেছেন 'রাজর্ষি' অর্থাৎ আওরঙ্গজেব ছিলেন একাধারে ঋষি এবং রাজা। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে লেখক প্রচার করবার প্রয়াস পেয়েছেন। খানবাহাদুর ইতিহাস বিষয়কে বিবেচনাকালে বিদেশী ঐতিহাসিকদের মূল্যায়নও অধ্যয়ন করেছেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও শাসন পর্যালোচনার সময় তিনি ভিনন্টে স্মিথ, হ্যামিলটন, মনুচি, ওরমে প্রমুখের মন্তব্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন।

উক্ত 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব এবং মোছলেম সভ্যতা' গ্রন্থে খানবাহাদুর বঙ্গদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও বর্ণনা করেছেন। এখানে লেখকের তথ্যনিষ্ঠ এবং দেশাত্মবোধের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থ শেষে সংশ্লিষ্ট দেশকালের প্রচুর তথ্য লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর আরেক গ্রন্থ 'মুছলিম জাহান' (পরিবর্ধিত ২য় সং-১৯৬৩) একটি মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থখানি তিন খন্ডে বিভক্ত। লেখক অন্যত্র ইতিহাসকে সাহিত্যের অঙ্গরূপ বলে অভিহিত করেছেন তা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খন্ড দৃষ্টে মনে হয়। এখানে চিন্তার পূর্ণ তাত্ত্বিক বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলাম, পারলৌকিক জীবন, সূফীমত, মানবের স্বাধীন ইচ্ছা নবজাগরণ ইত্যাদি তত্ত্বপূর্ণ রচনা এবং ইসলামের ক্রমিক প্রসার, মধ্যযুগের মুসলমানদিগের বিদ্যাচর্চা ও প্রতিভা এবং প্রাক্কালীন মুসলিম জাতির শিক্ষোন্নতি তথ্যপূর্ণ ইতিহাস মূলক রচনা।

দ্বিতীয় খন্ড আল্লামা স্যার ইকবাল, মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ এবং পাকিস্তান এই তিনটি বিষয় প্রসঙ্গে। অতঃপর লেখক বহু মুসলিম দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করেছেন। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, খানবাহাদুর (রঃ) বিচিত্র দেশকাল সম্পর্কে অসাধারণ কৌতূহলী ছিলেন। দ্বিতীয় খন্ডের শেষে তিনি 'বাংলার ইতিহাস' বর্ণনা করেছেন অতি সংক্ষেপে। এটি ইতিহাস হয়নি, হয়েছে ইতিহাসের রূপরেখা। তৃতীয় খন্ডে খানবাহাদুর বহু রাজবংশের ইতিহাস লিখেছেন যথা- কোরায়েশ বংশ, এমাম বংশ, উমাইয়া বংশ, আব্বাসীয়া বংশ, মামলূক বংশ, ঘোরী বংশ, দুরানী বংশ ইত্যাদি। এসব বংশের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে সম্ভবত লেখক লক্ষ্য করেছেন ইতিহাসের ক্রমবিকাশ এবং নবজাগরণের প্রয়াস। ইতিহাসপ্রেমী খানবাহাদুর (রঃ) গণতন্ত্রকামী। তিনি বলেছেন, বর্তমান যুগে সর্বত্রই স্বাধীনতার চেতনা জেগেছে। কোথাও গণতন্ত্র এবং কোথাও রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে ক্রমে ক্রমে প্রতিটি রাষ্ট্র গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে খানবাহাদুর (রঃ) বলেছেনঃ

> 'মুসলিম জাতির ইতিহাস এত বিস্তীর্ণ ও বিপুল যে একজনের সীমাবদ্ধ জীবনে তাহার সম্যক অনুশীলন একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানা ভাষায়, নানা ঐতিহাসিকের লেখনী প্রসূত যে

Dhaka University Institutional Repository

সব গ্রন্থ রহিয়াছে তৎসমস্ত সংগ্রহ করিবার উপযোগী অর্থ সামর্থ্য এবং তৎসমুদয় হইতে উপাদান সংগৃহের উপযোগী জ্ঞানের পরিধি ও সময় অতি অল্প লোকেরই থাকিতে পারে।'[২৯]

তিনি বিশ্বের বহুদেশের মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, তাদের অবদান বিষয়ে তিনি তথ্যনির্ভর আলোচনা করেছেন। আরব থেকে মরক্কো এবং মালয়-ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বহু মুসলিম দেশের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক পরিচয় এ গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ায় ইসলাম এবং মুসলমানদের অবস্থার বর্ণনাও পাওয়া যায়।

'মুসলিম জাহান' গ্রন্থের পরিশিষ্ট তৃতীয় খন্ড 'পৃথিবীর ইতিহাসের সময় জ্ঞাপক রেখা' একটি শ্রমলব্ধ তালিকা। মানব সভ্যতার ইতিহাস জানতে এ তথ্যাবলী খুবই প্রয়োজন। নানাদেশের রাজবংশের উদ্ভব ও বিকাশের কালপঞ্জি, ১৯৬১ পর্যন্ত পৃথিবীর লোকসংখ্যা, ধর্ম অনুসারে রাজসংখ্যা, কমনওয়েলথের অধীনস্থ রাষ্ট্রসমুহের লোকসংখ্যা, বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যা, বিভিন্ন দেশবাসীর বয়সের গড় পরিমাণ, মধ্যযুগে মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার-এসব তথ্য সংগ্রহ এবং সংকলন করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) একটি অসাধারণ কাজ করেছেন। বর্তমান বিশ্বের গবেষণা এবং শিক্ষা সাধনায় সংখ্যাতাত্ত্বিক উপপাদ্যের গুরুত্ব অসামান্য। খানবাহাদুর (রঃ) মানব সভ্যতার বিকাশের নানা পর্যায় এবং অগ্রগতির ইতিহাসকে সংখ্যা ধারায় বর্ণনা করে একটি অভিনব কাজ করেছেন। এখানে তাঁর ইতিহাস চেতনার ব্যতিক্রমধর্মী পর্যায়ের উদ্ভব ঘটেছে। অধুনা জীবনী সাহিত্য ইতিহাসের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর 'আউলিয়া চরিত' (১৯৫৭) ঐতিহাসিক মহিমায় সমুজ্জ্বল। এ গ্রন্থের হজরত আলী (রাঃ), হজরত গউছুল আজম, আল গাজ্জালী, খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী, জালালুদ্দীন রুমী, মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এদের জীবনী ইতিহাস যেভাবে রচিত

---

[২৯] প্রাগুক্ত, 'মুসলিম জাহান' খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ৭ম খন্ড, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে সেগুলো অনেকাংশে হয়ে উঠেছে ধর্ম সাহিত্য। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রাঃ) অবশ্য ইতিহাসের উপাদান। মহাপুরুষচরিত রচনা খানবাহাদুর (রঃ) এর ঐকান্তিক আগ্রহের ফসল।

বাংলায় মহানবীর অনেক জীবনী আছে তবে সেগুলো এদেশের মুসলমানের জীবনে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) 'হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)' (২য় সং ১৯৩১) 'বিশ্ব শিক্ষক' (১৯৪৯), 'ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ' (১ম সং ১৯২৬) ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'নবী জীবনী', 'আউলিয়া চরিত' (১৯৫৭) 'দরবেশ জীবনী'তে ইতিহাসের পাতা থেকে রসূল এবং সূফীদের জীবনবাণী উদ্ধৃত করেছেন। এসব আদর্শ মহাপুরুষের জীবনসাধনার ফল, দেশকাল জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর। তিনি ছিলেন মানবকল্যাণব্রতী, উদার, অসাম্প্রদায়িক। যেমন ইসলামের মহানবী (সঃ) এবং মুসলিম মহাপুরুষদের ইতিহাস রচনা করেছেন তেমনি জরথূস্ট্র, খ্রিষ্ট, বুদ্ধ, মহাবীর, রামকৃষ্ণ, পরমহংস, শঙ্করাচর্য, বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেব, সারদামণি দেবী এদের বাণীও তিনি সংকলন করেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।

পত্র সাহিত্য ঃ

পত্র সাহিত্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর এক অনবদ্য সাহিত্য কীর্তি; ব্যতিক্রমধর্মী এসব পত্রাবলীর প্রতিটিই প্রেমের এক ফল্গুধারা।

বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁর ভক্ত, বন্ধু ও অনুরাগীদের সাথে পত্রালাপ করেছেন। এ সকল পত্রাবলির ৪টি সংকলন 'প্রেমিকের পত্রাবলি' এবং 'ভক্তের পত্র', 'ইরশাদে মুরশীদ' ও 'অমিয়বাণী' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রগুলি আধ্যাত্মিক রসের এক অপূর্ব ভান্ডার। কোন কোন পত্রে জীবন, জগৎ এবং জীবন যাপনের নানা সমস্যার অত্যন্ত সুন্দর বিশ্লেষণ দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি লেখকের অপরিসীম অনুরাগের পরিচয় প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি পত্রে বিধৃত হয়েছে। বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি এই পৃথিবীর আলো হাওয়া, অন্তবিহীন সৌরজগৎ, বিপুল বিশাল জলরাশি এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্যমন্ডিত নিসর্গ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কে অনবরত সচকিত করেছে, আন্দোলিত করেছে, করেছে বিমোহিত। লেখকের এই সচকিত নিসর্গ প্রেমের পরিচয় অনেকগুলো পত্রের উপজীব্য বিষয়। কিন্তু সৌন্দর্যপ্রীতি, নান্দনিক শোভা অবলোকনই লেখকের তৃষা নিবারণের জন্য যথেষ্ট নয়, লেখক এ সবের মাঝে সৃষ্টি কর্তার সত্য সুন্দর উপস্থিতির উপলব্ধিতে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছেন, পরম আনন্দ ও সুখের ঠিকানা খুঁজেছেন। পত্রগুলিতে লেখকের প্রবল আবেগ। উপলব্ধি ও ভাষার প্রাঞ্জল্য, ছন্দোময়তা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক তাঁর কবিমন ও শিল্পীমনের ছোঁয়ায় পাঠককে আপ্লুত করেছেন। 'ভক্তের পত্র' মূলত লেখকের ঐশী-প্রেমের আধার। কর্মব্যস্ত জীবনের ক্ষণিক অবসর মুহূর্তে, দূরের সফরে, স্বল্পকালীন যাত্রা বিরতিতে কিংবা কার্যোপলক্ষে নির্ধারিত কোন জায়গায় অবস্থানকালে লেখক তাঁর মনোভাব ও উপলব্ধির স্বাক্ষর রেখেছেন 'ভক্তের পত্রে'। নিম্নে তার কয়েকটি পত্র উদ্ধৃত হলোঃ

১.পত্র সংখ্যা ঃ ৯২। ২২.১.১৯২২। সমুদ্রবক্ষে জাহাজ, সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

'আজ নিষ্কর্ম্মা দিন; অন্তহীন আকাশ ঘোর-ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন, সমুদ্র-বক্ষঃ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। পূর্ব্বে পর্ব্বতমালা পশ্চিমে গতায়ু সূর্য্য অস্ত-গমনোন্মুখ, জাহাজ টলায়মান, মাঝে মাঝে ইঞ্জিনের গাঢ় গম্ভীর নিনাদ। আরোহীসকল বিভোর চিন্তায় মগ্ন। সমস্ত নির্ব্বাক স্পন্দনহীন। প্রতি মুহূর্ত্তে অনন্তের মাহাত্ম্য মানবের দুর্ব্বলতাকে স্পষ্ট করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এখানে বিজ্ঞানের কুহক নাই। যে একবার দুস্তর সাগর-বক্ষে ভাসিয়াছে, সে বুঝিয়াছে, মানবের শক্তি কত সীমাবদ্ধ যাহার বিশ্বাসের অভাব আছে, নির্ভর সম্পূর্ণ আসিতে চায়

Dhaka University Institutional Repository

না, সে একবার সমুদ্রযাত্রা করিয়া দেখুক, অনন্ত সমুদ্রের বীচিমালার অন্তরে কত গুপ্ত-রহস্য লুক্কায়িত আছে। মানুষ এমনই অহঙ্কারী, এমনই আত্মাভিমানী যে, সে পিতার দূরত্ব দেখিলেই তাহার অস্তিত্ব স্বীকারে সঙ্কোচ প্রকাশ করে। পুত্র হইয়া পিতার উপর কলঙ্কপাত নিদারুণ লজ্জার কথা আবার যাঁহারা পরম শিক্ষিত, তাঁহারা বহু পিতার অস্তিত্ব মানিয়া লইতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। সুপুত্রের উচিত, জন্ম-দাতার অস্তিত্ব ও একত্ব স্বীকার করা। যিনি অস্বীকার করেন, তিনিও যেমন দোষী, যিনি বহু পিতার প্রহসন করেন, তিনিও তেমনি দোষী। আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, তাঁহারা নিজের জন্ম নিজেরাই দেন; অন্যের অস্তিত্ব মানিতে তাঁহারা নারাজ। তাই বলি, যদি কেহ পিতাকে দেখিতে চান, তবে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিয়া সাগরের বুকে চলিয়া আসুন। সমস্ত ইন্দ্রিয় একতানে এক সুরে পরম-পিতার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সমুদ্রতীরের কীটানুকীটও সৃষ্টির অনন্ত রহস্য উদঘাটনে সাহায্য করিবে। সে তাহার ক্ষুদ্রবক্ষে কত শত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কৌশল ধরন করিয়া সৃষ্টিকর্তার অনন্ত মহিমার সাক্ষ্য দিতেছে। অগণিত ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, একটি ক্ষুদ্র কীটমধ্যে তাহা নিহিত আছে। মনুষ্য দেহে যাহা আছে, সকল জীবেই তাহা আছে। প্রাণি-জগতে যাহা আছে, জড়জগতেও তাহা আছে। যাহাকে আমরা বড় বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখি, সেও মানবকে অন্ধ বলিয়া ঘৃনা করে। বৈজ্ঞানিক জড় মধ্যে আজিও আত্মার সন্ধান পান নাই। দয়াল প্রভুতো কাহারো প্রতি নির্দ্দয় নহেন, তিনি যে সকলকেই তুল্য ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, মানব নিজের জ্ঞানের অন্ধকারে জড়ের সঞ্জীবতা দেখিতে অক্ষম। কোটি কোটি বিশ্ব যে প্রতি পরমাণুতে সুপ্ত রহিয়াছে, জ্ঞানী তাহার পরিচয় কোথায় পাইবে? জ্ঞানের গর্ব্বে সে জন্মদাতার পর্য্যন্ত অস্তিত্ব মানিতে নারাজ। বাস্তবিক কথা

Dhaka University Institutional Repository

এই যে, দোষ আমাদের জ্ঞানের, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের নহে। যেদিন অপার সৃষ্টি-কৌশলের রহস্য অনুভব করিবে, সেদিন জ্ঞানের গরিমা চুরমার হইয়া যাইবে; পিতার অস্তিত্বে বিশ্বাস আসিবে, প্রতি অণু-পরমাণু সঞ্জীবিত বোধ হইবে। প্রাণিজগৎ ও জড়জগৎ পরম পিতার যমজ সন্তান বলিয়া অনুমিত হইবে। ইতি'[৩০]

২.পত্র সংখ্যা ঃ ৮৭। ১৩.১.১৯২২। পূর্ণিমা রাত্রি-সমুদ্রতীর

'আজ পৃথিবী জ্যোৎস্না বক্ষে লইয়া কত কেলি করিতেছে। একবার এস, বিস্ফারিত লোচনে মহাপ্রভুর বিচিত্র কৌশল নিরীক্ষণ কর, আমরা আজ লোকালয় হইতে বহুদূরে প্রবাহিত হইয়া কুতুব আওলিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এখানে আছে হাসিভরা জ্যোৎস্না, এখানে আছে নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য, এখানে আছে মহাসমুদ্রের প্রাণভরা ডাক। অনন্ত মহিমার অনন্তচ্ছটা দিগদিগন্ত ঘোষণা করিতেছে। আমার ন্যায় দীনহীন পাপতপ্ত, তিমিরবৃত, অপূত আত্মার স্থান এখানে সমাবেশ হয় না। ক্ষমতা নাই যে, এই সুন্দর নীলনভোস্থলে থাকিয়াও সেই জ্যোতির্ম্ময় জগতপাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। অনধিক এক সপ্তাহ এখানে আসিয়াছি, পরিবর্ত্তন প্রতি অণুপরমাণুতে মাহছুছ করিতেছে, কিন্তু হৃদয় নাই যে, একবার প্রাণভরিয়া সেই পরমপিতার পরম নাম স্মরণ করি।.....

গোটা পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন এ-ক্ষুদ্র ভূমিখন্ডে আসিয়া মনে কত অভিনব ভাবের লহরী খেলিতেছে। সব চেয়ে সুন্দর এখানকার সহাস্য জ্যোৎস্না, প্রকৃতির ধ্যান

---

[৩০] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬০-২৬১।

Dhaka University Institutional Repository

গম্ভীর মূর্ত্তি, আর মহাসমুদ্রের আকুল আহবান। অনন্ত বায়ু অসীম বারিধি মাঝে পরম আহলাদে নৃত্য করিতেছে কিন্তু বায়ুর ন্যায় নির্ম্মুক্ততা কোথায় পাইব যে, গদ গদ ভাবে পরম পিতার নাম স্মরণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইব।

আমিও মহাসমুদ্রের মহালীলা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। তাই জেলার প্রান্তভূমিতে উপস্থিত হইয়া মুক্ত স্থানের বায়ু সেবন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।যদি সেই পুণ্যস্রোতে জীবনস্রোত ভাসাইয়া দিতে পারি, যদি সেই মহাপ্রভুর অনন্ত স্রোতে আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারি, তবে এ-জীবন সার্থক মনে করিব। লোকালয়ের কোলাহল আমার মস্তিস্ক বিকৃত করিয়াছে। দৃষ্কার্য্যের কুফল আমাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। অখাদ্য অপেয় আমাকে কলুষিত ও দুর্ব্বল করিয়াছে। তাই মহাসমুদ্রের মহাস্রোতে মহাব্যাধিকে ভাসাইয়া দিব স্থির করিয়াছি। শুনিয়াছি, জগতের যাবতীয় জঞ্জাল মহাসমুদ্র গ্রাস করিয়া ফেলে। সেই ভরসায় বুক বাঁধিয়া আমার কলঙ্কের ডালি সমুদ্রে নিক্ষেপ করাই প্রকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াছি। দেখি, গৃহীত, কি পরিত্যক্ত হই। যদি ভাগ্যে থাকে, সাক্ষাৎকার ঘটিবে।'[৩১]

৩.পত্র সংখ্যা ঃ ১৭। ২৮.১.১৯২০। মধ্যাহ্ন।

'আজ প্রাতে কুহেলিকা দেখা দিয়াছিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার সরাইয়া যেমনি দিবাকর তাহার কিরণজাল বিস্তার করিল আমরাও নদীবক্ষে ভাসমান হইলাম। যত সঙ্গী আসিয়াছিল, একে একে ছাড়িয়া গেল, আমি প্রথম রবির প্রচণ্ড কিরণ সম্মুখে লইয়া নিজের দাহে দগ্ধ হইতে হইতে অগ্রসর হইলাম। বিজন অরণ্য মাঝে যে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, এ মধ্যহ্নে সে স্নিগ্ধতা নাই, সে শান্তি নাই, সে আরাম নাই। সেখানকার অরণ্য কুসুমরাজি প্রাতঃকালীন হিল্লোলে হেলিয়া

---

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৫-২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

দুলিয়া স্বীয় হৃদয়নিধিকে কত কি দিয়া বরণ করিতেছিল। সেখনাকার পর্ব্বত-শিখর বাহু বিস্তার করিয়া ছায়া প্রদান করিতেছিল। সেই সুন্দর দেশে সবই কি সুন্দর সেখানে জীবগণ অলৌকিক প্রেমে মত্ত, সেখানে পূতিগন্ধ নাই, আবর্জনা নাই, তপ্ত নিশ্বাস নাই। আছে কেবল প্রাণভরা ভালবাসা, অকৃত্রিম অতিথি সেবা, পূণ্যভাবের ফোয়ারা, প্রতি গুঞ্জের সুমধুর গুঞ্জন। সেখানে আছে কেবল মিলন, কেবলই শান্তি; আর এখানে আছে কেবলই বিচ্ছেদ, কেবলই দাহ। এখানকার লোকে পরাণ ভরিয়া হাসিতে জানে না। হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ভালবাসিতে জানে না, প্রেমময়ের প্রেমক্রীড়া বুঝিবার শক্তি রাখে না।

যতই সূর্য্যের কিরণ বাড়িতেছে, ততই হৃদয়াগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। নিজের অগ্নিতে নিজে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতেছি। ভস্মীভূত হই ক্ষতি নাই, যদি পুনর্মিলন লাভ করিতে পারি। জগতের সনাতন নিয়ম তপ্ত মধ্যহ্নের পর স্নিগ্ধ সন্ধ্যা আসে, কিন্তু আমার ভাগ্যে সন্ধ্যা বুঝি আর আসে না। সঙ্গিগণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাই কি প্রকৃতিও পক্ষপাতিত্ব করিল? সুখ-দুঃখ চক্রাকারে ভ্রমণ করে, কিন্তু আমার দুঃখের কি অবসান নাই?

অন্যে আমার কলুষ-কালিমার ভয়ে কাছে না আসুক, তুমি কেন আসিবে না। দয়ার সাগর তুমি; হীন জনে দয়া না করিলে কে তোমায় দয়াময় বলিবে? আমারই জন্য, এ অপূত দেহের জন্য, তবে কি তুমি নিজের নামে কলঙ্ক আনিবে? লোকে বলে অসীম সসীম নহে, আবার সসীম অসীম নহে। তবে কি আমার এ জরা স্বকৃত দোষে সসীম হইয়াও অসীমে পরিণত হইল? আমি তোমার নরকের ভয় করি না, স্বর্গের লোভ করি না, তবে কেন আমায় অনন্তর্দাহে দগ্ধ কর?

Dhaka University Institutional Repository

আচ্ছা, করিতে থাক, অনন্তকাল সহ্য করিতে থাকিব; যদি পুনর্মিলন হইতে বঞ্চিত না কর। তোমার সকল অস্ত্র নিক্ষেপ কর, আঘাতের জন্য বক্ষ খুলিয়া রাখিয়াছি; কেবল বিচ্ছেদাশঙ্কা হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দাও। আমি চাই তোমার দান, সে দান যে আকারে আসে আসুক, অতি আদরে গ্রহণ করিব। সে'ত তোমারই দান, আমার অতি আদরের বস্তু। সে দান অগ্নি হউক, বজ্র হউক, মৃত্যু হউক, তোমারই দান বলিয়া অতি আনন্দে বরণ করিয়া লইব। কিন্তু দোহাই তোমার, তোমা হইতে বঞ্চিত করিও না।আমার ন্যায় হৃত-সর্ব্বস্ব আর কোথাও পাইবে না, আমি দীনের দীন, অধমাধম, পাপ-তাপ কলুষিত চির-দগ্ধ। এমন জীব তোমার মঙ্গলময় রাজ্যে দ্বিতীয়টি পাইবে না। তাই প্রভু, তোমার স্নেহরঞ্জিত জগৎ হইতে আমাকে স্থানভ্রষ্ট করিও না, যতদিন ধরণীর এই পৃষ্টে থাকি, তোমার সুধাময় নামটি বিস্মৃত না হই। যদি দয়াময়! দেখা দিতে ঘৃণা বোধ হয়, স্মৃতি হইতে বঞ্চিত করিও না।'[৩২]

৪. পত্র সংখ্যা ঃ ১৭৫। ১৯৩২। দিল্লী, যমুনাতীর গ্রীষ্মাবাস।

'আজ প্রাতে যমুনাতীরে আসীন, সঙ্গে মাহ্তাব পিয়ার আহবানে আকাশ পাতাল মাতোয়ারা করিয়াছে, আর বিরহী (স্মৃতিপথে) কুতুবদিয়া সমুদ্রকূলের আকুলতা লইয়া অশ্রুপ্রবাহে যমুনা-বক্ষ ভাসাইয়া দিতেছে। বাবাজান, আমি শূন্যতার ক্রোড়ে শয়ান, হাহাকার ভিন্ন আমার দ্বিতীয় সহচর নাই। যে দিকে নয়ন ফিরাই, কেবল দেখি, শূন্য আকাশ অনন্ত পরিধি লইয়া ধরণীর পদচুম্বন করিতেছে। বিরহীকে দেখিয়া বিহঙ্গকূল অব্যক্ত ভাষায় কত কিচিরমিচির করিতেছে, আমার শূন্যতাকে কত উপহাস করিতেছে, তীরস্থ কণ্টকবৃক্ষ ক্ষত

---

[৩২] প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

বক্ষের উপর শেল হানিতেছে, আর মাহ্তাবের শূন্যতার গীত হৃদয়াগ্নিতে আহুতি দান করিতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণে তুষারাগ্নি হৃদ-কোরক জ্বালাইয়া দিতেছে, বিরহী শূন্যদেহ লইয়া শূন্যতার দীর্ঘশ্বাস মিশাইতেছে। সেই বেলালের হৃদয়ভেদী আজান, সেই সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের কোলাহল, সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতে মন-উড়ানো তান সেই বড়মিঞার কোমল আলিঙ্গন, সেই বন্ধুবর্গের প্রাণমাতানো গীত, সেই গোপীগণের কৌতূহল বিরহীকে অধীর করিয়াছে। কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, কোথায় চলিয়াছি, শূন্যমন প্রবোধ মানিতেছে না, সে সান্ত্বনার বেড় ভাঙ্গিয়া কোথায় প্রবাহিত হইতেছে- কে বুঝিবে? বাবাজান, কেবলই অন্ধকার, কেবলই শূন্যতা, কেবলই বিরহ, কেবলই হা হুতাশ, যাই কোথায়? কে আমার, আমি কার? সবই শূন্য, তবে কি সবই ভ্রান্তি, সবই কুহেলিকা, সবই মরীচিকা! ছি, এমন জগতে মানব বসতি করে! কি লইয়া সে থাকে? কেবলি শূন্যতা? লোকে না বলে জগৎ পিতা দয়াময়; তবে এসব অলীকতা কেন? প্রকৃতই কি দুনিয়া মায়ময়? এ মায়ার কি অবধি নাই? নরকদাহও কি অসীম? তবে দহনও কি অনন্তের অঙ্গ? প্রেমময়ও কি দহনময়? তাঁর দহনের কি সীমা নাই? বেশ, নাই থাকুক, এই দহনকেই পূজিব, এই শূন্যতাকেই বরণ করিব; জ্বলিব, পুড়িব, কাঁদিব আপন মনে, ইহাকেই একমাত্র সহচর করিয়া শূন্য-জগতে শূন্যময়কে ডাকিব, আর উড়িব শূন্যাকাশে। লোকে জানিবে , জগৎ জানিবে, শূন্যতাই দুনিয়ার সার, শূন্যতাই মহাপ্রভুর দান, শূন্যতায় তাহার মিলন।'[৩৩]

উক্ত ৪টি পত্রের মত বহুসংখ্যক পত্রে তাঁর জীবন ভাবনার স্বরূপ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে বিশ্লেষক। তাঁর পত্রাবলীর ২টি বই তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে,তন্মধ্যে 'প্রেমিকের

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২০-৩২১।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রাবলি' গ্রন্থে পত্রের সংখ্যা ১৪২ এবং 'ভক্তের পত্রের' পত্র সংখ্যা ২৪৪ । তার ইন্তেকালের পরে প্রকাশিত হয় 'ইরশাদে মুরশীদ' ও 'অমিয়বাণী' । 'ইরশাদে মুরশীদ' এ পত্রসংখ্যা ১৪৫, এবং 'অমিয়বাণী' এর পত্র সংখ্যা ৬৭ । পরবর্তীতে ঢাকা আহছানিয়া মিশন তাঁর লিখিত ১১৫৫টি পত্রের একটি সম্ভার প্রকাশ করেন । যা ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়নি উল্লেখিত পাঁচটি গ্রন্থে তাঁর মুদ্রিত পত্রের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে সর্বমোট ১৭৫৩ টি । এই বিপুলসংখ্যক পত্রের মধ্য থেকে কিছু কিছু পত্রের বিশ্লেষণে প্রয়াসী হবে । একটি পত্র (পত্র সংখ্যা ১৭) দেখা যায়, লেখক পরম শান্তিময় স্নিগ্ধ বিজন অরণ্য ছেড়ে নেমে এসেছেন নদী বক্ষে সুখ ও শান্তির আশায় । এসেছেন অসুস্থ শরীর নিয়ে বায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে সুস্থতা অর্জনের উদ্দেশ্যে । সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত অসহায় নিরূপায় লেখককে একলা ফেলে রেখে সঙ্গী সাথীরা সকলে চলে গেল । কাল মধ্যাহ্ন । দাবদাহপূর্ণ পরিপার্শ্বে কেবলই বিচ্ছেদের বেদনা, ভালবাসাহীনতার মর্মান্তিক স্পর্শ । 'যত সঙ্গী আসিয়াছিল, একে একে ছাড়িয়া গেল;'[৩৪] লেখক হয়ে পড়লেন একেবারেই নিঃসঙ্গ । এবং 'প্রথম রবির প্রচন্ড কিরণ সম্মুখে লইয়া নিজের দাহে দগ্ধ'[৩৫] হতে থাকলেন । এমতাবস্থায় যা হবার তাই হল । সদ্য ছেড়ে আসা স্বর্গপ্রতিম সুখস্থান, শান্তিশীতল নয়নাভিরাম অরণ্যানীর যাপিত জীবনের সঙ্গে তাপদগ্ধ বর্তমান জীবনের তুলনা উঠে আসল আপন স্মৃতির মাঝে । ভয়ঙ্কর বেদনাময় সে অনুভব । সবকিছু হারানোর দগদগে বেদনাদীর্ণ যেরকম অনুভবে মানুষ ভেঙে পড়ে নৈরাশ্যের হাহাকারে সেইরকম পতনোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়ে পড়লেন লেখক । একেতো জরাকীর্ন ক্লিষ্ট মানুষ তিনি । তদুপরি বৈরী পরিবেশের নাজুক অবস্থা । হতাশার অতল তলে তলিয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব ছিল । কিন্তু খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর চরিত্রের বিশেষত্ব এইখানে যে, অন্ধকারের

---

[৩৪] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ১৭, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৮-১৯৯ ।

[৩৫] প্রাগুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে তিনি আলোর দিশা পান; তিনি মনে করেন 'যে প্রেমে দাহ নাই, সে প্রেমে গৌরব নাই।'[৩৬] 'সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে জীবনের স্থায়িত্ব, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ উপভোগ্য নহে।,[৩৭] বরং সুখের পর দুঃখ কিংবা দুঃখের পর সুখ এলে প্রকৃত পক্ষে সুখ-দুঃখ উপভোগ্য হয়ে উঠে। বিশেষ করে সুখ নামক সোনার হরিণ প্রাপ্তির অপার্থিব আনন্দ সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে উপভোগ করা যায়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) জাগতিক ও আপতিক সমস্ত দুঃখ, কষ্ট এবং জরা ব্যাধির যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করে নেয়ার পক্ষপাতি। তিনি বিশ্বাস করেন, 'পুরস্কারের জন্যই পরীক্ষা। যেখানে পরীক্ষা নাই, সেখানে পুরস্কারও নাই, সুতরাং সকল পরীক্ষাকে বরণ করা উচিত। খোদার পরিত্যক্ত সেই যাহার উপর পরীক্ষা নাই।'[৩৮] দুঃখ বরণের এই সিদ্ধান্তটি হচ্ছে চূড়ান্ত পরিণতি পর্বে বিকল্পহীন শেষ আশ্বাস ও আশ্রয়ের উপর নির্ভরতা। কিন্তু এর পূর্বে মাশুকের সঙ্গে আশেকের ঘটিত মান-অভিমান এবং পরম প্রেমাস্পদ আল্লার প্রতি আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর অম্ল-মধুর অনুযোগাত্মক-চিন্তা ভাবনা চমৎকার বাণী বিন্যাসে অভিব্যক্ত হতে দেখা যায়। জরাগ্রস্থ হয়ে বিপুল অভিমান ভরে লেখক বলেনঃ

> 'যতই সূর্য্যের কিরণ বাড়িতেছে, ততই হৃদয়াগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। নিজের অগ্নিতে নিজে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতেছে। ভস্মীভূত হই ক্ষতি নাই, যদি পুনর্মিলন লাভ করিতে পারি। জগতের সনাতন নিয়ম তপ্ত মধ্যাহ্নের পর স্নিগ্ধ সন্ধ্যা আসে, কিন্তু আমার ভাগ্যে সন্ধ্যা বুঝি আসে না।

---

[৩৬] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৭, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯।

[৩৭] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৮, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০।

[৩৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্রাবলীঃ ইরশাদে মুরশীদ, পত্র সংখ্যা ৩৪, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১১শ খন্ড, ঢা, আ,মি,প্রকাশনী, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃঃ ৪৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীগণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাই কি প্রকৃতিও পক্ষপাতিত্ব করিল? সুখ দুঃখ চক্রাকারে ভ্রমণ করে, কিন্তু আমার দুঃখের কি অবসান নাই?

অন্যে আমার কলুষ-কালিমার ভয়ে কাছে না আসুক, তুমি কেন আসিবে না? দয়ার সাগর তুমি; হীন জনে দয়া না করিলে কে তোমায় দয়াময় বলিবে? আমারই জন্য, এ অপূত দেহের জন্য, তবে কি তুমি নিজের নামে কলঙ্ক আনিবে?'[৩৯]

আহ্ছানউল্লা (রঃ) আরাধনা, উপাসনা, এবাদত বা খোদা প্রেমের বিনিময়ে বেহেশত চান না কিংবা নরককে ভয় করেন না বা নরক থেকে নিষ্কৃতির আশাও পোষণ করেন না। তিনি চান এশ্‌কে এলাহীর মাধ্যমে খোদ খোদার নিবিড় সান্নিধ্য। তিনি বলেনঃ

'আমি তোমার নরক ভয় করিনা, স্বর্গের লোভ করিনা, তবে কেন আমায় অন্তর্দাহে দগ্ধ কর?'[৪০]

'আমি চাই তোমার দান, সে দান যে আকারে আসুক, অতি আদরে গ্রহণ করিব। সে'ত তোমারই দান, আমার অতি আদরের বস্তু সে দান অগ্নি হউক, বজ্র হউক, মৃত্যু হউক, তোমারই দান বলিয়া অতি আনন্দে বরণ করিয়া লইব। কিন্তু তোমার দোহাই, তোমা হইতে বঞ্চিত করিও না। আমার ন্যায় হৃতসর্ব্বস্ব আর কোথাও পাইবে না, আমি দীনের দীন, অধমাধম, পাপ-তাপ-কলুষিত চিরদগ্ধ। এমন জীব তোমার মঙ্গলময় রাজ্যে দ্বিতীয়টি পাইবে না। তাই প্রভু, তোমার স্নেহ বঞ্চিত জগৎ হইতে আমাকে স্থান ভ্রষ্ট করিও না।

---

[৩৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৯৯।

[৪০] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

যতদিন ধরণীর এই পৃষ্টে থাকি, তোমার সুধাময় নামটি বিস্মৃত না হই। যদি দয়াময় দেখা দিতে ঘৃণা বোধ হয়, স্মৃতি হইতে বঞ্চিত করিও না।'[৪১]

উপরোক্ত পত্রের মধ্যে থেকে আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর বিশ্বাসের পবিত্রতা, তাওয়াক্কাল .....এবং সর্বোপরি স্বার্থ-প্রত্যাশাহীন অনন্য স্রষ্টা প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। হুর-পরীর লোভ ও স্বর্গকামনা আহ্ছানউল্লা (রঃ) বিবেচনায় আনেননি। তিনি বিশ্বাসী নিঃশর্ত পবিত্র ঈশ্বর প্রেমে; নিষ্কলুষ এশ্‌কে এলাহীতে। তিনি মনে করেনঃ

'এশকের মূলও দহন; ফলও দহন। দহনেই ইহার উৎপত্তি, দহনেই ইহার বৃদ্ধি ও দহনেই ইহার সমাপ্তি। ইহার দহন অতি উপভোগ্য; এই দহনই প্রবৃত্তিগুলিকে মার্জিত করে।'[৪২]

তিনি আরও বলেনঃ

'জরায় যে মাধুর্য আছে, পীড়ায় যে সৌন্দর্য আছে লোকে তাহা বিচার করে না কেন? যে অপীড়িত সে পীড়িতের মর্ম কি বুঝিবে? যদি দয়াময়কে চিনিবার আবশ্যক হয়, তবে জরা-ব্যাধি সকলকে আহবান করা চাই।'[৪৩]

অসুস্থ্য আহ্ছানউল্লা (রঃ) তাই শত কষ্টেও ভোলেন না দয়াময় প্রভুকে। কিন্তু নিজের অস্তিত্বকে ঠিকই বিসর্জন দেন প্রেমময় স্রষ্টার সার্বভৌম অস্তিত্বের নিকট। ভক্ত যদি নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেতে না পারে তাহলে সে আল্লাহর সান্নিধ্য পাবে কিভাবে? নিজের অহংকারবোধকে সদা উদ্দীপ্ত করে রেখে কিভাবে সম্ভব অপরের সন্তোষ? ১৩৯ সংখ্যক 'ভক্তের পত্রে' তারই উল্লেখ ঃ

---

[৪১] প্রাগুক্ত।

[৪২] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৫০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬।

[৪৩] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৪৫, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২১।

Dhaka University Institutional Repository

'নিজেকে না ভুলিলে অপরকে সন্তোষ করা যায় না। প্রেমময়কে পাইতে হইলে প্রেমাগ্নিতে আপনাকে আত্মাহুতি দিতে হয়।' উল্লেখিত পত্রের ১ মাস ২৫ দিন পূর্বে প্রাগুক্ত ১২৬ সংখ্যক পত্রে তিনি বলেন, 'সত্যই স্বার্থহীন ভালবাসার দ্বারা মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে।'[৪৪]

নিঃস্বার্থ প্রেমমগ্নতা শুধু যে স্রষ্টা প্রাপ্তির রাজপথ, তা নয়, মনুষ্যত্ব অর্জনেরও তা অনিবার্য উপাদান। প্রকৃত প্রেমের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতাহীন প্রেম অযথার্থ, অগভীর এবং আকর্ষণহীণ। দুর্নিবার ব্যাকুলতাই প্রণয়াস্পদকে একান্ত করে পাবার সম্ভাবনাকে উচ্চকিত করে তোলে। এ সম্পর্কিত ১৪১ পত্রের অংশ বিশেষঃ

'যেখানে প্রেম, সেখানেই ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা (ব্যাকুল) না হইলে তাঁহাকে পাইবে কেমনে? হৃদয়, মন, আত্মা সবই তো তাঁহার পায়ে লুটাইতে হইবে।'[৪৫]

বিরহ এবং মিলনের পারস্পরিক দ্বন্দ্বেও প্রেমিক-প্রেমিকা, দয়িত-দয়িতা লাভ করেন এক প্রকার সুখ অর্থাৎ মিলনেও সুখ আছে, বিরহেও সুখ আছে; যদিও তা প্রকারভেদে, ভোগে-উপভোগে এবং আস্বাদনে ভিন্ন। আসলে সুখ-দুঃখ এক প্রকার মনন সম্ভোগের নাম-আপেক্ষিক তার দ্বারা যা যথার্থ অর্থে শনাক্ত। যেমন তিনি বলেনঃ

'সুখ একটি মানসিক অবস্থা। সে ত ধন, মান জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। যে তৃপ্ত, সেই সুখী। অসুখেও মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে, তাহা কি জাননা?'[৪৬]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর স্রষ্টানুভব, প্রেমানুভব, জীবনানুভব, সংসারানুভব এবং জরা, ব্যাধি, মিলন-বিরহ, রোগ-শোকানুভব সবই তৃপ্তিদায়ক। জায়া-পুত্র-পরিজনের প্রতি

---

[৪৪] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ১২৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮৪।

[৪৫] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ১৪১, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৬।

[৪৬] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৭৪, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব পালন করেও তিনি সর্বোতোভাবে আল্লাহমুখী। আত্মনিষ্ঠ হয়েও সদাসর্বদা পরার্থে নিবেদিত প্রাণ; মানব কল্যাণী। ধর্মানুরাগী মানুষের প্রতি পরামর্শ হলঃ

> 'দুনিয়ার মধ্যে থাকিয়া দুনিয়াদারী খেয়াল ছাড়িবে। কচুর পাতার মত পানিতে থাকিয়াও জল-সিক্ত হইবে না।'[৪৭] মোট কথা, 'সংসারে থেকে সংসার ত্যাগী হতে হবে.....।'[৪৮] 'জলমগ্ন কচুপাতা থেকে শিক্ষা লও। সংসারকে রেয়াজত ক্ষেত্রে পরিণত কর যেন তোমার শরীরে মলিনত্ব স্পর্শ না করিতে পারে.....।'[৪৯]

খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)এর পত্রাবলীতে জীবন ভাবনার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য, ফুটে উঠেছে সেটা হচ্ছে, স্রষ্টা সেবার মত মানব সেবায় নিজেকে নিমগ্ন রাখা এবং অন্যকে সামান্য কষ্টও না দেয়া। এমন কি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনও যদি নিতান্ত অসহায় রোগাক্রান্ত অবস্থায় সংক্রামনের ভয়ে তাঁকে সমুদ্রকূলে ত্যাগ করে চলে যায়, তাতেও তিনি অসুখী হননা; পোষণ করেন না কোন প্রকার ক্ষোভ। বরং এরকম ঘটনার মধ্যে থেকেও তাঁর বিশ্লেষণী প্রজ্ঞা বিকীর্ণ করে আলো, দেখায় পথ এবং আপনার মনে সঞ্চার করে কোন জ্ঞানের বারতা। যেমন 'ভক্তের পত্রের' ৩৮নং পত্রটির অংশবিশেষ উল্লেখ করা যায়ঃ

> 'সংক্রামক রোগ লইয়া ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সংক্রামকের ভয়ে তথাকার বাসিন্দাগণ পুনরায় তথা হইতে ভাসাইয়া দিয়াছিল, আবার ভাসিতে ভাসিতে উপদ্বীপ মধ্যে উপস্থিত। এখানে আছে এক দিকে শৈলরাজি, অন্যদিকে নদীবক্ষ। মানুষের তাড়না এখানে পৌঁছে

---

[৪৭] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ১৭১, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৭।

[৪৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, পত্রাবলীঃ ইরশাদে মুরশীদ, পত্র সংখ্যাঃ ১৫, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১১শ খন্ড, ঢা আ ম প্রকাশনী, প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃঃ ৪৩৬।

[৪৯] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৪০, পৃঃ ৪৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

না। মানুষ বড় জ্ঞানী, তাই সে ভয় পায়; কিন্তু প্রকৃতি কোল দিয়া রুগ্ন ব্যক্তিকে গ্রহণ করে।ইহার অঙ্ক অতি স্নিগ্ধ, অতি শীতল, এদেশে কেবলই পূর্ণিমা, কেবলই আলো, কেবলই প্রীতি, কেবলই সৌন্দর্য। কিন্তু পিতা-মাতা কেহই আতুরকে কোল দিতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু প্রকৃতির স্নেহশীল ক্রোড়ে আতুর ছায়া ভোগ করে, অপার্থিব স্নেহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রকৃতির এই শান্তি আস্বাদনের নিমিত্ত প্রাচীন আওলিয়াগণ এই শৈলপ্রান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এ স্থানকে পুত করিয়াছেন। তাঁহাদের মাহাত্ম্য এখনও এখানে অনুভূত হয়।'[৫০]

এখানে লক্ষনীয় মানুষ সম্পর্কে অনুযোগহীন নিরুত্তাপ মন্তব্য। যে মানুষ তাঁকে স্বজন হয়েও স্বাস্থ্যগত ও স্বার্থগত কারণে সমুদ্রতীরে একা একা ফেলে রেখে যায় এবং রোগ সংক্রামণের ভয়ে সেখানকার বাসিন্দাগণও যখন তাকে ভাসিয়ে দেয় নিরুদ্দিষ্ট অথৈ সমুদ্রজলে; সেই মানব সম্প্রদায় সম্পর্কে কি পরিমাণ তিনি নিরাবেগ, শান্ত থাকেন-ভাবতে আশ্চর্য লাগে! এরকম পরিস্থিতিতে যেখানে সকলেরই হয়ে পড়ার কথা অভিমানহত, ক্ষুব্ধ, বেদনাদীর্ণ, ক্ষোভে আকীর্ণ এবং মানুষের হৃদয়হীনতায় সমালোচনা মুখর; সেখানে তিনি প্রমিত, মিত ও স্নিগ্ধ শান্তকণ্ঠে কেবল মাত্র উচ্চারণ করেন, 'মানুষ বড় জ্ঞানী, তাই সে ভয় পায়।'[৫১] এমন কি এই ভয় পাওয়ার দলে জনক-জননীও সম্পৃক্ত। কিন্তু তবুও সংযত বাক, আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় না। উপরন্তু তীব্র আত্মসমালোচনায় মনে করেন নিজের পাপেই নিজে কষ্ট পাচ্ছেন এবং অন্যকে কষ্ট দিচ্ছেন নিজের পাপের কারনে। তাঁর ভাষায়,

---

[৫০] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, গোলাম মঈনউদ্দিন (সম্পাদিত), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৩৮, পৃঃ ২১৫।

[৫১] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৩৮, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

'কি কুক্ষণে জন্মিয়াছিলাম, শিশু, যুবক, বৃদ্ধি সকলেই আমার সংক্রমণে জর্জরিত।'[৫২] এভাবে নিজেকে তিনি যে শুধু আপন নিষ্ফল কর্মভোগের দায়ে দায়ী করেন, তা নয়; সমস্ত রুগ্ন; জরাগ্রস্ত মানুষের সন্তাপ নিজ দেহে ধারণ করে তাদের নিস্কৃতি দেবার কামনাও ব্যক্ত করেন অকুতোভয় স্থিতপ্রাজ্ঞতার সঙ্গে। তিনি বলেনঃ

> 'যে নিষ্কর্মা সর্বজন বর্জ্জিত, সকলের পূঞ্জীভূত জরা তাহাকে গ্রাস করিয়া কর্ম্মী পুরুষগণকে কেন অব্যাহতি দেয় না? নিষ্পাপ চিত্ত কেন এত তীব্র তাপে নিষ্পেষিত হয়? যে বয়োবৃদ্ধ পৃথিবীর প্রান্তদেশে অবস্থিত, সে কেন সকলের দুঃখ বহন করে না? খোদওয়ান্দ, একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, যে সন্তপ্ত, তাহাকেই জ্বালাইতে থাক, যে দগ্ধ তাহাকেই পোড়াও যে নিষ্পাপ তাহাকে অব্যাহতি দাও। যে কর্ম্মী তাহাকে কর্ম্ম করিতে দাও, যে পাপী তাহার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কর।'[৫৩]

উদ্ধৃত উক্তির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, টীকা-টিপ্পনী প্রয়োজন নেই। একথা বলারও অপেক্ষা রাখেনা যে, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কি রকম দরবেশ সুলভ, পরহিতৈষী, মানবপ্রেমী ছিলেন। ছিলেন কি রকম কর্ম বিশ্বাসী মানুষ। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কর্মহীন নিভৃত, নৈস্তব্ধ প্রার্থনার প্রহর প্রলম্বিত করে তোলার মধ্যে মুক্তি নেই, এ বিশ্বাসে তিনি ছিলেন স্থির। কর্মহীন ধর্মাচরণ তাঁর নিকট ছিল সাক্ষাৎ অধর্মের নামান্তর। এ বিষয়ে ৫.১২.১৯২১ সালের এক পত্রে তিনি লেখেনঃ

> 'ইসলাম কর্ম্মমূলক ধর্ম্ম, কর্ম্ম শূন্য বাক-বিতণ্ডার নাম ইসলাম নহে। কাজই ইহার মূলমন্ত্র।'[৫৪]

---

[৫২] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৬৪, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮।

[৫৩] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৬৪, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৮।

[৫৪] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৭৮, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

২২.২.৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে আরেক পত্রে জনৈক ভক্তকে তিনি লেখেনঃ

> 'তোমরা কয়েকটি যুবক মিলে একটি সমিতি করো এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে থাকো, দেখবে একতার ফলে প্রাণ জেগে উঠবে। সত্যের ঝঙ্কার চারিদিকে বেজে উঠবে, আনন্দের ফোয়ারা ছুটবে।'[৫৫]

এরকম পরামর্শ যে তাঁর মুখের কথা মাত্র ছিলনা তার প্রমাণ মেলে স্বগ্রাম নলতায় প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশনের ব্যাপক প্রসারতা ও কার্যক্রমের বাস্তব প্রতিফলন দেখে। সেদিনের শিশু আহ্ছানিয়া মিশন আজ স্বদেশ ছেড়ে আন্তর্জাতিক বলয়ে সগর্বে পরিব্যাপ্ত। তাঁর মানব কল্যাণের স্বপ্ন বলতে গেলে ষোল কলায় পূর্ণ। যেমন পূর্ণতা পায় তাঁর মানব জীবন লাভের উদ্দেশ্য। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষ হিসেবে প্রায় সকল দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। ভালবেসেছেন মানুষকে। ভালবেসেছেন স্রষ্টার তাবৎ সৃষ্টিকে। এবং সৃষ্টি জীবকে, জড় অজড় সকল সৃষ্ট দ্রব্যের সেবা করে প্রকারান্তরে তিনি সেবা করেছেন পরম করুণাময়ের।

মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করে অবগত হওয়া যায়, তাঁরা প্রকৃতির প্রসারিত পাঠশালা থেকে মুঠি মুঠি জ্ঞান আহরণ করেন। প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার চেয়ে প্রকৃতি চয়িত জ্ঞান অধিকতর কার্যকর, বাস্তবতা স্পর্শী ও অকৃত্রিম। যাঁরা বিমল প্রকৃতির থেকে জ্ঞান আহরণে সক্ষম তাঁদের আনুষ্ঠানিক বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। যেমন মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মদ (স:)। তিনি ছিলেন একেবারেই অক্ষর জ্ঞানহীন মানুষ। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান তাঁকে সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষে পরিণত করেছিল। মহামতি সম্রাট আকবরও ছিলেন অক্ষর জ্ঞানহীন। কিন্তু তাঁর মত প্রজ্ঞাশীল,ধীমান, জ্ঞানী মানুষ সে কালের ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে তেমন একটা চোখে পড়ে না। কাজী নজরুল ইসলাম ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছিলনা কোন প্রাতিষ্ঠানিক সনদ তারা ছিলেন স্বশিক্ষিত আলোকিত মানুষ। সৌভাগ্যক্রমে খানবাহাদুর

---

[৫৫] প্রাগুক্ত, "প্রেমিকের পত্রাবলী', প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৮৩, পৃঃ ৪৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইলমে লাদুনী (স্রষ্টা প্রদত্ত জ্ঞান)।

জীব জগৎ ও প্রকৃতি থেকে তিনি জ্ঞান আহরণ করেছেন;

যেমনঃ

১।'আমাদের বিড়ালটি দেখিয়া থাকিবে।তাহার নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি, দিন-রাত্র সে স্বীয় বদন পরিষ্কৃত করে এবং রাত্রিকালে প্রভুর নিকট উপবিষ্ট হইয়া প্রভুকে নজরবন্দী রাখে। প্রভু যেদিকে ফিরিয়া শয়ন করে সেও সেইদিকে ফিরে ও অনিমেষ লোচনে প্রভূর দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া রাখে।'[৫৬]

২।'এখানকার সাঁওতালদিগের নিকট অনেক শিক্ষার জিনিস আছে। তাহারা স্পষ্টবাদী, মিতাচারী, বিলাসিতা বা প্রতারণা জানে না, দ্বেষ বা প্রতিহিংসা হৃদয়ে পোষণ করে না। সকলেই সবল ও ধর্ম্মে ভাব রাখে। ঘরবাড়ি বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে জানে, সর্ব্বদা প্রকৃতিকে সেবা করিয়া যথেচ্ছ আহর্য্য সংগ্রহ করে, ধার কর্জ্জ জানে না, তাহারা সর্ব্বদাই হৃষ্ট চিত্ত।'[৫৭]

৩।'পাহাড়ী লোকগুলো বেশ সাদাসিদে। কুটিলতার ধার রাখে না। মনখুলিয়া হাসে ও বিদেশীয়কে শ্রদ্ধা করে। বায়ু যেমন নির্ম্মল, তাদের অন্তকরণও সেইরূপ নির্ম্মল। প্রাতে ফুল গাছগুলি বেশ খোশবু বিস্তার করে, রাস্তাগুলি অতি পরিষ্কৃত, সকালে

---

[৫৬] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, 'ভক্তের পত্র', পত্র সংখ্যাঃ ১৭৭, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২২।

[৫৭] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যাঃ ১৭৭, পৃঃ ৩২২।

Dhaka University Institutional Repository

বিকালে মনটি বেশ প্রফুল্ল থাকে। আর রাত্রিটী অতি চমৎকার, চাঁদের আলো, ফুলের খোশবু, প্রকৃতির নিস্তবদ্ধতা বড়ই উপভোগ্য।'[৫৮]

আপন অস্তিত্বের খোঁজ খবর নিতে গেলে বেরিয়ে আসে স্রষ্টার মহিমা। বিখ্যাত উক্তি, 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু।'(যে নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকে চিনেছে।) খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর মত জাগ্রত, চৈতন্য পুরুষ যে আপন পুরুষোত্তম সত্যের ঠিকানা জানাবার চেষ্টা করেছেন। এক পত্রে তিনি উল্লেখ করেন। 'বাবা গণি, ছেলেদের পরীক্ষা নিচ্ছ ভালো কথা, নিজের পরীক্ষার জন্যও বাবা প্রস্তুত হও।'[৫৯] অনুরূপভাবে ২৭.১২.১৯৪৮-এ করাইপারসরাই থেকে 'পরম স্নেহভাজন আমীন ছাহেব'কে লেখেনঃ

'লোকের কত জমি Servey করলে, নিজের জমিটা একবার বাবা Servey করে দেখো তো, কেবল পরের জমি হিসাব করেই যাবে? নিজের হিসাব কবে করবে?'[৬০]

অন্যত্র 'লোকের দেহের এত খবর রাখেন, আর নিজের খবর রাখেন না কেন?'[৬১] এ উক্তিটি করেছেন জনৈক ভক্ত ডাক্তারের উদ্দেশ্যে। চিকিৎসক হিসেবে একজন ডাক্তারকে মানবদেহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হয়; জ্ঞান রাখতে হয় এনাটমি-ফিজিওলজি বিষয়ে পরিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন। অথচ তিনি হয়ত আত্মানুসন্ধানের গরজ অনুভব করেন না; অনুভব করেন না আপন জন্ম রহস্যের অন্তরালে বিদ্যমান অনন্ত শক্তিধর মহামহিম প্রচ্ছন্ন শিল্পী সত্তাকে; কিন্তু করা যে উচিত, সে কথাই প্রাঞ্জল ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা

---

[৫৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, "প্রেমিকের পত্রাবলী', পত্র সংখ্যা ১২, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৫।

[৫৯] প্রাগুক্ত, 'ভক্তের পত্র', পত্র সংখ্যাঃ ২২৯, পৃঃ ৩৭২।

[৬০] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ২৪৪, পৃঃ ৩৯১।

[৬১] প্রাগুক্ত, "প্রেমিকের পত্রাবলী', পত্র সংখ্যা ৮, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

(রঃ)। তাঁর অধ্যাত্মবাদী চিন্তা শুধুমাত্র আত্মমুক্তির জন্য নয়, পরার্থেও তা সমভাবে নিবেদিত। আশেকে খোদা তিনি, আশেকে রসূলও। তিনি আলোক সন্ধান করেন যেমন নিজের জন্য, তেমনি অন্যের জন্যও। খোদার এবাদত আর মানুষের খেদমত করাকে তিনি একই রকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করেন। তাঁর মতে' 'মানব প্রেম সকল ধর্ম্মের প্রধান স্তম্ভ।'[৬২] মানব সেবা স্রষ্টা সেবার নামান্তর। এক পত্রে তিনি উল্লেখ করেনঃ

> 'বাবা আমার, তুমি জানো আমি দুনিয়াতে এসেছি খেদমত করতে, খেদমত নিতে নয়। আমি বাবা তোমাদেরই খাদেম, আমাকে আদেশ করবে, কি রূপে আমি তাহা পুরণ করতে পারি।'[৬৩]

নিজেকে সৃষ্টির সেবক মনে করা, মনে করা মানব সেবার মধ্যে স্বীয় জন্মের সার্থকতা, এটি কোন ছোটগুন নয়। বরং মহৎপ্রাণ উদার হৃদয় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এটি। এ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি সভ্যতার আশীর্বাদ, মানুষের বন্ধু, সমাজ-ধর্মের হিতৈষী এবং সর্বপ্রকার কল্যাণের প্রতীক। অন্যের তুলনায় নিজেকে হীন মনে করা দীনতার নিদর্শন নয়; বিনয়ের দৃষ্টান্ত। অহংকারী মানুষ যেখানে পদে পদে সমগ্র পৃথিবীকে অবজ্ঞায় অশুচি করে তোলে, সেখানে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর মত ব্যক্তিগণ ক্রমাগত নিজেরেকে গড়ে তোলেন শ্রেয়োবোধ সম্পন্ন আশরাফুল মখলুকাত রূপে। এঁরা জাত পাতের ধার ধারেন না,সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিরও শিকার হন না এবং জড়িয়ে পড়েন না ধর্মীয় কোন্দলে। তাঁরা বরং মনে করেনঃ

> 'যে জাতি বিচার, বর্ণ বিচার, স্থান বিচার করে সে তো অভিমানী। যেখানে অভিমান আছে সেখানে সেবা অর্থহীন। স্রষ্টার রাজ্যে সকল সৃষ্টের সম অধিকার; তবে মানুষ কি নিয়ে বড়াই করে জানিনা।..... একজন মেহেথর যে

---

[৬২] প্রাগুক্ত, 'ভক্তের পত্র', পত্র সংখ্যাঃ ২১০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৬।

[৬৩] প্রাগুক্ত, "প্রেমিকের পত্রাবলী', পত্র সংখ্যা ২৭, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১২।

Dhaka University Institutional Repository

আমা অপেক্ষা ভাল হতে পারে তা ভুলে যাই। আত্মিক উন্নতি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর নির্ভর করে। অভিমান, ঈর্ষা, পরনিন্দা, আত্মশ্লাঘা হৃদয়কে অপূত করে, অপূত হৃদয়ে প্রেমময়, আসন পাতিতে ঘৃনা বোধ করেন। আমি..... সাম্প্রদায়িক ভাব নিয়ে কাজ করি না। সারাবিশ্ব আমার, ইকবালের ভাষায় 'চীন হামারা','হিন্দুস্থান হামারা', খোদাই আমার, সুতরাং সারা সৃষ্টিই তো আমার।'[৬৪]

এ কারণেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ১৩৪ সংখ্যক পত্রে বলেনঃ

'আমাকে দোয়া করবেন, যেন প্রত্যেক সৃষ্টের আশীর্বাদভাজন হইতে পারি, প্রত্যেক সৃষ্টের সেবক হতে পারি; যেন ভগবানের নিকৃষ্টতমকেও বুক পেতে দিতে পারি।'[৬৫]

যিনি দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবক হতে চান; বুক পেতে দিতে চান নিকৃষ্টতম ব্যক্তির কল্যাণ কামনায়, তাঁর পক্ষে তো দলীয়, গোত্রীয় বা শ্রেণী বিশেষের কোন নির্দিষ্ট দর্শনে আস্থাবান হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় দলাদলিতে নিমগ্ন হওয়া। সমাজ মনস্ক, রাষ্ট্র মনস্ক এবং সর্বোতোভাবে মানব মনস্ক হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ বিবেচনায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বরাবর রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ

'রাজনীতি হইতে আমি চিরদিন পৃথক আছি। রাজনীতি অর্থ দলাদলি। আমি শান্তির পক্ষপাতি, দল বিশেষকে সমর্থন করা আমার বিবেক বিরুদ্ধ।'[৬৬]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর জীবন চেতনা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের যে পরিচয় তাঁর রচিত পত্রে বিভাসিত, তা যেমন প্রীতিকর, কল্যাণকর তেমনি শুভ্র মনুষ্যত্ব বোধসম্পন্ন ঔচিত্য বোধের স্মারকও। বিচার ও মূল্যবোধের দিক থেকে তা সর্বজন অনুসৃত। লোভ-

---

[৬৪] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ১৩২, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮০।

[৬৫] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ১৩৪, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩।

[৬৬] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ১৩০, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

লালসাহীন এমন জীবনাচরণ ও জীবন দর্শন বিরল দৃষ্টান্ত। ধনী-গরিব, ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে প্রায় সকল মানুষই যেখানে অর্থ, বিত্ত, সম্পদের প্রতি লালায়িত। দুর্দমনীয় আসক্ত সেখানেও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) চরম নিরাসক্ত, নির্লোভ। সচরাচর দেখা যায় যাজকশ্রেণী তথা মোল্লা-পুরোহিত, পাদ্রি, দুনিয়া লোভী পীর সম্প্রদায় পরাশ্রয়ী মনোবৃত্তি ও পরভূক ও পরাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন। এমন কি তাঁদের অনেকেই ধর্মের নামে ইহলৌকিক ব্যবসাদারিতে মত্ত থাকেন এবং ছলে, বলে, কলে, কৌশলে ভক্তবৃন্দকে শোষণ করে আত্মগত দুনিয়াবী তরক্কি সাধনে তৎপর হন। অন্ধ ভক্ত, বিপদগ্রস্ত মানুষ, ধর্মজ্ঞানহীন সরল বিশ্বাসী অনুরাগী এবং ভক্তবৃন্দ ইনছানে কামেল মনে করে ভক্তি অর্ঘ্য স্বরূপ তাঁদের চরণে নিবেদন করেন টাকা, পয়সা, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগী, ডিম এবং নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী; এগুলোই তাঁদের বিনিয়োগহীন ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক আয়ের উৎস এবং জাগতিক ভোগ-বিলাসে ব্যবহৃত। এ শ্রেণীর লোকেরা অধিকাংশ সময় দরগা, খানকাহ্, মাজার, মসজিদ, মাদ্রাসায় গুরু, খাদেম, সেবায়েতের ভূমিকায় নিয়োজিত এবং শ্রমবিমুখ, উৎপাদন বিমুখ কাজকর্মে লিপ্ত থাকেন। অন্যদিকে পৃথিবীর অধিকাংশ অকল্যাণের মূলে অর্থলোলুপতা, অপহরণ প্রবণতা, ঘুষ, উৎকোচ গ্রহণ, প্রাধান্য স্পৃহা, তোষামদসিক্ত সম্মান কামনা প্রভৃতি কার্যকর। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) তথাকথিত যাজক, মোল্লা-পুরোহিত ব্যক্তিবর্গের উল্লিখিত অনৈতিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি নিজ উপার্জন অর্থ দ্বারা সাংসারিক প্রয়োজন নির্বাহ করতেন। হালাল রুজি খেতেন। অন্যো সেবা করতেন কিন্তু নিজে কারো সেবা গ্রহণ করতেন না এবং ভক্ত অনুরক্ত, শিষ্যদের নিকট থেকে অর্থকড়ি উপঢৌকন, গ্রহণে বিরত থাকতেন। একবার তাঁকে জনৈক ভক্ত শিষ্যা পাঁচটি টাকা শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ প্রেরণ করলে তিনি তার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় খোলসা করে লেখেনঃ

Dhaka University Institutional Repository

'মা, আমি তো কারও অর্থ গ্রহণ করিনা; কিন্তু তোমাকে কি বলে প্রত্যাখ্যান করবো মা, তোমার বুকটা যে ফেটে যাবে, তাই বাধ্য হয়ে তোমার প্রেরিত ৫ টাকা গ্রহণ করলাম, এই শর্ত্তে যে উক্ত মূল্যের পুস্তক তোমাকে নিতে হবে।'[৬৭]

মহানুভবতা, পবিত্র মন, পরিচ্ছন্ন চিন্তা, বিশ্বাসের স্বচ্ছতা, নির্লোভ মানসিকতা, নিঃস্বার্থ মানব কল্যাণী ভাব এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর পত্রাবলী নিছক আত্মান্বেষী বা আত্মপ্রীতির স্মারক নয়; স্মারক তা মানবতাবাদের এবং সমাজ ও দেশের জন্য কল্যাণকর চিন্তারও। অর্থাৎ পত্রাবলীতে তিনি শুধু অধ্যাত্মলোকের তুঙ্গে অবস্থান করে আত্মানুসন্ধান ও আত্মমুক্তির পথ খোঁজেন নি; একই সঙ্গে মানবকল্যাণের পথও অনুসন্ধান করেছেন। করেছেন সমাজের অবহেলিত, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, শিক্ষাবঞ্চিত মানুষের উন্নতির চিন্তা; একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরম প্রযত্নে। তিনি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা এবং মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের কথা ভেবেছেন, সাধ্যমত কর্মসূচীও গ্রহণ করেছেন; এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর স্বীয় গ্রাম নলতায় আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করে ভক্তমণ্ডলী এবং দেশের সম্পদশালী পরোপকারী ব্যক্তির নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে বেড়ান জরাজীর্ন দেহ মন নিয়ে এবং দেশময় ছড়িয়ে দেন মিশনের মানব কল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী; যার প্রভূত দৃষ্টান্ত মেলে তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এক জন শিক্ষাবিদ হিসাবে মনে করেন মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে এক বিরাট সম্ভাবনায়ম শক্তি। এবং সে শক্তি জাগ্রত করা সম্ভব একমাত্র শিক্ষার দ্বারা। এ বিষয়ে চট্টগ্রাম থেকে ২৭.১২.৫২ তারিখে তিনি তাঁর জনৈক স্নেহভাজনকে ('ইরশাদে মুরশীদ' শীর্ষক সম্প্রতি সংকলিত গ্রন্থের ৫ সংখ্যক) পত্রে লেখেনঃ

'মিশনকে জাগাতে হ'বে, ঘৃণা-দ্বেষ পরিহার করতে হবে। এন্ছানের গুপ্ত শক্তি জাগাতে হবে, শিক্ষার দ্বারা, দৃষ্টান্ত দ্বারা, পুস্তক দ্বারা।'[৬৮]

---

[৬৭] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ১১৩, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৭।

[৬৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, ইরশাদে মুরশীদ, পত্রসংখ্যাঃ ৫, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১১শ খন্ড, ১ম সংস্করণ, আ.মি.পা. ট্রাস্ট, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃঃ ৪৩০।

Dhaka University Institutional Repository

উক্তিটি মাপে ছোট হলেও তাৎপর্যে গভীরতর ব্যঞ্জনাময়। বলা হয়ে থাকে শিক্ষাই জাতিই মেরুদন্ড। শিক্ষাহীন জাতি মেরুদণ্ডহীন নূব্জপৃষ্ঠ অশক্ত-দুর্বল-অসহায়; মাথা সোজা করে দাঁড়ানোর ক্ষমতাহীন এক লজ্জাকর মানব গোষ্ঠীর নাম-সভ্যতার কলঙ্ক-নামকা ওয়াস্তে আশরাফুল মাখলুকাত। শিক্ষাবিদ আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর মানব হিতৈষণার অন্যতম পদক্ষেপ তাই শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়া। এ বিষয়ে তাঁর ঐকান্তিক চিন্তা ও উৎকণ্ঠা পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে পরিব্যক্ত। তিনি কল্পনা বিলাসী বুদ্ধিজীবী বা সৌখিন সমাজসেবী নন। প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতা দ্বারা কর্মপরিচয় প্রকাশে তিনি আস্থাবান। এ জন্যেই এনছানের গুপ্ত শক্তি জাগ্রত করার নিয়ামক শক্তি হিসেবে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপনের কথা বলেন। বলেন অসহায় মুক জাতির হাতে গ্রন্থ তুলে দেবার কথা; স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা এবং প্রতিষ্ঠিত কোন স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে উঠে না যায়, সে বিষয়ে সদাসর্তক থাকবার কথা। এ সম্পর্কে একটি নজীর দেয়া যায়। এক পত্রে জনৈক শিক্ষককে তিনি লেখেনঃ

> 'আপনি বুদ্ধিমান, লোক হাতে রাখার চেষ্টা করবেন মিত্রতার দ্বারা শত্রুতার দ্বারা নহে। যাতে স্কুলটা বজায় থাকে ও শিক্ষা পথ প্রশস্ত থাকে তার চেষ্টা করবেন সদোপায় দ্বারা মিলে-মিশে, সৎপথে থেকে ম্লান মুক্ত হবার চেষ্টা করবেন।'[৬৯]

জনৈক আব্দুল হক ও জনৈক শামছুল হককে আর একটি পত্রে তিনি লেখেনঃ

> 'S.D.I ছাহেবকে সত্বর একটি Night School খুলিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিবেন।'[৭০]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) শিক্ষানুরাগ ও শিক্ষা চিন্তার নানা বিষয়, এদেশে শিক্ষা প্রসারের ভাবনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং শিক্ষা সংস্কার সাধনে তাঁর অবদান অন্য অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে।

---

[৬৯] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ২৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪১।

[৭০] প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ৫৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

আহছানিয়া মিশন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর এক অমর কীর্তি আহছানিয়া মিশন। 'সৃষ্টির সেবা স্রষ্টার ইবাদত' এই ব্রত নিয়ে ১৯৩৫ সালে ১৫ মার্চ তিনি তাঁর নিজ গ্রাম নলতায় এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এর অনেকগুলি শাখা মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে নলতা মিশনকে কেন্দ্রীয় আহছানিয়া মিশন হিসাবে অবিহিত করা হয়। দেশে-বিদেশে মিশনের বর্তমানে মোট ১৩০টি শাখা মিশন রয়েছে। ঢাকায় স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' সর্ববৃহৎ কলেবরে আন্তর্জাতিক বলয়ে একটি বিরাট মহীরূপে প্রতিষ্ঠিত। নিম্নে নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠা, এর উদ্দ্যেশ্য, মূলনীতি, প্রতিষ্ঠাকালীন বিভিন্ন তথ্যাদি ও অন্যান্য কয়েকটি মিশন এবং তাঁর কতৃক প্রতিষ্ঠিত দু'একটি সমিতির বর্ণনা প্রদান করা হল:

মিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব

মিশনের প্রতিষ্ঠা লগ্নে খানবাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত মিশন প্রস্তাবটি নিম্নে উপস্থাপিত হল:

'সভামন্ডলীর সমক্ষে আমি অতীব আগ্রহের সহিত আমার শেষ জীবনের কয়েকটি আব্দার পেশ করিতে মনস্থ করিতেছি। আমি জানিনা, আর দীর্ঘকাল আপনাদের খেদমত করিবার সৌভাগ্য আমার হইবে কিনা। রোজ রোজ আমার শরীর ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, তাই আশা করি আমার প্রস্তাবগুলির প্রতি আপনারা মনোনিবেশ করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম প্রস্তাব: শরীয়ত ও মারেফতের সামঞ্জস্য রক্ষণ, সৃষ্টের সেবা ও স্রষ্টার প্রীতি সাধন ও তদুপলক্ষ্যে বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন হইবে মিশনের মূখ্য উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব: আমার মৃত্যুর পর এই অনুরোধ যে, আঁ-হজরত (সাঃ) এর শুভ পয়দায়েশ উপলক্ষ্যে যেন প্রতি বৎসর ১২ রবিউল আউয়াল মাসে নলতার মছজিদ প্রাঙ্গনে মহফেল অনুষ্ঠিত হয় ও উহার ছওয়াব আঁ-হজরত এর রূহ মোবারকে বকশিয়ে দেওয়া হয়। মোস্লেম মাত্রই তাহার উপর অকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করেন এবং তাহার মোকতাদান সকলেই সমবেত হইয়া তাহার উদ্দেশ্যে মিলাদ অনুষ্ঠান করেন এবং নিজেরাও ফায়েজ হাসিল করেন। ফাতেহা দোয়াজ দাহাম উৎসব নির্দিষ্ট কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকিবে। যে সকল ব্যক্তি আঁ-হজরতের স্মৃতির সম্মান করিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহাদেরই দ্বারা।

তৃতীয় প্রস্তাব: আমার মৃত্যুর পর বার্ষিক ওরছ সম্পাদন মিশনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে এবং উহা নলতা গ্রামে এবং অন্যত্র সম্পাদন করিতে পারিবে। ইহা আমার আন্তরিক অনুরোধ যে, ওরছ সম্মেলনের উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন হইবে না। মৃতের রূহের মাগফেরাত হেতু খতম শরীফ, কলেমা শরীফ ও মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে গরীব মিসকিনকে আহার ও বস্ত্রাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিতে হইবে। বাংলা সন ও দিনের হিসাবে ওরছ সংগঠিত হইবে এবং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে। উহা হইবে একটি ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান নহে। সেখানে কেবল রূহানী মাগফেরাতের ব্যবস্থা থাকিবে কোনো প্রকার দুনিয়াবী গরজ থাকিবে না।

চতুর্থ প্রস্তাব: আমি নলতার যে মছজিদটি নির্মাণ করিয়াছি তাহার পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র কমিটি থাকিবে এবং ওয়াকফ সম্পত্তির শর্ত অনুসারে পরিচালিত হইবে। প্রকাশ থাকে যে,

Dhaka University Institutional Repository

নলতা মছজিদের ভবিষ্যত রক্ষনাবেক্ষনের জন্য মিশন ৩.৩১ শতক জমি ওয়াকফ করিয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত আমি স্বয়ং ৪.৪৮ শতক জমি ঐ উদ্দ্যেশ্যে ওয়াকফ করিয়াছি এবং তজ্জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৫০০০ টাকা।

পঞ্চম প্রস্তাব: প্রচার কার্যের সৌকার্য্যার্থে সাতক্ষীরা মহকুমা ও নলতা গ্রামে দুইটি মিশন লাইব্রেরী (ধর্মীয় পুস্তাকাগার) থাকিবে এবং উহাদের সংলগ্ন জায়গীরদিগের সাময়িক অবস্থানের বন্দোবস্ত থাকিবে ও গরীবদের জন্য দাতব্য চিকিৎসার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিবে।

মন্তব্য: নলতা আহছানিয়া মিশনের একটি শাখা কমিটি থাকিবে। উহা ফাতেহা দোয়াজ দাহাম শরীফের ভার লইবে। যাহা আহছানিয়া প্রতিষ্ঠান নামে অভিহিত হইবে। নলতার আহছানিয়া মিশনের শাখা নানাস্থানে থাকিবে এবং স্ব স্ব কমিটির দ্বারা পরিচালিত হইবে। কেন্দ্রীয় মিশন ও শাখা মিশনের উদ্দেশ্য হইবে কিরূপে ছেলছেলার লোক তরীকতের পথে অগ্রসর হইবে। সংসারী হইয়া সংসার নির্লিপ্ত থাকিবে ও খোদার রাহে নিজকে উৎসর্গ করিবে সৃষ্টের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে ও মহব্বতকে জীবনের একমাত্র ব্রত করিবে।

প্রস্তাবক: আলহাজ্ব খান বাহাদুর আহছানুল্লা
নলতা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা।[১]

মিশন প্রতিষ্ঠা

পুর্বে উল্লেখিত হয়েছে ১৯৩৫ সনের ১৫ মার্চ জনাব আলহাজ্ব খানবাহাদুর আহ্ছানুল্লা (রঃ) কর্তৃক নলতা গ্রামে মিশনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নলতা গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে

---

[১] গোলাম মঈন উদ্দীন সম্পাদিত, আহছানউল্লা রচনাবলী, আ.মি.পা. ট্রাস্ট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০০,১১শ খন্ড, পৃ-৫৮০।

Dhaka University Institutional Repository

একটি কমিটি গঠিত হয়। মেম্বারদের মাসিক চাঁদা দ্বারা উক্ত মিশন পরিচালিত হতে থাকে। উক্ত মিশনের ১ম প্রেসিডেন্ট হন জনাব আলহাজ্ব খানবাহাদুর আহ্ছানুল্লা (রঃ), ভাইস প্রেসিডেন্ট হন জনাব আলহাজ্ব খানবাহাদুর মোবারক আলী এবং সেক্রেটারী হন জনাব এম. জওহর আলী ও সহকারী সেক্রেটারীদ্বয় ছিলেন জনাব মোহাম্মদ কুচলউদ্দীন খাঁ ও জনাব মোহাম্মদ সুলতান আলী ।

মিশনের আদর্শ

মিশনের আদর্শ সম্পর্কে যে উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী গৃহিত হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

'আদর্শ: মিশনের কর্ত্তব্য হইবে পবিত্র 'ফাতেহা দোয়াজ দাহাম' উপলক্ষ্যে বার্ষিক সম্মেলন, নলতার মছজিদ সম্পর্কিয় ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচালনা, সাময়িক ও বার্ষিক মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান, ইছলাম সংক্রান্ত পুস্তকাবলীর বিস্তারকল্পে প্রচেষ্টা এবং সভা সমিতির দ্বারা মিশনের উদ্দেশ্য প্রচার। নিম্নে কার্য্যাবলীর আভাস প্রদত্ত হইলঃ

'(ক) শরীয়তের বিধানগুলিকে অনিবার্য্যভাবে প্রতিপালন।

(খ) শরীয়তের সহিত তরীকতের সামঞ্জস্য রক্ষণ।

(গ) সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন।

(ঘ) বিপন্নের প্রতি সাহায্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন। গুরুজনের সেবা, সৃষ্টের প্রতি মহব্বত।

(ঙ) মহব্বত বিস্তারই তরীকতের প্রধান লক্ষ্য; সে তবলীগ দ্বারা হউক, সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা হউক বা আর্থিক ও কায়িক সাহায্য দ্বারা হউক।

(চ) মানুষে মানুষে পার্থক্যের নিরাকরণ।

(ছ) মোকতাদান মধ্যে সহযোগিতা, সহানুভূতি, সাহায্য ও মহব্বত স্থাপন।

(জ) রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার কল্পে সমবেত চেষ্টা, আর্থিক ও কায়িক উপায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঝ) এতিমের প্রতি হাম্‌দরদী ও তাহাদের হকুক রক্ষণ ।

(ঞ) সত্য কথন, সত্যপ্রচার, সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ ।

(ট) সর্ব্ববিধ নেশা বর্জ্জন ও অসৎ সঙ্গ পরিহার ।

(ঠ) প্রত্যেক সজীব প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহার ।

(ড) খোদার প্রতি আত্মসমর্পণ, সংসারের প্রত্যেক বস্তু হইতে তাঁহার উপর অধিকতর মহব্বত স্থাপন ও তদনুসারে নিজকে নিয়ন্ত্রন ।

(ঢ) আত্মাভিমান বর্জ্জন, সম্পদে ও বিপদে পূর্ণ নির্ভরশীলতা ।

(ণ) নিঃস্বার্থে পরোপকার করণ, কথা ও কার্য দ্বারা ।

(ত) স্বার্থের জন্য কাহারও নিকট হস্ত প্রসারণ হইতে বিরত থাকা ।

(থ) নফছের দমন ও রূহানী শক্তির বর্ধন ।

(দ) দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা, গীবত হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা ।

(ধ) কেবল কুকার্য্য নহে কুচিন্তা হইতেও নিজেকে রক্ষা করা এবং সদাই মনে রাখা যে, উভয়ই খোদার নিকট সমভাবে বিচার্য্য ।

(ন) নিজেকে ক্ষুদ্রতম মনে করা, কাহাকেও তুচ্ছ বা ঘৃণা না করা, সে নফর হউক, ভক্ত হউক বা শিষ্য হউক ।

(প) সুকথা ও সুকার্য্য দ্বারা লোকের সন্তুষ্টি সাধন করা এবং কুকথা বা কুকার্য্য দ্বারা কাহারো অন্তরে বেদনা দান হইতে বিরত থাকা ।

(ফ) মঙ্গল ও অমঙ্গলকে সমচক্ষে দেখা ও সকল অবস্থাতেই শোকরগোজার থাকা, রেজা ও তছলিম এখ্‌তেয়ার করা ।

(ব) মহব্বতকে জীবনের একমাত্র ব্রত করা'[২] ।

---

[২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭৭-৫৭৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

আহছানিয়া মিশন ছাড়াও আরো কয়েকটি সেবা সমিতি খানবাহাদুর প্রতিষ্ঠা করেন। কিছু শাখা মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর মূলনীতি ও কার্যাবলী সহ অন্যান্য বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

'আহছানিয়া মিশনের মূলনীতি ঃ

(স্রষ্টার এবাদত ও সাযুজ্য লাভ, সৃষ্টের সেবা)

নিম্নের কার্য্যাবলীর আভাস প্রদত্ত হইল-

(ক) শরীয়তের বিধানগুলিকে অনিবার্য্যভাবে প্রতিপালন।

(খ) শরীয়তের সহিত তরীকতের সামঞ্জস্য রক্ষণ।

(গ) সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন।

(ঘ) বিপন্নের প্রতি সাহায্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন। গুরুজনের সেবা, সৃষ্টের প্রতি মহব্বত।

(ঙ) মহব্বত বিস্তারই তরীকতের প্রধান লক্ষ্য; সে তবলীগ দ্বারা হউক, সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা হউক বা আর্থিক ও কায়িক সাহায্য দ্বারা হউক।

(চ) মানুষে মানুষে পার্থক্যের নিরাকরণ।

(ছ) মোকতাদান মধ্যে সহযোগীতা, সহানুভূতি, সাহায্য ও মহব্বত স্থাপন।

(জ) রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার কল্পে সমবেত চেষ্টা, আর্থিক ও কায়িক উপায়ে।

(ঝ) এতিমের প্রতি হাম্‌দরদী ও তাহাদের হকুক রক্ষণ।

(ঞ) সত্য কথন, সত্যপ্রচার, সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ।

(ট) সর্ব্ববিধ নেশা বর্জ্জন ও অসৎ সঙ্গ পরিহার।

(ঠ) প্রত্যেক সজীব প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহার।

Dhaka University Institutional Repository

(ড) খোদার প্রতি আত্মসমর্পণ, সংসারের প্রত্যেক বস্তু হইতে তাঁহার উপর অধিকতর মহব্বত স্থাপন ও তদনুসারে নিজকে নিয়ন্ত্রন ।

(ঢ) আত্মাভিমান বর্জ্জন, সম্পদে ও বিপদে পূর্ণ নির্ভরশীলতা ।

(ণ) নিঃস্বার্থে পরোপকার করণ, কথা ও কার্য দ্বারা ।

(ত) স্বার্থের জন্য কাহারও নিকট হস্ত প্রসারণ হইতে বিরত থাকা ।

(থ) নফছের দমন ও রূহানী শক্তির বর্দ্ধন ।

(দ) দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা, গীবত হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা ।

(ধ) কেবল কুকার্য্য নহে কুচিন্তা হইতেও নিজেকে রক্ষা করা এবং সদাই মনে রাখা যে, উভয়ই খোদার নিকট সমভাবে বিচার্য্য ।

(ন) নিজেকে ক্ষুদ্রতম মনে করা, কাহাকেও তুচ্ছ বা ঘৃণা না করা, সে নফর হউক, ভক্ত হউক বা শিষ্য হউক ।

(প) সুকথা ও সুকার্য্য দ্বারা লোকের সন্তুষ্টি সাধন করা এবং কুকথা বা কুকার্য্য দ্বারা কাহারো অন্তরে বেদনা দান হইতে বিরত থাকা ।

(ফ) মঙ্গল ও অমঙ্গলকে সমচক্ষে দেখা ও সকল অবস্থাতেই শোকরগোজার থাকা, রেজা ও তছলিম এখ্‌তেয়ার করা ।

(ব) মহব্বতকে জীবনের একমাত্র ব্রত করা ।

(ভ) নির্জ্জনে গভীর রাত্রিতে তাহাজ্জুত নামাজ আদায় ও মোরাকেবা সাধন এবং পার্থিব চিন্তা স্রোতকে নিবৃত করিয়া মহাপ্রভূর প্রতি আরোপকরণ ।

(ম) মোরাকেবার লক্ষ্য মনঃসংযোগ । সমস্ত অন্তর দিয়া মহাপ্রভুকে চিন্তা করা এবং ঐশী চিন্তায় নিমজ্জিত থাকা । স্বীয় হাস্তির জ্ঞানকে লোপ করাই মোরাকেবার প্রধান উদ্দেশ্য । ইহাই তাওহীদ নামে অভিহিত । ইহা ইছলামের শীর্ষ স্তর ।

(য) প্রেমিক ও প্রেমময়ের সংযোগ সাধন, সাযুজ্য ও তন্ময়তা লাভ মারেফাতের প্রধান লক্ষ্য ।

Dhaka University Institutional Repository

(র) আমাদের উদ্দেশ্য হইবে খোদা প্রাপ্তি - মহব্বতের রশি দ্বারা হজরত রাছুলুল্লাহ (দঃ) ও ওলী আল্লাহগনের মাধ্যমে ।

(ল) প্রশংসার লিপ্সাকে ত্যাগ করিয়া সর্বান্তকরণে সৃষ্টের সেবা ও তাহা দ্বারা স্রষ্টার সন্তুষ্টি সাধন প্রত্যেকের একমাত্র আকাঙ্খা হইবে'[৩] ।

কেন্দ্রীয় আহছানিয়া মিশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

১৯৩৫ সালে ১৫ মার্চ খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমাস্থ নলতা নিবাসী আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ এম.এ.এম.আর.এস.এ.আই.ই.এস.(অবসরপ্রাপ্ত) কর্ত্তৃক নলতা গ্রামে কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য খোদার এবাদত ও বান্দার খেদমত । ইহার বহু শাখা বহুস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তন্মধ্যে চট্টগ্রামে, হবিগঞ্জ, ঢাকা ২৪ পরগনা এবং সাতক্ষীরা শাখা মিশনগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য

এই মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা । ইহার উদ্দেশ্য অতি ব্যাপক । সমগ্র মানব সমাজের উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের মহান দায়িত্ব লইয়া এই মিশনে জন্মলাভ করিয়াছে । কোন বিশেষ সম্প্রদায় কি বিশেষ জাতি কি বিশেষ বর্ণে ইহা সীমাবদ্ধ নহে । সকল বান্দা খোদারই সৃষ্ট এবং সৃষ্টের উপর মলিনতা জন্মিলে স্রষ্টার জ্যোতি ইহার উপর প্রতিফলিত হয় না । বান্দার প্রত্যেক নেকী প্রত্যেক বদী সুচিন্তা দুশ্চিন্তা আত্মার উপর প্রতিভাত হইতে থাকে । সাধারণের ধারণা কেরামান কাতেবীন কর্ত্তৃক প্রত্যেকটি বাক্য ও চিন্ত াধারা লিপিবদ্ধ হয় । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফটোগ্রাফার কর্ত্তৃক লেন্সের উপর যেমন মানুষের ছবি প্রতিভাত হয় সেইরূপ কেরামান কাতেবীন কর্ত্তৃক প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তধারা রূহের উপর

---

[৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯১-৫৯৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিভাত হয়। খোদাওন্দ করিম বিচার দিবসে ছায়াপাত দ্বারা বান্দার বিচার করিবেন। সুতরাং বান্দার পক্ষে কোন কৃতকার্য বা চিন্তাধারা গোপন রাখা সম্ভপর হইবে না। মৃত্যুর সহিত দেহের বিনাশ হয় কিন্তু রূহ জীবিত থাকে। এই রূহের উপর সমস্ত কার্য ও চিন্তা ধারা রেকর্ড থাকিবে এবং সহজে দৃশ্যমান হইবে। জাতি বা বর্ণভেদে শেষ বিচার নির্ভর করিবেনা, নির্ভর করিবে সুকর্ম ও দুষ্কর্মের উপর এবং সুচিন্তা ও দুশ্চিন্তার উপর যাহা রূহের উপর রেকর্ড হইয়া থাকিবে এবং সহজেই দৃশ্যমান হইবে।

মানুষে মানুষে পার্থক্য করা অবিধেয়। প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার মহব্বত সমভাবে বিদ্যমান, সুতরাং সৃষ্টের প্রতি বৈষম্য দৃষ্টি রাখিলে স্রষ্টার প্রতি হেয় জ্ঞান করা হয়। সৃষ্টের খেদমতই প্রকৃতপক্ষে খোদার খেদমত । ইছলাম একটি আরবী শব্দ ইহা কেবল আরব জাতির জন্য অভিপ্রেত নয়। ইহা সার্বজনীন। যে জাতি সত্য অবলম্বন করিবে সেই জাতি সত্যময়ের নৈকট্য লাভ করিবে। পবিত্র কোরআন খোদার বানী এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত। ইছলাম শান্তির ধর্ম। কোন জাতি বিশেষ তাহা সীমাবদ্ধ নয়। অতএব কোন শ্রেণী, কোন সম্প্রদায় বা কোন তরীকার উপর অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে সে খোদারই প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়।

রূহ অতি পবিত্র বস্তু তাই প্রত্যেক দেহী মহব্বতের বস্তু, সে যে জাতি যে সম্প্রদায় যে তরীকাভুক্ত হউক না কেন। প্রত্যেকটি মানব ভ্রাতৃস্বরূপ ; পুত্রকে অনাদর করিলে যেমন পিতার বিরাগভাজন হইতে হয় সেইরূপ কোন মানবকে ঘৃণা বা অনাদর করিলে স্রষ্টার বিরাগভাজন হইতে হয়। সূর্য এবং বায়ু সমগ্র পৃথিবীতে সমভাবে সেবা করে। কেবল কোন জাতি বিশেষকে সেবা করে না। সেইরূপ প্রত্যেক সৃষ্টির পরস্পর কে সমচক্ষে দেখা ও সমভাবে সেবা করা কর্ত্তব্য সে যে জাতি বা সম্প্রদায় ভুক্ত হোক না কেন। আহছানিয়া মিশনের উদ্দেশ্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানবের সেবা করা এবং স্রষ্টার মহব্বত লাভ করা।

Dhaka University Institutional Repository

মোছলেম সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন তরীকা ও বিভিন্ন ছেলছেলা বিদ্যমান। ইহাদের কোনটির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে খোদার বিরাগভাজন হইতে হয়। সকল তরীকার উদ্দেশ্য খোদা প্রাপ্তি, সকল ছেলছেলার উদ্দেশ্য খোদার নৈকট্য লাভ। সুতরাং কোন ছেলছেলা বা তরীকাকে অসম্মানের চক্ষে দেখা অসঙ্গত।

সন্ধাবেলা শালিক একতাবদ্ধ হইয়া খোদারই গুণগান করিতে থাকে। আমরা তাহাদের ভাষা বুঝিনা। সন্ধাবেলা বকপক্ষী দলবদ্ধ হইয়া প্রেমময়ের উদ্দেশ্যে খোদাকে স্মরণ করিয়া ডাকিতে থাকে। প্রত্যুষে মোরগ খোদারই উদ্দেশ্যে খোদাকে স্মরণ করিয়া ডাকিতে থাকে। শৃগাল প্রহরে একতাবদ্ধ হইয়া হুক্ক-হুয়া শব্দে খোদাকেই ডাকিতে থাকে। পশুপক্ষীকে মানুষ হেয় চক্ষে দেখে, কিন্তু ইহাদিগের হইতে বিভু গীতি শিক্ষণীয়। ইলিশ মাছই শুধু দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে না, বরং অনুধাবন করিলে দৃষ্ট হয় চিংড়ি ও টেংরার মত মাছও দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। সকলেই মহব্বতের প্রেরণায় একতাবদ্ধ। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় ভ্রান্ত মানব স্বীয় গর্বে মত্ত, সে যে হীন প্রাণী হইতেও অধম তাহা বুঝাবে কে?

ক্ষুদ্রতম কীট মাকড়সা যে আহার্য সংগ্রহের জন্য জাল বিস্তার করে, সে জাল গর্বোন্মত্ত মানব তৈয়ার করিতে অক্ষম। বাবুই পক্ষী তালবৃক্ষে যে বাসা প্রস্তুত করে তাহাও মানুষ তৈয়ার করিতে অসর্মথ। খোদার মাহাত্ম্য দেখিতে হইলে একবার সমুদ্র তীরে যাও এবং ক্ষুদ্র কর্কটরাশীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করো। হে মানব তুমি অহঙ্কারের প্রতিমূর্তি, তুমি লজ্জিত হইবে যে ক্ষুদ্র কীটবর্গও তোমা হইতে অধিক জ্ঞানধারণ করে। প্রত্যহ ভাটার সময় অগণিত লাল কাকড়া সমুদ্রতীরে করুশিল্প নির্মাণ করিতে থাকে। সে শিল্প কত সুন্দর, কত মনোমুগ্ধকর, কত শিক্ষাপ্রদ! কোথায় বা একটি ফুলের গাছ নয়নাভিরাম ফুলভারে পলির উপর অঙ্কিত। অন্যত্র দেখো কণ্ঠহার পড়ে আছে বালির উপর। কীট দ্বারা অঙ্কিত হয়ে। আমরা সাধারণ যে অলঙ্কার পড়িয়া থাকি তাহা অনুস্কৃত হয় সমুদ্র সৈকতের বালিরাশির উপর কীটের অঙ্কন হইতে। তাই বলি অজ্ঞ মানুষ অহমিকা বর্জন কর আর কীটের নিকট শিক্ষা গ্রহন কর। স্রষ্টার

Dhaka University Institutional Repository

মাহাত্ম অপরিমিত। ক্ষুদ্র কীট হইতে শ্রেষ্ঠ বান্দাহ পর্যন্ত তাঁহারই জ্ঞান গর্বে গর্বিত। ঘৃণা ও অহংকার পরিহার করত করুনাময়ের কৃপালাভে প্রস্তুত হইতে থাকো।

দয়াময়ের মাহাত্ম্য অপরিসীম। সমগ্র নিসর্গ, প্রকৃতি, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা মানবসেবায় নিয়োজিত। আহারের জন্য যেমন প্রত্যেক পরিবারের পাকশালার ব্যবস্থা থাকে সেইরূপ প্রত্যেক বান্দার জন্য পাকস্থলীর ব্যবস্থা আছে। খাদ্য আহার করিলে পাকস্থলীর কার্য্য শুরু হয়। পাকশালায় পাকের জন্য মসলাদির দরকার হয় তেমনি গ্রহণী, লিভার, প্লীহা প্রভৃতি পাকস্থলীর কার্য্যে সাহায্য করে এই উদ্দেশ্যে যে ভুক্ত দ্রব্য হইতে রক্তের সৃষ্টি হইয়া শরীর পুষ্ট থাকিবে। ভুক্ত দ্রব্যে অনাবশ্যক উপাদান মলমূত্র ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা বহির্গত হয়। যে অপাচ্য অংশ রক্ত সঞ্চারের জন্য অনাবশ্যক সেগুলিকে পাকাশয় মলমূত্র আকারে নিঃসরন করে কিন্তু কোন বস্তুর বিনাশ নাই। মলমুত্র দেহ গঠনের জন্য উপযোগী নহে বটে কিন্তু উহা দ্বারা সার উৎপন্ন হয় যদ্বারা শস্য ক্ষেত্রের উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা দূষিত বায়ু নির্গত হয়। বৃক্ষপত্র সূর্যকিরণ সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করত নিজ দেহ গঠিত করে। প্রত্যেক বৃক্ষ বায়ু হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণে বিশ্লেষণ করত কার্বন রাখিয়া অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং সেইঅক্সিজেন গ্রহণে প্রাণিকুল বাঁচিয়া থাকে। একদিকে বৃক্ষ বায়ু থেকে আাহার গ্রহন করে অন্যদিকে মূলদ্বারা মৃত্তিকা থেকে জল আকর্ষণ করে। ইহাতে করুনাময়ের অপার মহিমা পরিলক্ষিত হয়।

সকল জীবের দেহ মনুষ্য দেহের অনুকরণে গঠিত। মানুষের দেহাভ্যন্তরে যে সকল কলকব্জা আছে প্রত্যেক জন্তু পক্ষী ও মৎস মধ্যেও তদ্রুপ রয়েছে। কোন কোন মৎস্যের মধ্যে গলব্লাডার ছোট থাকায় পানির নিচে মাটির উপর পড়িয়া থাকে। এই সব বৈচিত্র দেখিলে স্রষ্টার প্রতি অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হয়। বৃক্ষরাজি বায়ু হইতে আহার গ্রহনের জন্য সর্ব্বদা মস্তক উন্নত রাখে । বৃক্ষ বায়ু হইতে কার্বন আকর্ষণ করিয়া দেহ গঠন করে এবং অক্সিজেন পরিত্যাগ করিয়া জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে

Dhaka University Institutional Repository

খোদাওন্দ করিম ঘুর্ণায়মান গ্যাস দ্বারা একদিকে মানুষকে সেবা করিতেছে এবং অন্যদিকে গাছপালা পুষ্ট করিতেছেন। মানুষের আহার্য কিয়ৎ পরিমানে রক্তে পরিণত হইতেছে এবং অপর অংশ যাহা শরীর গঠনে অনুপোযোগী তাহা মলমুত্র আকারে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। এইরূপে সারা প্রকৃতি মানুষের সেবা করিতে ব্রতী আছে। মানুষ সৃষ্টির সেরা। তাই তাহার সেবায় সারা বিশ্ব প্রকৃতি নিয়োজিত আছে। সুতরাং বিশ্বের জীব জন্তুর প্রতি মানুষের মহব্বত থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রকৃতি মানুষকে সেবা করে তাই মানুষকে স্রষ্টার সেবায় ব্রতী থাকা সমীচীন। দুঃখের বিষয় আমরা মুছলিম হইয়া অপর জাতিকে ঘৃণা করি। আমরা ভুলে যাই যে আমরা যে স্রষ্টার দ্বারা দিবারাত্রি প্রতিপালিত হইতেছি ভিন্ন দেশের ভিন্ন জাতিও সেই স্রষ্টার দ্বারা একই রূপ প্রতিপালিত হইতেছে। অতএব ভূমন্ডলের মধ্যে ঘৃণার স্থান নাই। স্রষ্টা প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুর প্রতি সমভাবে দয়াশীল,ভ্রান্ত মানুষ তাহা মোটেই উপলব্ধি করে না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইছলামের শিক্ষা সকল জাতির প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য । সৃষ্টির মাঝে ঘৃণা বা হেয় জ্ঞানের স্থান নাই। হে মানব একবার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন কর আর স্রষ্টার মাহাত্ম্য, দয়া ও অনুগ্রহ অনুধাবন কর। তিনি অপার দয়ায় সকল জাতিকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেছেন তবে আমরা কোন জাতিকে উপেক্ষা করিব?

হে করুনাময় তোমার এই সকল নির্বোধ বান্দাকে জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও, মহব্বত দাও যেন তোমার দয়া ও এহছান উপলব্ধি করিয়া আমরা জীবন সার্থক করিতে সক্ষম হই।

জড় পদার্থের মধ্যেও আকর্ষণ অনুভূত হয়। যিনি সমুদ্র সৈকতে গিয়াছেন তিনি দেখিয়াছেন বেলাভূমির বালুকারাশিতে ভিন্ন ভিন্ন স্তর। শ্বেত বালুকা ও কৃষ্ণ বালুকার স্তর ভিন্ন, স্বতন্ত্র। শুক্তি যেখানে দৃষ্ট হয় সেখানে স্তুপাকারেই দৃষ্ট হয়, ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয় না। তাই সমুদ্র হইতে মানবের বহু বিষয় শিক্ষনীয় আছে। মূলে সবই একই খোদার সৃষ্ট এবং পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণ ও মহব্বতে আবদ্ধ। সুগন্ধি ফুল হইতে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে কিন্তু মানব তাহার

Dhaka University Institutional Repository

বিরাট বুদ্ধি লইয়াও মৌমাছির অনুকরণ করিতে অক্ষম। প্রকৃতির এই সকল দৃশ্য দেখিয়া মানবের অহমিকা ত্যাগ সর্বতভাবে কর্ত্তব্য। খোদার সকল সৃষ্ট বস্তু হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে খোদার সৃষ্টিকে ঘৃণা করিলে খোদাকেই ঘৃণা করা হয়। মিশনের ইহাই প্রধান শিক্ষার বিষয়। নিজকে ক্ষুদ্রতম মনে করিয়া সারা বিশ্বকে সমাদর করা মানবের মহান কর্ত্তব্য।

শরীয়তের উদ্দেশ্য বেহেস্তপ্রাপ্তি আর তরীকতের উদ্দেশ্য খোদা প্রাপ্তি। শরীয়তকে তরীকতে উন্নীত করিতে হইলে চাই নফসের দমন। নফস বলিতে সাধারণত ইন্দ্রিয় বুঝায়। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার: বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তর ইন্দ্রিয়। বাহ্য ইন্দ্রিয় যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। অন্তর ইন্দ্রিয় বলতে যথা আমিত্ব, অহমিকা, রিয়া, হিংসা, দ্বেষ ও গীবত। বাহ্য ইন্দ্রিয়কে দমন করা সহজতর কিন্তু অন্তর ইন্দ্রিয়কে দমন করা বহু কষ্টসাধ্য। ইন্দ্রিয় দমনের সহিত চরিত্র গঠিত হয়। যাহার চরিত্র নাই তাহার খোদা নাই। তরীকতের মূল চরিত্র গঠন। চরিত্র যতই গঠিত হইতে থাকে ততই রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তদসহ মহব্বত ও প্রেম জন্মে। মহব্বতের প্রথম রূপ তরীকত, দ্বিতীয় রূপ হাকীকত, এবং উচ্চতম ধাপ মারেফাত। মহব্বতের উচ্চতম পর্যায় হইতেছে তৌহিদ ও একত্ববাদ। যতই দুনিয়াবী চিন্তাকে বর্জন করিয়া প্রেমিক প্রেমময়ের চিন্তায় বিলীন হয় ততই তার হাস্তি জ্ঞান রহিত হয়। প্রেমিক সময়ের জন্য খোদার তাজাল্লির মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং আপন জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। আহছানিয়া মিশনের উদ্দেশ্য - শরীয়ত ও তরীকতের সমন্বয় সাধন, শরীয়ত কে তরীকতে পরিনত করা, ধরার বুকে বেহেস্ত আনয়ন করা।

অনেকের জন্য পথ প্রদর্শকের অবশ্যক হয়। এক্ষেত্রে যে বোজর্গ খোদা ও রাছুলের প্রিয় এবং উচ্চ পর্য্যায়গুলির তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী তাহারই সাহায্য একান্ত আবশ্যক। পীর, রাছুল ও খোদা একই বৃন্তে তিনটি শুরভিত পুষ্পের সমাহার। মানব উপযুক্ত পীরের সাহায্যে হজরত রছুল করীম (সাঃ)এর নৈকট্য লাভ করে এবং আঁ-হজরত (সাঃ)এর মাধ্যমে খোদাতক পৌঁছে।

Dhaka University Institutional Repository

খোদা দেহহীন তাই তাহার নৈকট্য হাছিল করিতে হইলে দেহী পীরের আবশ্যক হয়। এবং একমাত্র তাহারই মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আঁ-হজরত (সাঃ)এর পর্যায়ে পৌঁছে সেই মুহূর্তে খোদাওন্দ করীমের অনুভূতি লাভ করে এবং তদসহ প্রকৃত শান্তির অধিকারী হয়। প্রেমিকের চিন্তা যে পর্যন্ত পার্থিব চিন্তা থেকে বিযুক্ত না হয়, সে পর্যন্ত প্রেমময়ের সহিত লাগোয়া পয়দা হয় না। এই শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পীরের আবশ্যক।

দেশ সেবা মিশনের অন্যতম লক্ষ্য। জাতি গঠনে ইউরোপ ও আমেরিকার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐসকল রাষ্ট্রে রুগ্ন ভিখারী ও অনাহারী দৃষ্ট হয় না। রাষ্ট্র হইতে তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করা হয়। অন্ধতম মহাদেশ আফ্রিকার দেশগুলি একে একে স্বাধীনতা অর্জন করিতেছে। আলজেরিয়ার ইতিহাস সবাই অবগত। সহস্র সহস্র অধিবাসী সাম্রাজ্য বাদী ফরাসী সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিদিন জীবন দানে কুণ্ঠিত নহে। দুখের বিষয় পাকিস্তান সরকার তাহার সামগ্রিক চেষ্টা সত্ত্বেও একমাত্র কালোবাজারী টুকু দমন করতে সম্পুর্ণ সফল হন নাই। ইহাতে আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতাই প্রমানিত হয়। চরিত্রই মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পাকিস্তানের অধিবাসীগনই ইছলামের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পশ্চাদপদ। কোরানের অনুশাসন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু উহার অনুসরণের অভাব চরিত্রকে কলঙ্কিত করে। দয়াময় আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত হইতে তৌফিক দাও , ইহাই প্রার্থনা।

মিশনের প্রধান লক্ষ্য খোদাওন্দ করীমের নৈকট্যলাভ। খোদা সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা অতি সীমাবদ্ধ। পদার্থ দুই প্রকার জড়-অজড়। জড়ের মধ্যে মানব দেহ সম্বলিত সুতরাং এক সময়ে বহুস্থান অধিকার করিতে অক্ষম। দেহহীনের পক্ষে তাহা অসম্ভব নয়। তাপ ও বায়ু সর্ব্বদা একই সময়ে সারাবিশ্বে বিদ্যমান। কেবল তাহাই নহে তিনি সময় ও স্থানের বহির্ভূত। যেখানে বিশ্ব নাই, চন্দ্র নাই সেখানেও তিনি বিদ্যমান। দেহী মানব দেহহীন খোদাকে সম্পুর্ণভাবে চিন্তা করিতে অক্ষম। সেই জন্য রূহ কে সেই মহারূহের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হইলে চাই একছোয়ী বা 'Concentration'। খোদার নৈকট্য লাভ করিতে হইলে

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাস্রোতকে তাহাতেই নিয়োজিত করিতে হইবে। তদুপরি সতর্ক থাকিতে হইবে যেন ঐশী চিন্তার মধ্যে পার্থিব চিন্তা প্রবিষ্ট না হয়। অনেকের ধারণা তিনি আকাশের উপর সিংহাসনে আসীন। দেহীর পক্ষে দেহহীনের চিন্তা বড়ই কষ্টসাধ্য। ইহা একান্ত অনুভূতির বিষয়। ইন্দ্রিয় গুলিকে রুদ্ধ করিয়া কেবল অন্তরটি দ্বারা সেই অন্তরতমকে চিন্তা করিতে হয় এবং ইহার ফলে দেহী মানব দেহহীন শক্তিময়ের নানা নির্দেশ চক্ষু বন্ধ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। প্রেমিক একনিষ্ঠ চিন্তার ফলে কখনও ফেরেস্তা, কখনো চন্দ্র, কখনো তারকা, কখনো কামেল পীর, কখনো সুগন্ধ, কখনো আলোক অনুভব করিতে পারে। ধ্যানযোগে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলে খোদাওন্দ করীমের অস্তিত্ব নানাভাবে অনুভূত হয়।'[৪]

[৪] প্রাগুক্ত, ৫৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

অর্ধশতাব্দী উপরে (প্রায় ৬০ বছর) কাল বিস্তৃত সাহিত্য সাধনায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) রচনা করেছেন নূন্যাধিক প্রায় শতাধিক গ্রন্থ, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৭৮৭৫ এর উর্ধে। সম্প্রতি এগুলো ১৪ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এ এক বিস্ময়কর কীর্তি। কোরআন, হাদীস, ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য, বিভিন্ন ধর্মের মর্মবাণী, শিশু সাহিত্য, শিক্ষা, ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস, জীবনী প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতা প্রমাণ করেছেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন বিচিত্র মনীষার বাণী বিদগ্ধ পাঠকের হৃদয়ে হৃদয়ে। সমৃদ্ধ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জ্ঞান-ভান্ডার। তাঁর রচনাবলী বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে এগুলোর উপযোগিতা এবং অপরিসীম ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন বিভিন্ন অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় চেতনার পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে যেমন তিনি রচনা করেছেন নবী জীবনী, অলি-আউলিয়া সূফী-সাধকদের জীবনী তেমনি ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে প্রণীত হয়েছে হেজাজ অধিপতি এবনে ছউদ, তুর্কী সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক, রাজর্ষি আওরঙ্গজেব প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থরাজি।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে নিয়ে রচিত গ্রন্থের মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রফেসর মোহম্মদ আব্দুল হাই এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন- 'আহ্ছানউল্লা (রঃ) ভক্ত, সুতরাং ইসলাম প্রচারক আদর্শ মহাপুরুষ হযরত মোহম্মাদ (দঃ) এর জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থে যে ভক্তমনের পরিচয় তিনি দেবেন তা অবধারিত। এই বইটিতে প্রকৃত পক্ষে ঘটেছেও তাই।'[১] অনুরূপভাবে 'দরবেশ জীবনী' গ্রন্থের সূচনায় লেখকমানস ধরা পড়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

---

[১] মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্য' বইঘর, চট্টগ্রাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৮১ পৃষ্ঠা ১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

'মানুষের একদিকে যেমন জাহেরী শরীয়ত শিক্ষা আবশ্যক, অন্যদিকে বাতেনি এলম শিক্ষা করতঃ আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করতে ততোধিক আবশ্যক। যাবতীয় সৃষ্টিজীব স্রষ্টার গুণকীর্তন করিয়া থাকে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মানুষ পার্থিব ব্যাপারে দুনিয়ার মোহে এরূপ মুগ্ধ যে, আল্লাহ প্রাপ্তি সম্পর্কে বেখিয়াল। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ নফ্সকে বশীভূত করিয়া খোদার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় এবং অলি আল্লাহগণের কৃপা লাভ করিতে পারে তৎপ্রতি তাহাদের আদৌ চিন্তা নাই।'[২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন ধারায়' তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস, জাতিগত ভাবনা, সামাজিক ঐতিহ্যবোধ, মানবপ্রীতি, সর্ব মানবিক কল্যাণ কামনা, অধ্যাত্মচিন্তা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এই একটি মাত্র গ্রন্থ পাঠ করে চিনে নেয়া সম্ভব মানব বন্ধু, খোদা প্রেমিক, সৃষ্টি প্রেমিক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর নানামাত্রিক চিন্তাভাবনা।

কোরআন-হাদীস বিষয়ক রচনাবলীতে তিনি মানবজীবনে কোরআন-হাদীসের গুরুত্ব নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। কোরআনের অমূল্য বানীকে তিনি মানব জীবনের দৈনন্দিন জীবন যাপনের উপযোগী করে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার যথাযথ মূল্যায়ন করে কোরআন ও কোরআনের একত্ববাদকে সার্থক করে দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে 'ইসলাম বিজ্ঞানের পরিপন্থী নহে' [৩], কোরআন ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় তিনি বলেছেন, 'কুরআনের সহিত বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সামঞ্জস্য রহিয়াছে'[৪]।

মুসলমানরা কোন ইতিহাসহীন জাতি নয়। তাদের আছে একটি গৌরবোজ্জ্বল সুবিপুল ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারা। ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলীতে তিনি আত্ম অসচেতন বিস্মৃত প্রায়

---

[২] গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহছানউল্লা রচনাবলী, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪.৭।
[৩] প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃঃ৪১।
[৪] ঐ

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার অতীত শৌর্য-বীর্য, কীর্তি-সাফল্যের কিংবদন্তি প্রতিম ঐতিহাসিক সত্য তথ্যের কথা। তিনি বিশ্বাস করতেন আত্মভোলা জাতিকে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ইতিহাসের কথা স্মরণ করে দিতে পারলে মুসলমানের পুনরুত্থান সম্ভব।

তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য শিক্ষা গ্রহণ করে জাতিগত সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি দূরীকরণের আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় 'বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী' গ্রন্থে। তাঁর ভাষায়ঃ

> 'স্রষ্টা দয়ার সাগর রহমানুর রহিম। তিনি যুগে যুগে ভ্রান্ত মানবগুলির পথ নির্দেশের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পথ প্রদর্শক প্রেরণ করেছেন। কাজেই কোন জাতিকে, কোন সম্প্রদায়কে, কোন ধর্মকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা সম্ভব নহে। স্রষ্টার উদ্দেশ্য চিরকালের জন্য একই। তার একমাত্র উদ্দেশ্য কিরূপে মানব তার প্রতিনিধি হিসাবে জগতের বুকে তারই মাহাত্ম প্রচার করবে'।[৫]

জগতের বিভিন্ন ধর্মগুরু সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর এই মনোভাব শুধু প্রশংসাজনক নয়, অনুসরণীয়ও বটে।

ধর্মের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে। আবার ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন ছাড়া অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করা এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও অনুরাগ সৃষ্টি করা সহজসাধ্য নয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এ দুটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। গতানুগতিক ধর্ম পরিচিত প্রদান করাই তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলনা, ধর্মের প্রতি, আল্লাহ ও রসুলের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও অনুরাগ সৃষ্টি করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য আমরা লক্ষ্য করি, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিধিবিধানকে তিনি ঐতিহাসিক, সামাজিক, মানবিক এবং

---

[৫] প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৪৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন; একটি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য সত্যের উপর এ সকল বিষয়কে দাঁড় করিয়েছেন।

'ইসলাম ও জাকাত' গ্রন্থে লেখক দেশ বিদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা ও দেশের কম্যুনিজম সম্পর্কে ইসলামের মধ্যপথ অবলম্বনের ইতিহাস থেকে শুরু করে ইসলামের সম্পদ গ্রহণ ও বর্জনের কথা অত্যন্ত সুন্দর, সাবলীল ও যুক্তিযুক্ত করে বর্ণনা করেছেন 'তরিকত শিক্ষা' গ্রন্থে; শরীয়ত ও তরীকতকে ইসলামের দুটি অঙ্গ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায় শরীয়ত বহিরঙ্গ, তরীকত অন্তরঙ্গ। শরীরের সহিত রূহের যে সম্বন্ধ, শরীয়তের সহিত তরীকতের সেই সম্বন্ধ। মানব জীবনে উভয়ই আবশ্যক। শরীয়তের বিধান প্রত্যেকেরই পালনীয়। শরীয়ত বিনা তরীকত অসম্পূর্ণ।

ভাষা সাহিত্য বিষয়ে তাঁর চিন্তা চেতনা ও করণীয় ভাবনায় প্রকাশ ঘটেছে 'বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' গ্রন্থে। তিনি বলেনঃ

> 'ভাষার সহিত সাহিত্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। ভাষার উন্নতির সহিত সাহিত্যের উন্নতি সংঘটিত হয়। মনের ভাব ভাষায় পরিণত হয়। ভাব যাহার যত উচ্চ তাহার ভাষাও তত প্রকৃষ্ট। ভাষা দ্বারা শিক্ষা ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে ভাষার পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা নহে, একই জাতির মধ্যে অনেক সময়ে ভাষার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শিক্ষাতে ভাব যতো মার্জিত, ভাষার তত পরিশুদ্ধি লক্ষিত হয়। অশিক্ষিত জাতির ভাষা অসম্পূর্ণ। ..... যে সমাজ বা যে জাতির মধ্যে উচ্চ ভাবাপন্ন ব্যক্তি যত অধিক, সে সমাজ বা জাতির সাহিত্যও তত উন্নত। যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতির অস্তিত্ব কোথায়?'
>
> 'এত কাল পর্যন্ত মাতৃভাষার কূটতর্ক লইয়া সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। উর্দু আমাদের মাতৃভাষা মনে করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য কেহ অগ্রসর

Dhaka University Institutional Repository

> হন নাই। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ সে তর্ক মিটাইয়া দিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে বঙ্গভাষায় সাহিত্য রচনা করা আবশ্যক। বঙ্গভাষা বলিতে একটি অবিচ্ছিন্ন ভাষা বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র বঙ্গভাষা, আবার কেহ কেহ বলেন পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গের জন্যও স্বতন্ত্র ভাষা হওয়া আবশ্যক। বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার ব্যবচ্ছেদ হয় নাই। জাতি ও বর্ণভেদ অনুসারে ভাষার ভেদ হওয়া অযৌক্তিক। ভাষার যতই ভেদ হইবে, শ্রেণীগত পার্থক্য ততই বৃদ্ধি পাইবে, জাতীয় জীবনের ততই লোপ হইবে, সাহিত্যের ততই অবনতি হইবে'[৬]।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) মাতৃভাষায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিরল অনুরাগের পরিচয় শুধু দেননি, তৎকালীন সাহিত্যসমাজ ও সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ১৯১৭-১৯১৮ সনের কার্যকরী পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুল করিম এবং সম্পাদক ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। সমিতির দু'জন সহকারী সভাপতি ছিলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ছাড়া দ্বিতীয় সহকারী সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ আকবর খান।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ইতিহাসকেও সাহিত্য চর্চার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন বস্তুনিষ্ঠ নিরাবেগ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে এই পর্যায়ে তিনি রচনা করেছেন 'এবনে ছউদ', 'মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক' 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব' প্রভৃতি গ্রন্থ। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসকে সত্যাশ্রয়ী করে পাঠক মনে মুদ্রিত করে দেয়া। যেমন তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও জীবন যাপনের বস্তুনিষ্ঠ

---

[৬] প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ও সত্যনিষ্ঠ রূপের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে ঐতিহাসিক তথ্যের কোথাও বিলোপ ঘটেনি কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক বিকৃতির সংশোধন হয়েছে।

এক কথায় যেখানেই তিনি সত্য প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেছেন সেখানেই অকুণ্ঠিত চিত্তে তা তিনি করেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'সান্দারদের প্রতি সমাজের অবিচার' শীর্ষক রচনাটির কথা। ১৩০০ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত সাম্যবাদী পত্রিকার প্রথম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় তাঁর এ লেখাটি প্রকাশিত হয়। এতে তিনি সামাজিক আচার, আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা ও বঙ্গীয় কূপমন্ডুকতার শিকার সান্দারদের দুঃখ দুর্দশার করুণচিত্র এবং সমাধানের ইঙ্গিত করেছেন। প্রসঙ্গত কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যায়ঃ

> 'খুরচা মনোহারী জিনিস-পত্রাদির ব্যবসার দ্বারা সান্দাররা জীবিকা অর্জন করে। ইহা নিতান্ত হালাল রুজী। সান্দাররা পর্দা প্রথা মানেনা; তাহা ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে ইহারা অন্যান্য সাধারণ মানুষজনের মত ইসলাম ধর্মের পায়রবী করে। ইহাদের মধ্যে মুনসী, মোলভী ও হাজি বিরল নহেন। অথচ সাধারণ মুসলমান সমাজ ইহাদিগকে মুসলমান ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতেও তাহাদের সঙ্গে সমাজ করিতে নারাজ। ইহা নিতান্ত ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধ আচার ও দুঃখের বিষয়।'

লক্ষ্যণীয় যে, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর রচনারীতি সহজ, সরল ও সাবলীল। শব্দ চয়ন, উপমা ও রূপকের ব্যবহারও তথৈবচ এবং বাস্তবতার স্পর্শে জীবন্ত। এ বাস্তবতার মধ্যে লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রকাশিত হয়ে এক অভিনব ভাব পরিগ্রহ করেছে। এ তাঁর সাহিত্যের এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য। যেমন বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিপ্রবণতার সঙ্গে মননশীলতার সংমিশ্রণ। একইভাবে আদর্শবাদ ও বস্তুনিষ্ঠতাও মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে তাঁর রচনায়। অথচ দুয়ের মধ্যে বিরোধ হয়ে উঠেনি উচ্চকিত অর্থাৎ একাধারে তিনি আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী সাহিত্য সাধক। সমাজ মনস্ক মনীষী। মানবতাবাদী ও কল্যাণবাদী ব্যক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

আবার তাঁর এই মানবতাবাদ ও কল্যাণবাদের পিছনে মূলত কাজ করেছে তাঁর ধর্মীয় সাধনা, অধ্যাত্মচেতনা ও গভীর স্রষ্টানুভব। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক যেমন গভীর, নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর ধর্মভাবনার সঙ্গেও তেমনি সৃষ্টিপ্রেম ও মানবপ্রেম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর এই আত্মগত অভ্যাস ও ধর্মানুভব তিনি অর্জন করেছিলেন পারিবারিক সূত্রে। ফকির, দরবেশ, পীর-আউলিয়াদের আত্মিক ক্ষমতা বিয়য়ে তিনি আস্থা প্রাপ্ত হন, পিতা-প্রপিতামহের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। তবে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তির আশীর্বাদে তিনি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন সংস্কারমুক্ত আলোকিত মানুষ, মানবতার প্রতীক, জীবনপ্রেমিক ও সত্য সাধক।

বিভিন্ন কারামতের অধিকারী পীর, দরবেশ পৃথিবীর অন্ধকার দূর করতে ধরা বক্ষে আগমন করেন। অবিভক্ত বঙ্গের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এমনি একজন সাধুপুরুষ। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান তথা বাঙালি নিকট মাত্রেই তিনি পীর সাহেব বলিয়া খ্যাত। আত্মসচেতন, কালসচেতন, মানবসচেতন ও ধর্মসচেতন কোন ব্যক্তিই সম্ভবত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর জ্যোতিদীপ্ত কল্যাণী মানস বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবেন না।

সূফীবাদের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ও আদর্শিক প্রতিমূর্তি ছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)। তাঁর মত নিরহঙ্কার, কর্মপ্রবণ, নির্লোভ, সৃষ্টিপ্রেমী, সমাজহিতৈষী, মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক মানুষ বাঙালি জাতির জন্য অহংকারের উৎস। উৎস প্রেরণাকারী ব্যক্তির প্রজ্ঞাশীল মনীষারও উৎস তিনি ইনসানে কামেলের এবং দৃষ্টান্ত প্রকৃষ্ট মনুষ্যত্বের। পরমাত্মজ্ঞানী কামেল তিনি। তাঁর মতে পরমাত্মা জ্ঞানের তিনটি মার্গঃ

> 'জ্ঞান মার্গ, কর্ম মার্গ ও প্রেম মার্গ। দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবল দ্বারা ঐশীজ্ঞান লাভ করে, কর্মীপুরুষ সুকর্ম দ্বারা তাহাকে লাভ করিতে চায়, আর প্রেমিক আত্মজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে প্রেমময়ে আত্মসমর্পণ করে। তাহার নিকট প্রেমময়ই

Dhaka University Institutional Repository

> একমাত্র কাম্য, একমাত্র লভ্য, একমাত্র লক্ষ্য। প্রেমময়ের সন্তুষ্টি বিধানই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত। সমগ্র বিশ্ব লইয়া তাহার প্রেমের পরিধি বিস্তৃত হয়। তাহার প্রেম স্বজন স্বশ্রেণী কিংবা মানবজাতি লইয়া সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহার দয়া সহানুভূতি সর্ব্বভূতে সমপরিমাণ ব্যাপ্ত থাকে। সে নির্জ্জীবেও জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করে। ভূমন্ডল অতিক্রম করিয়া নভোমন্ডল ও পাতালমন্ডল, এমনকি পরলোক পর্যন্ত প্রেমিকের আকর্ষণ বিস্তৃত। সে প্রত্যেক জড়ে ও অজড়ে এহছান বা কৃপা প্রতিভাত দেখে, সে বিশ্বজগতে তাহারই পরিবেষ্টন লক্ষ্য করে। তিনি ব্যতীত কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না'[৭]।

সুতরাং এহেন বিশ্বাসী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর নিকট যে জগৎ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে দেশকালাতিশয়ী প্রত্যেক মানব এবং পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ পরমাত্মার বিভূতিরূপে প্রতিভাত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বস্তুত তাঁর যাপিত জীবনে হয়েছে তাই। জড়, অজড়, মানব, অমানব,পশুপাখি, জীবজন্তুর সকলের প্রতিই তাঁর সমান প্রেমজ দুর্বলতা। সকলের সেবাই তাঁর খোদা প্রাপ্তির রাজপথ। সকল ধর্মের অন্তর সত্য ও আলো তাঁকে আলোকিত করে। তাঁর কথায়ঃ

> 'জগতের বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ধর্মের মূলনীতি এক। প্রত্যেক ধর্মই প্রচার করে সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা। বৈষ্ণব ধর্ম বলে, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ইসলাম ধর্ম বলে, সৃষ্টের সেবাই স্রষ্টার সেবা, যেহেতু সৃষ্টের মধ্যে স্রষ্টার রূহ বিদ্যমান। পারসিক ধর্ম বলে, পরদুঃখকারী ব্যক্তিই স্রষ্টার প্রিয় পাত্র। খৃষ্ট ধর্ম বলে, যারা সবার শান্তি কামনা করে, তারাই

[৭] প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০২, পৃঃ ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

> ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান। প্রত্যেক ধর্মের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রষ্টার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভ। আর তা করতে হলে উপসনারও প্রয়োজন। প্রায় প্রত্যেক ধর্মে উপাসনার নির্দেশ আছে। কিন্তু উপাসনার ধারা বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকম, কেহ আকার উপাসনা করেন, কেহ নিরাকার করেন। পারসিকরা অগ্নির মাধ্যমে পূজা করে থাকেন। পার্সিক ধর্ম বলে যে, পার্সিকেরা অগ্নি পূজা করে না ঈশ্বরকে পূজা করে অগ্নির মাধ্যমে। হিন্দু ধর্ম মূর্তির মাধ্যমে মূর্তিকে সামনে রেখে পরমেশ্বরকে ধ্যানে পূজা করে থাকেন। শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব নৃত্য করে উচ্চস্বরে হরিনাম গেয়ে ঈশ্বর পূজা করেন। চৈতন্যদেব বলেন, 'ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হয়ে নৃত্য করত: উচ্চস্বরে চোখের জলে হরিকে ডাকলে তাঁর সন্ধান মিলে'[৮]।

ইতর বিশেষ নেই তাঁর কাছে। নেই জাত পাত, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত, কুলিন-অকুলিনে, স্পৃশ্যে-অস্পৃশ্যে। এমনকি প্রায় সর্বজন পরিত্যাজ্য অস্পৃশ্য মেথরকেও তিনি ঘৃণা করেন না। বরং তাঁর পরিস্রুত পবিত্র চেতনায় সেও হয়ে উঠে বেহতর; শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেনঃ

> 'যে মেহথর, সে যে আমা অপেক্ষা বেহতর, আমি বুঝি কৈ? আমি যে বস্তু পেটের মধ্যে রাখিয়া স্পর্ধা করি, আর সেই বস্তু আমারই স্বাস্থ্য সাধন হেতু পরিত্যক্ত হইলে যে ব্যক্তি আমারই কার্য্যে সহায়তা করে, আমি তাহাকে বলি অস্পৃশ্য। আমি অবোধ, তাই নিজের মলধারী শরীরকে পূজা করি, আর আমার সাহায্যকারী মেথরকে ঘৃণা করি, ছি! আমার জ্ঞানের।'[৯]

উল্লেখিত একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর সর্বব্যাপি মানব প্রেম ও দিগন্তপ্রসারী মানসের স্বরূপ বুঝে নেয়া যায়। বুঝে নেয়া সম্ভব আত্মনিবেদিত নৈষ্ঠিক কর্ম,

---

[৮] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০।
[৯] প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বনিষ্ঠা, মহানুভবতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, দাপ্তরিক বিচক্ষনতা ও উজ্জ্বল চরিত্রগুণে যিনি বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী কতৃক খানবাহাদুর খেতাবে ভূষিত হন, তিনি কি রকম মানের মানুষ ছিলেন। ছিলেন কি রকম উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক এবং কি রকম সমাজমনস্ক মানবহিতৈষী, তাও।

মহৎপ্রাণ আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর উদারতা শত্রুকেও পরমপ্রীতি ভরে স্পর্শ করে। নিষ্ঠুর নির্যাতকের দিকেও তাঁর পরোপকারের হাত প্রসারিত হয় এবং অভিসম্পাতকারীকে পর্যন্ত ক্ষমার সুশীতল বারিধারায় পবিত্র করে তোলে। তিনি বলেন, 'শত্রুকে ভালবাস এবং যাহারা তোমাকে অভিসম্পাত করে, নির্যাতন বা ঘৃণা করে তাহাদিগকে উপকার কর। বাকসর্বস্ব তর্কবাগীশ না হয়ে সকলকে তিনি কর্মী হতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, 'আপনারা কর্মী হউন, তর্ক ও বক্তৃতা ভুলিয়া যান। সমস্ত বিশ্বাসের সেবকত্ব গ্রহণ করুন। হিংসা, দ্বেষ, রোষ, অভিমান, পরশ্রীকাতরতাকে বিদায় দিয়া মহব্বতের শৃঙ্খলে সবাইকে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ করুন।

পেশা বা ব্যক্তিগত ভাবে যে কোন মানুষ ঘৃণ্য নয়, সেকথা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর 'সান্দারদের সমাজের প্রতি অবিচার' শীর্ষক রচনা থেকে এবং মেথরদের প্রতি তাঁর উদার মানবিক শ্রদ্ধাবোধ থেকে জানা যায়। আসলে তাঁর বিবেচনায় কোন মানুষই ঘৃণ্য নয়। যে কোন পেশার অবহেলার যোগ্য নয়। যে নিজেই ঘৃণ্য সে অপরকে ঘৃণ্য দেখে। কোন ব্যবসা, কোন কারখানা, কোন বৃত্তি, কোন পেশা ঘৃণ্য নয়, চাই সে রাখাল হোক, দর্জি হোক, সৈনিক হোক, ব্যবসায়ী হোক, ধর্মপ্রচারক হোক।

> আবার তাঁর চেতনায় বৈশ্বিক মিত্রতা বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব শুধুমাত্র মানব প্রজাতির পারস্পরিক প্রীতিবন্ধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা বিশ্ব প্রকৃতির অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

উপাদানের মধ্যেও বিস্তারশীল এবং পরিবেশ ভারসাম্যের মধ্যেও সমভাবে অনুসন্ধেয়।

এর মধ্যে আবার মানবপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল ধর্মের প্রধান স্তম্ভ মনে করেন তিনি। তাঁর মানবপ্রেমের পরিধি আবার বিশ্বময় প্রসারিত। সকল দেশের মানুষই তাঁর প্রেম সত্ত্বার আওতাভুক্ত। একারণেই হেজাজ অধিপতি এবনে ছউদ, তুরস্ক অধিপতি মোস্তফা কামাল এবং ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেবের ধর্ম, সেবা, দেশ, শাসক, সমাজহিতৈষণা, প্রজা বাৎসল্যের মধ্যে তিনি কোন ভেদরেখা টানতে আগ্রহী নন। বিশ্ব নাগরিক তিনি মানব কল্যাণমুলক বৈশ্বিক চিন্তার স্ফুরণ, বিকাশ ও চর্চা যার মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করেছেন, তার প্রতি তিনি সবিনয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেছেন।

সর্বোপরি স্বীয় ধর্মবোধকেই মানবতার সেবার গন্ডিতে দাঁড় করিয়েছেন অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ভাবে তাঁর বিশাল সাহিত্য সাধনায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মূলগ্রন্থঃ রচনাবলি

১. আল কুরআনুল কারীম ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২. আল হাদীছ আস সিহাহ আস সিত্তা।

৩. গোলাম মঈনউদ্দীন কর্তৃক রচিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)এর জীবন ও জীবনচেতনা শীর্ষক গবেষণা কর্ম।

৪. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১ম খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ২৬ মাঘ, ১৩৯৪/১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮।

৫. ঐ,দ্বিতীয় খন্ড, ঢা.আ.মি.প্রকাশনা, ঢাকা, ২৬ মাঘ ১৩৯৩, ১০ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮।

৬. ঐ, তৃতীয় খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, কার্তিক ১৩৯৭, নভেম্বর ১৯৯০।

৭. ঐ, চতুর্থ খন্ড, ঢা.আ.মি. প্রকাশনা, ঢাকা, পৌষ ১৩৯৩, ডিসেম্বর ১৯৯০।

৮. ঐ, পঞ্চম খন্ড, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩।

৯. ঐ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ঢা.আ.মি. প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৩৯৩, মাঘ ১৩৯৯।

১০.ঐ, ৭ম খন্ড, জয় পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৪, চৈত্র ১৪০০।

১১.ঐ, ৮ম খন্ড, ঢা.আ.মি. প্রকাশনা প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৯৪, ভাদ্র ১৪০১।

১২.ঐ, ৯ম খন্ড, ঢা.আ.মি. প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৫, আষাঢ় ১৪০১।

১৩.ঐ,১০ম খন্ড,ঢা.আ.মি.প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯৫,কার্তিক ১৪০২।

১৪.ঐ, ১১শ খন্ড, ঢা.আ.মি.পা. ট্রাস্ট, ১ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০০।

১৫.ঐ, ১২শ খন্ড, ঢা.আ.মি.পা.ট্রাস্ট, ১ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০০।

সহায়ক গ্রন্থাবলিঃ বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

১. ডঃ কাজী দ্বীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,৩য়-৪র্থ খন্ড, ঢাকা, তা.বি ।

২. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবি, ঢাকা, ১৯৮৫ ।

৩. নবাব বাহাদুর আবদুল লতীফ খান, সি.আই.ই. মুসলিম বাংলা ঃ আমার যুগে, (আবু জাফর শামসুদ্দীন অনুদিত), ঢাকা, ১৯৮৬ ।

৪. আজিজুর রহমান মল্লিক, বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান, (দেলোয়ারা হোসেন অনুদিত), ঢাকা, ১৯৮৫ ।

৫. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা-তাবি ।

৬. সৈয়দ মুর্তজা আলী, শিক্ষাক্ষেত্রে দিশারী (প্রবন্ধ), বাংলা একাডেমী গবেষনা পত্রিকা, ১৭শ বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবন-পৌষ ১৩৭৯ ।

৭. যোবায়দা মির্জা, কলকাতায় যোগাযোগ, দৈনিক ইত্তেফাক, চৈত্র ১৩৯২ সংখ্যা, ৮এপ্রিল ১৯৮৬ সংখ্যা ।

৮. মুহম্মদ আবু তালিব । সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (প্রবন্ধ) ।

৯. আনোয়ারুল করিম, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ও তাঁর চিন্তাধারা (প্রবন্ধ), আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা ১১০ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৭ ।

১০.আলহাজ্জ খানবাহাদুর মোবারক আলী 'আমাদের পরিচয়', ১ম সংস্করণ, ১৯৬৬ ।

১১.মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ সংস্করণ, চট্টগ্রাম ১৩৮১ বাংলা ।

১২.বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২ ।

১৩.ডঃ মোঃ হারুন-আর-রশীদ, নজরুল সাহিত্য ধর্ম, প্রথম প্রকাশ, বাংলা সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৩ ।

১৪.খানবাহাদুর আবদুল হাকিম (সম্পাদিত), বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫.আব্দুল হক ফরিদি (সম্পাদিত), সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, ১ম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৮২ ।

১৬.সাইদুর রহমান, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, আমিনুল ইসলাম (সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪ ।

১৭.আহমদ শরীফ, বাংলা সুফী সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯ ।

১৮. কেনেথ ডব্লিউ সরগান (সম্পাদিত), ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা (মুখায্যম হুসাইন খানা প্রমুখ অনূদিত), দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা ১৯৬৮ ।

১৯.মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব, প্রথম সংস্করণ, মহসীন এন্ড কোং কলিকাতা, ১৯৩৫ ।

২০. মুহম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস(মোহম্মদ আসাদুজ্জামান অনুদিত), প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮২ ।

২১.কাজি আকরাম হোসেন, দীউয়ান-ই-হাফিজ, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ।

২২. পাঞ্জু খোন্দকার, ছহি ইস্কি ছাদেকী গওহোর, ৩য় সংস্করণ, যশোর ১৯৬১ ।

২৩. মুহম্মদ আবু তালিব, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮ ।

২৪. রকীব শাহ মিনহাজুল আরেফীন, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯০ ।

২৫. মুহম্মদ আব্দুর রহিম (এবং অন্যান্য), বাংলাদেশের ইতিহাস, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯২ ।

২৬. মুহম্মদ এনামুল হক ও মনসুর মুসা সম্পাদিত, মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৮৭ ।

২৭. নন্দলাল ভট্টাচার্য, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সাধক ও সাধিকা, কলকাতা ১৯৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. কাজী আব্দুল মান্নান আধুনিক বাংলা সহিত্যে মুসলিম সাধনা, ২য় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৬৯।

২৯. কাজী নজরুল ইসলাম, বিষের বাঁশী, নজরুল রচনাবলি, ১ম খন্ড, নতুন সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, ২৫ মে, ১৯৯৩।

৩০. কাজী নজরুল ইসলাম, জিঞ্জীর, নজরুল রচনাবলি, ১ম খন্ড, নতুন সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, ২৫ মে ১৯৯৩।

৩১.ইমরান হোসেন, বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবি, চিন্তা ও কর্ম, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

৩২. প্রমথ চৌধুরী, বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী শব্দ, বুলবুল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩।

৩৩. দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে, ৫ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯২৭।

৩৪. আমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও কলকাতা, ১৯৭৯।

৩৫. নরেন্দ্রদেব, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, ঊনবিংশ সংস্করণ, ১৯শ মুদ্রণ, কলিকাতা, জুন ১৯৭২।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চৈতালী, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খন্ড, প্রথম বাংলাদেশ, সুলভ সংস্করণ, ১লা পৌষ ১৩৭৯, ১৬ই ডিসেম্বর।

৩৭. প্রাগুক্ত, রবীন্দ্ররচনাবলী, ২য় খন্ড, প্রথম বাংলাদেশ, সুলভ সংস্করণ, ১লা বৈশাখ ১৩৮০।

৩৮. আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, (মুস্তাফা নূর উল ইসলাম অনুদিত) ঢাকা, ১৯৬৯।

৩৯. খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য সমাজঃ সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, ঢাকা, ১৯৮৪।

৪০. তালিম হোসেন, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ঢাকা, ১৯৬৬।

৪১.খন্দকার ফজলে রাব্বি, বাংলার মুসলমান (মোঃ আব্দুর রাজ্জাক অনুদিত)।

Dhaka University Institutional Repository

৪২. বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ, কলিকাতা, ১৯৭৩।

৪৩. শামসুন্নাহার, রোকেয়া জীবনী, ঢাকা, ১৯৫৮।

৪৪. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৯০।

সহায়ক গ্রন্থ ইংরেজি

1. Quoted in Najmul Karim, The Dynamics of Bangladesh Society, Delhi, 1980.
2. Syeed Amir Ali, A cry from Indian Muslimans the Nineteenth century, Aug 1882.
3. W.W Hunter, the Indian Musalmans, cal-1945 Lahore-1964.
4. Adam's report on vernacular Education in Bengal and Behar, cal-1868.
5. Syed Mahmud, English Education in India.
6. Calcutta University Commission 1917.
7. Azizul Haque, History and Problem of Musli Education in Bengal, 1917.
8. R.A. Nicholson, The Mysts of Islam, Reprinted Edition, Routledge and Kegan Paul, London, 1947.
9. R.A. Nicholson, The Idea of Personality in Sufism, 1st Edition, Canbridge University Press, London, 1923.
10. Mary Boyce, Zoroastrians, 1st Edition, Routledge and Kegan Paul, London, 1979.
11. I. A. Boyle (Edited), The Canbridge History of Iran, Vol-15, 1st Edition Syndies of Cambridge University Press, London, 1968.

Dhaka University Institutional Repository

12. Muhammad Enamul Haque, A History of Sufism in Bengal, Dacca, 1975.
13. Census of East Pakistan, 1951.
14. Proceedings of Govt of Bengal, Education Department August, 1926.
15. The Begal Civil List, 1944.
16. Syndicate Resolution, Calcutta University, 1929.
17. Proceedings of Govt of Bengal, Education Department September, 1927.
18. Letter of DPI to Education Secretary, 19th Feb. 1926, File, I-M-8 (1).
19. Report of on the Public Instruction Bengal, 1927-28.
20. Ahmed, Rafiuddin, The Bengal Muslims, 1871-1906; A Quest for Identity, Delhil, 1989.
21. Assize, K.K. (Ed), Amber Ali: Life and work, Lahore, 1963.
22. Mahmud, A History of Muslim Education in India, 1781-1893, Aligarh, 1895.
23. Karim, Abdul, Muhammad Education in Bengal, Calcutta, 1900.
24. Karim, Abdul, A Social History of the Muslim of Bengal, down to A-D, 1538, Dacca, 1959.
25. Chowdhury, Syed Nwab Ali, Vernacular Education in Bengal, Calcutta, 1900.Nooruzzaman, A.H.M. Rise of Muslim Middle classes as a political fraction in India and Pakistan, Dacca, 1970.

Dhaka University Institutional Repository

26. Noorullah Naik and Naik I. P. History of Education in India during the British period, Bombay, 1943.
27. Islam, Sirajul, The permanent settlement in Bengal; A study of its operation, 1790-1819, Dacca.
28. Sinha N.K. The Economic History of Bengal, Vol. 11, Cal. 1962.
29. Fajlur Rahman, The Bengal Muslim and English Education, 1765-1835, Dacca, 1979.

সরকারি দলিল/রিপোর্ট ঃ

1. Adam's Report on vernacular Education in Bengal and Behar, Cal. 1868.
2. Calcutta University Commission Report, Cal. 1917.
3. Proceedings of Govt of Bengal, Education department, 1924-1929, West Bengal states Archives, Calcutta.
4. Home political File, 1924-29, West Bengal state Archives, Calcutta.
5. Home Appointment File, 1924-29, West Bengal state Archives, Calcutta.
6. Senate Resolutions, University of Calcutta, 1924-29, National library, Calcutta.
7. Syndicate Resolutions, University of Calcutta, 1924-29, National library, Calcutta.

Dhaka University Institutional Repository

8. Bengal Civil list, 1944, Commissioner Library, Court Building, Chittagong.
9. Report on the public Instruction in Bengal 1927-28, D.C. Library, Court Building, Chittagong.
10. District Gazetteer, B.Vols Chittagong, Dacca, Noakhali, Chittagong Hilltracts, Pabna, Burdawan, 1911-1920-21- Chittagong University Museum.

পত্রপত্রিকা ঃ

১. মোহাম্মদী (মাসিক, কলিকাতা)।
২. ইসলাম প্রচারক (মাসিক, কলিকাতা)।
৩. সোলতান (মাসিক, কলিকাতা)।
৪. সওগাত (মাসিক, কলিকাতা)।
৫. মিহির ও সুধাকর (মাসিক, কলিকাতা)।
৬. বঙ্গীয় মুসলাম সাহিত্য পত্রিকা (সাপ্তাহিক, কলিকাতা)।
৭. দূরবীন (ফার্সী, কলিকাতা)।
৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অভিধান ঃ

১. Hans Wehr, A Dictionary of modern Written Arabic, Edited By-J.Milton Cowan.3rd edition. Spoken language services, Inc. New york.

২. Oxforde Learner's Dictionary, Oxforde University Press.

৩. ফারসী বাংলা অভিধান, ইরানী কালচারাল সেন্টার, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৪. বাংলা একাডেমী, সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান।

৫. বাংলা একাডেমী আরবী বাংলা অভিধান। মুহাম্মদ আলা উদ্দিন আল আজহারী, ডিসেম্বর ১৯৯৩।

৬. শ্রী অঞ্জলি বসু, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, কলকাতা, ১৯৭৬।

৭. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, ৩য় সংস্করণ,কলকাতা।

৮. সেলিনা হোসেন এবং অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৭।